প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন



গবেষক দল

কুমার রাণা

আব্দুর রফিক

অমৃতা সেনগুপ্ত

•

ভূমিকা

অমর্ত্য সেন

প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

গবেষক দল

কুমার রাণা

আব্দুর রফিক

অমৃতা সেনগুপ্ত

ভূমিকা

অমর্ত্য সেন

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

PRATICHI SIKSHA PRATIBEDAN
(Vol. I & Vol. II)
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 180.00

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের সহযোগিতায় টি.এল.এম. বুকস্, দিল্লি কর্তৃক
The Pratichi Education Report–I নামে ২০০২ সালে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১১, জুলাই ২০০৪

প্রচ্ছদ-চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

দাম : ১৮০ টাকা

ISBN-81-295-0316-6

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্তমান প্রকাশনা প্রসঙ্গে

বর্তমান প্রকাশনাটি প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের দুটি গবেষণা প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ। ২০০১ সালের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলায় ১৮টি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করি ও সেই বছরেই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করি। এর সংক্ষিপ্ত রূপ নভেম্বর ২০০১-এ গণমাধ্যমের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এর পর আমরা ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলিতে পৌঁছে দিই এবং আমাদের করা কিছু নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত পরামর্শ সম্পর্কে মতামত জানবার জন্য পুনরায় সেই উত্তরদাতাদের কাছে যাই। এই সম্পূরক সমীক্ষাটি সহ ২০০২ সালের আগস্ট মাসে আমরা আমাদের প্রথম প্রতিবেদনটি (*দি প্রতীচী এডুকেশন রিপোর্ট-১*) প্রকাশ করি।

যেহেতু, আমাদের প্রথম কাজটি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সে কারণে আমরা রাজ্যের আরও তিনটি জেলা (বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং)তে আমাদের অনুসন্ধানের কাজটিকে বিস্তৃত করে দ্বিতীয় আর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করি।

বর্তমান প্রকাশনার প্রথম খণ্ডটি মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলাতে করা সমীক্ষার উপর আধারিত ও দ্বিতীয় খণ্ডটি বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলায় করা সমীক্ষার প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনগুলির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাটি আমরা প্রথম থেকেই অনুভব করে এসেছি। তা ছাড়া জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে এই বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার দাবিও আমাদের কাছে জানানো হয়েছে। (শুধু বাংলা নয়, যে জায়গাকে কেন্দ্র করে সমীক্ষা সেখানকার ভাষায় প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করার কাজটি আবশ্যিক সেই অনুযায়ী আমরা ঝাড়খন্ডে করা প্রাথমিক শিক্ষার উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশ করেছি)। কিন্তু কিছু বাধার কারণে প্রতিবেদন দুটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত দেরি হয়ে গেল। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

শুধু অনুবাদই নয়, প্রতীচী তার গণ-অঙ্গীকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ব্যাপক মানুষের মধ্যে আলোচনার জন্য প্রসারিত করতে অন্যান্য পদক্ষেপও নিয়েছে— যার অন্যতম হল, সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলির কিছু অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে কার্যশালার আয়োজন করা। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০২ সালের ৬ জুলাই বোলপুরে এবং ২০০৩ সালের ৬ জুলাই ঝাড়খণ্ডের দুমকাতে আমরা অত্যন্ত সফল দুটি কার্যশালার আয়োজন করি। এই কার্যশালাগুলি থেকে উঠে আসা আলোচনাগুলি প্রতীচীর প্রদিবেদনকেই পুষ্ট করে।

প্রতিবেদন দুটির ক্ষেত্র সমীক্ষা শেষ করার পর থেকে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের রান্না করা খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার রূপায়ণের আরম্ভ। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি কিছুটা হলেও পুরনো হয়ে পড়েছে। আবার, এটাও বলা যায়, আমাদের প্রতিবেদনে যেরকম জোরের সঙ্গে জনসাধারণের বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরা হয়েছিল, তা-ও নীতি নির্ধারণকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প ছাড়াও বিদ্যালয় বিশেষে অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কমিটি গঠন করার সুপারিশটির আংশিক কার্যন্বয়ন থেকেও এই জিনিসটি উঠে আসে।

যাই হোক না কেন, আমাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি আনবার জন্য প্রকাশনাটি প্রাসঙ্গিক বলেই বিবেচিত হবে। কোনও প্রতিবেদনই চূড়ান্ত কোনও কথা বলে না — আমরাও সে দাবি করছি না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবহমান আন্দোলনে, এই প্রতিবেদন যদি জনসাধারণের কিছু উপকারে লাগে তা হলেই আমরা কৃতার্থ হব।

বর্তমান প্রকাশনাটির দায়িত্ব নিয়ে দে'জ পাবলিশিং এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন বাংলা প্রকাশনাটি সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাদের ঋণী করে রেখেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য বহু জনের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ জানবার জন্য আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। মূল্যবান পরামর্শগুলি আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় হবে।

শান্তিনিকেতন
জুন, ২০০৪

প্রতীচী গবেষক দল

প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

গবেষক দল

কুমার রাণা

আব্দুর রফিক

অমৃতা সেনগুপ্ত

ভূমিকা

অমর্ত্য সেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অন্তরা দেব সেন
অনুরাধা দে
অরবিন্দ নন্দী
এ. কে. শিবকুমার
জ্যঁ দ্রেজ
কৃষ্ণা মুখার্জি
মীরা স্যামসন
নীলাঞ্জন ব্যানার্জি
পুনম মুত্রেজা
স্যমন্তক দাস
শিবাদিত্য সেন
সুমিতা মুখার্জি
সৌমিক মুখার্জি
এবং আমাদের সমস্ত উত্তরদাতারা

সূচিপত্র

পর্ব – ৪

প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন – দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

অমর্ত্য সেন

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বহু অভাব থেকে পীড়িত। যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যালয় নেই এবং যেগুলি আছে তা থেকেও খুবই কম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থের অভাব তো স্পষ্টতই একটি গুরুতর সমস্যা। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাও আছে। বিদ্যালয়গুলির দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটি বড় সমস্যার কারণ। অবহেলিত পরিবারের শিশুদের ন্যায্য সুযোগ দিতে না পারার ব্যর্থতার বিশেষ দিকটি বিদ্যালয়গুলির কাজকর্মের সর্বব্যাপী সাধারণ অকর্মণ্যতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

বিদ্যালয়গামী প্রথম প্রজন্মের শিশুদের একটি সহানুভূতিশীল ও সমতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনা আরও কঠিন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম ও প্রশাসনকে উন্নত করে তোলা ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ।[১]

এই রিপোর্ট নবগঠিত প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের প্রথম প্রয়াস। যে যে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা দরকার তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা এর উদ্দেশ্য। প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ১৯৯৯ সালে প্রতীচী (বাংলাদেশ) ট্রাস্টের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজ্ঞতা এবং অশিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব, নারীদের (বিশেষ করে বালিকাদের) বিশেষ অসুবিধাগুলি দূর করাই এই দুই ট্রাস্টের সাধারণ লক্ষ্য।[২] ১৯৯৯ সালে সাইক্লোন-বিধ্বস্ত ওড়িশার দুর্গতদের এবং ২০০১ সালের জানুয়ারিতে গুজরাত-ভূমিকম্প পীড়িত মানুষদের পুনর্বাসনের কাজেই প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট এতদিন জড়িত ছিল। কিন্তু এই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ভারতে অশিক্ষা ও বিদ্যালয়-শিক্ষার অভাবের বিরুদ্ধে কাজ করা। বস্তুত এটিই প্রতীচী ভবনের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ট্রাস্ট তাদের সম্বলের একটি বড় অংশ এই কাজের জন্য অর্পণ করবে।[৩]

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত

কাজের জায়গা সমেত কিছু কিছু সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই প্রতীচী ভবন যথাযথভাবে গঠিত 'কাজের জন্য গবেষণা' কেন্দ্র হিসাবে কাজ শুরু করে দেবে। যাই হোক, সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষা না করে মে, ২০০১ থেকেই সে অন্বেষণের (যার রিপোর্ট এখানে প্রকাশিত হল) কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। সাময়িকভাবে কাজ চালানোর জন্য শান্তিনিকেতনে ভাড়া নেওয়া ছোট একটি ঘরে। আমার সঙ্গে কর্মরত তিনজন গবেষক (কুমার রাণা, আব্দুর রফিক ও অমৃতা সেনগুপ্ত)কে নিয়ে তৈরি হয়েছে

এই অনুসন্ধানী দল।[৪] রিপোর্ট তাঁদেরই লেখা, সম্পাদনা করেছেন স্যমন্তক দাস। অনুসন্ধানের যে প্রতিবেদন এখানে প্রকাশিত হল তা পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ (আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ)। প্রতীচী ভবনের ক্রিয়াকলাপ যদিও এ রাজ্যের গন্ডিতেই থাকবে না (বস্তুত ট্রাস্টের লক্ষ্য গোটা ভারত, এমনকি উন্নয়নশীল দুনিয়ার অন্যত্রও বিদ্যালয় শিক্ষা সমস্যার মোকাবিলা করা), তবুও ট্রাস্টের প্রাথমিক দৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের উপরে। এর পিছনে ট্রাস্টের মূল আদর্শগত ভাবনা-চিন্তা জড়িত আছে। এ ছাড়াও প্রতীচী ভবনের অবস্থান (যা পশ্চিমবঙ্গে হতে চলেছে) এর প্রশ্নটিও যুক্ত।

প্রথমত, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যালয় শিক্ষাকে আরো ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে বহু উদ্ভাবনী পরিবর্তন এনেছেন। নবগঠিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। অনেকটা একই ধরনের প্রয়াস দেশের অন্যত্রও হয়েছে, এবং নিঃসন্দেহে আরো হবে। ফলে এর সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে কেবল পশ্চিমবঙ্গই নয়, অন্য রাজ্যও শিক্ষা নিতে পারে। অন্য রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতাও আছে (যেমন কেরল ও সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ)। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ফের পশ্চিমবঙ্গ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। বিষয়টি প্রতীচী ট্রাস্টের (ও প্রতীচী ভবনের) আগামী দিনের অন্বেষণের বিষয়াবলীর অন্তর্গত হবে। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিলে সমগ্র ভারতেরই প্রচুর লাভ হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য।[৫]

গ্রাম পুনর্গঠনে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট রেকর্ড আছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই রাজ্য ভূমিসংস্কারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে ও পঞ্চায়েতের কাজে গতি এনে (এবং আরো সম্প্রতি পঞ্চায়েতে নারী-নেতৃত্বের তাৎপর্যময় বৃদ্ধি ঘটিয়ে) গ্রাম পুনর্গঠনের কাজটি করছে। বিদ্যালয় শিক্ষা মূলতঃ স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপার। এর থেকে কী লাভ করা গেল সে হিসেবটাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কোন্ বাধা ও অপূর্ণতা চলার রাস্তা আটকে রাখছে এবং উদ্যোগ ও সম্পদকে ঠিকঠাক কাজে লাগতে দিচ্ছে না সেটা খুঁটিয়ে দেখাই এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রয়োজনীয়।

যদি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা কিছু সমস্যার কবলে পড়ে থাকে (যা নিয়ে আমরা তর্ক জুড়ি) তা হলে রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদকে সেই রোগ সারানোর কাজে লাগাতে দিতে হবে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেই এ কাজ করতে হবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগের তাৎপর্যময় ইঙ্গিত মিলছে। এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, এ রাজ্যে এই মুহূর্তে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য জোরালো প্রচেষ্টা বড়ই প্রয়োজনীয়। সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্ধারণ করার দিকেই এই অনুসন্ধান মনোযোগ দিয়েছে। এই অনুসন্ধান ও তার থেকে বেরিয়ে আসা প্রস্তাবগুলিকে পরবর্তিকালে আরো খুঁটিয়ে দেখা হবে।

বীরভূম, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া – এই তিনটি জেলার উপর আমাদের অনুসন্ধান প্রাথমিক আলোকপাত করে। প্রতিটি জেলা থেকে নির্বিচার চয়ন পদ্ধতিতে ৬টি ব্লক

মনোনীত করা হয়েছিল। এই ব্লকগুলি থেকে মোট ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র।

প্রতিটি জেলা থেকে ৬টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়ে (একমাত্র বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে ৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল) গবেষণার কাজ চালানো হয়েছিল। স্পষ্টতই অন্বেষণে যা জানা গিয়েছে মোটামুটি তা আগ্রহজনক হলেও নমুনার সংখ্যাটি যে খুবই ছোট এ বিষটিকেও মাথায় রাখা দরকার। আরো বলা দরকার যে এই অন্বেষণ কেবলমাত্র তিনটি জেলায় সীমাবদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গে এর তাৎপর্য সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্তবাহী নয়, বরং ইঙ্গিতবাহী। আরো বলা দরকার যে, সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলি কিছুটা বাস্তব সুবিধার ভিত্তিতেই বাছা হয়েছিল, যদিও ব্লক মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার করা হয়নি। আমাদের এই সব অন্বেষণের ফলাফলে যে মিল দেখা গিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে এই পর্যবেক্ষণ থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছনোর ভিত্তি হয়তো আছে — অন্তত ইঙ্গিতকারী হিসাবে। কিন্তু এই অন্বেষণ যে গোটা ছবিটা না-ও তুলে ধরতে পারে সে সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার।

অর্থবরাদ্দ, বেতন এবং শ্রেণিবিভেদ

বুনিয়াদি শিক্ষার খাতে আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা ভারতের একটি চিরন্তন সমস্যা। বিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজনীয়তা ইদানীং স্বীকৃতি পেলেও অর্থনৈতিক সংকট এখনও প্রচণ্ড রকম রয়েছে।[৬] সরকারী কর্মচারীদের সামগ্রিক বেতন বৃদ্ধির ফলে যে সব কৃষি বা শিল্প শ্রমিকদের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করার কথা, তাঁদের বহু পিছনে ফেলে সরকারি কর্মচারী সহ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন (সরকারি কর্মচারী হিসেবে) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক বেতন এখন প্রায় ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা (মূল বেতন, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি-ভাড়া ভাতা মিলিয়ে)। এক দিক থেকে এটা আনন্দের বিষয়। (বস্তুতঃ আমি নিজেই একদা প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকার সময়ে বিদ্যালয়-শিক্ষকদের তৎকালীন অত্যন্ত কম বেতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলাম)। অন্য দিকে, সাম্প্রতিক এই বিশাল বেতন বৃদ্ধি বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রচণ্ডরকম ব্যয়বহুল করে তুলেছে। ফলে, যারা এখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার আওতার বাইরে রয়েছে তাদের পক্ষে নিয়মিত বিদ্যালয়-শিক্ষা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।[৭]

এখানে শ্রেণিবিভেদের প্রশ্নটিও আছে। বস্তুত, শ্রেণিবিভেদ সমাজের অবহেলিত ও লাঞ্ছিতদের কাছে বিদ্যালয়-শিক্ষাকে পৌঁছনোর কাজের গভীর ক্ষতি করে। যদি শ্রেণি-সচেতন নীতির মাধ্যমে, যত্নসহকারে এই বিভেদের উপর নজর রাখা না হয়, তা হলে দরিদ্রতর (এবং কম সুবিধাভোগী) পরিবারের শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক দূরত্ব-বৃদ্ধি ক্ষতির মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। যে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রতিবেদন থেকে উঠে আসে, এটি তার মধ্যেই পড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক কম বেতন পান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেখানে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা মাসিক মাইনে পান সেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-

শিক্ষিকারা মাসান্তে ১,০০০ টাকা রোজগার করেন। এত কম বেতনেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যোগ্য এবং নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষিকা পাওয়া যায়। এই শিক্ষিকারা, অন্তত কিছু প্রমাণ অনুযায়ী ন্যূনতম সুবিধাভোগী পরিবারের শিশুদের থেকে মানসিকভাবে কম বিচ্ছিন্ন। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মাইনে বাড়া নিয়ে আনন্দিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষায় সাধারণভাবে আগ্রহ বাড়ানোর পথ ও পাথেয়র দিকেও বিশেষ নজর রাখতে হবে। আর ন্যূনতম সুবিধাভোগী পরিবারের শিশুরা যেন বিশেষ করে ন্যায়বিচার পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। চরম বিভেদের বাধা পার হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের শিক্ষা প্রদানের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছে ন্যায্যত আর কী আশা করা যেতে পারে তা খুঁটিয়ে দেখা বিশেষ করে জরুরী। বিশেষত সমাজ কাঠামোয় তাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানের দিকটি থেকে।

বাবা-মা'র আগ্রহ, প্রগতি ও উদ্ভাবন

ভাল খবর দিয়ে শুরু করা যাক। আমাদের অন্বেষণে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকার অনেক কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, গরিব ও অশিক্ষিত ঘরের মা-বাবাদের মধ্যে প্রত্যাশা কম থাকার যে কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে আমাদের অন্বেষণ তার বিপরীত ছবিটাই তুলে ধরছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ সবার মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। বস্তুত উত্তরদাতাদের ৯৬ শতাংশ জানিয়েছেন যে বালকদের অবশ্যই বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উত্তরদাতাদের ৮২ শতাংশ জোর দিয়ে বলেছেন যে এ কথা বালিকাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যাঁদের বিশ্বাস আরও একটু এগিয়ে, তাঁদের ৮৪ শতাংশ বলেছেন যে বুনিয়াদি শিক্ষা আবশ্যক হওয়া উচিত।[৮] বস্তুত কেউই এ প্রশ্নটির বিরোধিতা করেননি। যদিও কেউ কেউ উত্তর দিতে পারেননি। বালক বা বালিকা যেই হোক না কেন, শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার কথা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত পরিবারের লোকজনও নিছক আর্থিক উন্নতি সাধনের কথা ভেবে বলেননি, বরং সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবেও দেখেছেন। এই বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিত পরিণত চেহারাটি আমাদের আনন্দিত করে। এ পথে যে বাধা তা মানুষের শিক্ষালাভের চাহিদার দিক থেকে নয়, প্রায় পুরোটাই যোগানের ত্রুটিতে।

দ্বিতীয়ত, ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের রিপোর্ট বা সাম্প্রতিক জনগণনা (২০০১) রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণভাবে আমাদের অন্বেষণ বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগবৃদ্ধির সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে বহু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার তথ্য পেয়েছে।

নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগতি হচ্ছে। সমস্যাটি অচলায়তনের নয়, বরং এগোবার পথটিকে আরো মসৃণ ও দ্রুতগামী করে তোলার।

বস্তুত শিশুদের শিক্ষিত করার আগ্রহ এতই প্রবল যে, সংগৃহীত নমুনায় দেখা গেছে কখনও কোনও বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়নি এমন শিশুর সংখ্যা মাত্র তিন শতাংশ (৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে)। ওই বয়সসীমার ৯৬ শতাংশকে কোনো

না কোনো বিদ্যালয়ে নাম লেখানো অবস্থায় পাওয়া গেছে (বাকি ৩ শতাংশকে কখনো ভর্তি করা হয়নি এবং ১ শতাংশ পড়া ছেড়ে দেয়)। এই বিষয়টি মনে যথেষ্ট দাগ কাটে। আসল সমস্যা অন্যত্র। সেটি হচ্ছে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির নিম্নস্তর এবং প্রাপ্ত শিক্ষার নিম্ন গুণমান (দ্বিতীয়টাই বর্তমানে বেশি প্রকট)।

তৃতীয়ত, শিশুদের মা-বাবাদের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে এবং বিশেষত শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে বহু অভিযোগ আসা সত্ত্বেও অন্বেষণের সময় আমরা বহু শিক্ষকের দেখা পেয়েছি যাঁরা কর্ম-নিবেদিত-প্রাণ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত। কী করে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের ধারার উন্নতি করা যায় সে পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা খুবই চিন্তিত। এই শিক্ষকের মধ্যে যে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে তা যদি অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং শিক্ষক ও মাতাপিতাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার বর্তমান ব্যবস্থাদি যদি যথেষ্ট উন্নত করা যায়, তা হলে আত্মনিবেদন এবং শুভেচ্ছার মজুত ভাণ্ডারকে আরও ভালো করে কাজে লাগানো যায়।

চতুর্থত, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের কর্মনিষ্ঠা প্রায়ই প্রশংসা পেয়ে থাকে। এইসব শিক্ষিকারা যে বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের সঙ্গে নিজের পরিবারের লোকের মতো করে ব্যবহার করেন সেটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক পটভূমির শিশুদের একটা আদরযত্নের পরিবেশ দিতে পেরে এবং এ পর্যন্ত অব্যবহৃত ও উপেক্ষিত সম্পদকে সমাবিষ্ট করে, (গৃহকর্ম ছাড়া অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত না থাকা মহিলাদের শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্তি), নিপুণ এবং নিষ্ঠ কাজের নমুনা তৈরি করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি অতি অল্প ব্যয়ে অনেক বড় কাজ করতে পেরেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক অবস্থাটি যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় (যা এখন আলোচনা করা হবে) তা হলে দেখা যাবে যে এই উৎকৃষ্ট চিন্তাভাবনাটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।

গুরুতর ত্রুটির প্রমাণ

এই সব সদর্থক দিকগুলি থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার যে ছবিটি গবেষণা থেকে ফুটে উঠছে তা আমাদের অত্যন্ত বিচলিত করে। প্রথমত, মাত্র ৪১ শতাংশ মাতা-পিতা বলেছেন যে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজে 'সন্তুষ্ট'। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সন্তোষের মাত্রা অনুপাতে বেশি -- ৫৪ শতাংশ। কিন্তু তবুও এই সংখ্যাকে খুব কমই বলা যায়। বাকিদের মধ্যে একটা বড় অংশ স্বীকার করেছেন যে তাঁরা শিক্ষকদের কর্মধারায় স্পষ্টই 'অসন্তুষ্ট'। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজে দ্ব্যর্থহীনভাবে 'অসন্তোষ' প্রকাশ করেছেন ৯ শতাংশ; আমরা তাঁদের অভিযোগগুলিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও (আমার মতে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দশ শতাংশ পর্যন্ত লোকের অসন্তোষকে সাধারণত ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় না) এই সত্য এড়ানো খুবই কঠিন যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ মা-বাবা (২৪ শতাংশ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনও মতেই সন্তুষ্ট নন। আরও একটি কথা হল এই যে, অসন্তোষ প্রকাশের প্রবণতাটা যা-ই হোক না কেন, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে অসন্তোষের মাত্রা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা-

শিক্ষকদের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রায় তিন গুণ বেশি। ঘটনাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার একটা গুরুতর কারণকে নিশ্চয়ই সূচিত করে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের গবেষক দলের বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনগুলিতে স্কুলের খাতায় নাম লেখানো শিশুদের মাত্র অর্ধেককে (সুনির্দিষ্টভাবে বললে ৫১ শতাংশ) বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতির হার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে লক্ষণীয়ভাবে বেশি। যদিও সেই সংখ্যাটির (৬৪ শতাংশ) অনুপস্থিতির সাধারণ কারণগুলি, যথা অসুখ-বিসুখকে হিসেবের মধ্যে রাখলেও, এটি যতখানি হওয়া উচিত তার চাইতেও কম।

তৃতীয়ত, আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনগুলিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ১৪ শতাংশ শিক্ষিকাকে অনুপস্থিত থাকতে দেখাও কম বিচলিত হওয়ার ঘটনা নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুপস্থিতির অনুপাত ছিল আরো ভীতিপ্রদ — ২০ শতাংশ। বহু কর্মনিষ্ঠ শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও মা-বাবাদের কাছ থেকে শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রায়শই অভিযোগ শোনা যায়, যার মধ্যে কিছু পরিমাণ সারবস্তু স্পষ্টতই আছে। বিশেষত এক জন বা দুই জন শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা চালিত হয় এমন স্কুলগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতি অধিকতর চিন্তার উদ্রেক করে। কারণ, এক্ষেত্রে শিশুদের নিরাপত্তাও অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।

প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরতা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার খারাপ অবস্থার প্রমাণ, দৃশ্যত, বেশিরভাগ ছাত্রের (যাদের সঙ্গতি আছে তাদেরই) গৃহশিক্ষকতার উপর ভরসা থেকে যতটা মেলে অন্য আর কিছু থেকে ততটা মেলে না। প্রাইভেট টিউশন যে একটা গুরুতর ফাঁক ভরাট করে তা এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রাপ্তির মানের তুলনামূলক বিচার করে বোঝা গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা পরীক্ষা করেছিলাম। এদের মধ্যে ২০ জন প্রাইভেট টিউশন নেয়, ১৪ জন নেয় না। যারা টিউশন নেয়, তাদের শতকরা ৮০ ভাগ নিজেদের নাম লিখতে পারে। যারা প্রাইভেট টিউশন নেয় না তাদের মধ্যে এই সংখ্যাটি কেবলমাত্র শতকরা ৭ ভাগ। আমরা এটা জিজ্ঞাসা করতেই পারি যে বিদ্যালয়ে এরা তা হলে কী শেখে?

যে বিদ্যালয়গুলির সমীক্ষা করা হয়েছে, তাদের ৪৫ শতাংশের বেশি ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন নেয়। আমরা দেখেছি, যে, যে সব ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন নেয় না, তারা বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট বলেই এমনটা করছে তা নয়। অর্থের অভাবই মূলত তাদের প্রাইভেট টিউশন নেবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায়, যেমন আশা করা গিয়েছিল, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার প্রবণতা অনেক কম। স্পষ্টত, বেসরকারি বিদ্যালয়ে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় এটা তার একটা ফল। প্রাইভেট টিউশন বাবদ বিকল্প খরচ এতে বেঁচে যায়। কার্যত, সফল প্রাথমিক শিক্ষা আর বিনা ব্যয়ে হয় না। এটি

সংবিধানে সুরক্ষিত মৌলিক অধিকারকে অমান্য করার থেকে কম কিছু নয়। এটি একটি চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাও বটে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের স্বার্থবিরোধী এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষায় সমানাধিকারের বুনিয়াদি নীতি লংঘিত হয়।

শ্রেণিবিভেদের মাত্রা

প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজনীয়তা যদি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অকার্যকারিতাকে তুলে ধরে, এবং এর বৈষম্যমূলক ব্যবহার যদি শ্রেণি ও আর্থিক সচ্ছলতাজনিত অসমতার ধরণটি ফুটিয়ে তোলে, তাহলে অকর্মণ্যতা ও অসাম্য এই দুটিকেই স্পষ্ট করে তোলে এমন অন্য আরো লক্ষণ আমরা ব্যবস্থাটির মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

প্রথমত, প্রাইভেট টিউশনের বৈষম্যমূলক ব্যবহার, প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। দরিদ্রতর এবং অশিক্ষিত পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে যেমনটা প্রায়ই হয়ে থাকে, পরিবারে শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত কোনো ঐতিহ্য না থাকায় এই সব মা-বাবাদের পক্ষে তাঁদের শিশু সন্তানদেরকে লেখাপড়ার কাজে বাড়িতে কোনো রকম সাহায্য দিতে না পারার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এরা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে না। বস্তুত বাড়ির সাহায্যের সুবিধা না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাকে কাজে লাগানোটা যাদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, প্রাইভেট টিউশনের মতো অবাঞ্ছনীয় প্রয়োজন সেই শিশুরাই সব চেয়ে কম মেটাতে পারে। ফলত বিদ্যালয় শিক্ষার অক্ষমতা শ্রেণিকেন্দ্রিক প্রতিকূলতাকে আরো তীব্র করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের পরিবারের শিশুদের স্বার্থরক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কম গুরুত্ব দানের মতো কিছু খারাপ খবরও আমাদের কাছে এসেছে। তফসিলী জাতি ও জনজাতির ছাত্র-ছাত্রী অধিক এমন বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির মাত্রা বেশি (৭৫ শতাংশ)। অন্য দিকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরা পড়তে আসে এমন কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে নিয়মমাফিক ক্লাস ফাঁকি দেন (এক বিদ্যালয়ে শনিবার ও সোমবার কোনো ক্লাস হয় না), এবং পড়ানোর সময় ইচ্ছেমতো কমিয়ে দেওয়া হয় (এক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সকাল সাড়ে এগারোটার সময় আসেন এবং দুপুর দেড়টায় চলে যান)। পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের প্রতি অযত্নের কারণে তিরস্কৃত বা ভর্ৎসিত হওয়ার ভয় স্পষ্টতই কম। বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের দরিদ্র মাতা-পিতাদের থেকে নিজেদের ভিন্ন শ্রেণির মানুষ বলে মনে করেন।

তৃতীয়ত, এটি অন্য একটি বিষয়কে যোগ করে -- পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মাতা-পিতাদের অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকগুলিতে অংশগ্রহণের স্বল্পতা ও গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলিতে তাঁদের কম প্রতিনিধিত্ব। নিজেদের কণ্ঠস্বর শোনানো যাঁদের সব চেয়ে বেশি দরকার তাঁদের সেই ক্ষমতার অভাব ভাল রকম লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সামাজিক অবস্থার পীড়নমূলক শ্রেণিব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভালমতো শিকড় ছড়িয়েছে।

আমরা এ-ও দেখেছি যে, কোন কোন শিক্ষক তফসিলী জনজাতি পরিবারের লোকজনদের নানা অভ্যাসকে (প্রায়শই খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস) কটাক্ষ করে কথা বলছেন। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারটা যোগ করলে যে ছবিটা বেরিয়ে আসে তা

নিদারুণ চিন্তাজনক। আমরা আরো অবাক হয়েছি আমাদের সমীক্ষা করা ১৮টি বিদ্যালয়ের একটিতে তফসিলী জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যদের থেকে আলাদা বসতে বাধ্য করার দৃশ্য দেখে। ভূমিসংস্কার আন্দোলন এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেণিবিভেদের বিরোধিতায় যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে, বিদ্যালয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, সেখানে শ্রেণিবিভাজনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা বৃদ্ধির ছবিটি নিশ্চয়ই একটি বিশেষ লজ্জার বিষয়। আবার এটাও বলা দরকার যে, আমরা এমন বহু শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এই শ্রেণিবিভেদের বাধা পার হতে চান। শিক্ষাগত সফলতার সঙ্গে তুলনামূলক বেশি মাইনের জোর যে তাঁদের ইতিমধ্যেই বহু মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এ বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিবিভাজনের এই পীড়নমূলক ছবিটি মনে বেশ ধাক্কা দেয়।

কর্মনীতির সংস্কার

এই সময়ে কর্মনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং মনোযোগ দাবি করে এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

(১) শিক্ষকদের উঁচু হারে অনুপস্থিতি এবং কর্তব্যে অবহেলার ধরণাগুলি কেবলমাত্র নৈতিক আবেদন বা অনুরোধ উপরোধের মাধ্যমে দূর করা যাবে না। এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার দরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দাবিদাওয়া (দ্রুত বেতন প্রাপ্তি থেকে আকাঙ্খিত বদলি) নিয়ে আন্দোলনে শিক্ষক সংগঠনগুলি (এ.বি.পি.টি.এ., ডব্লিউ.বি.পি.টি.এ. ও অন্যান্য) খুবই সফল হয়েছে। কিন্তু সামাজিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কথা ধরে নিলে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের তাৎক্ষণিক প্রলোভন থেকে দূরে সরে এসে সংগঠনের কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনার দরকার আছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম বেতন পান। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা বেতন পান নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে – শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের মতো অনিয়মিতভাবে নয়। চাকুরিজীবী হিসাবে তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের তথা তাঁদের সংগঠনের উপর বেশি দায়িত্ব বর্তানোর পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে।

(২) বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা দৃশ্যত অচল বা অনিয়মিত। আমরা যেসব বিদ্যালয়ে ঘুরেছি তার অনেকগুলিতেই বিগত বছরে মাত্র একবার সরকারিভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন হয়েছে। একজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে দুই বা তিন বছরের মধ্যে কোনও সরকারি পরিদর্শন হয়নি। বিদ্যালয়ের সরকারি পরিদর্শকদের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলেছি তখন তাঁদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ফুটে উঠতে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক এবং তাঁদের সংগঠন সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি লক্ষ্য করা গেছে। সরকারি পরিদর্শন ব্যবস্থা অবশ্যই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে।

(৩) গৃহশিক্ষকতার বিষয়টিকে আপোষহীনভাবে মোকাবিলা করতে হবে ও এটিকে

সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার যা মান তাতে এই ব্যাধিকে রাতারাতি বিদায় করা যাবে না। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে সম্পন্ন পরিবারের শিশুদের জন্য সহজলভ্য নিরাপত্তার মাধ্যম হল গৃহশিক্ষকতা। এর কারণেই শিক্ষকরা নিজেদের কাজে ঢিলেমি দেখাতে সক্ষম (যেহেতু গৃহশিক্ষকতার কবচে সুরক্ষিত ক্ষমতাবান লোকেরা শিক্ষকদের অবহেলার প্রতিবাদ করেন না)।

একটি ব্যাধি অন্য একটি ব্যাধির জন্ম দেয়। প্রাইভেট টিউশনের বৈষম্য কেবল বিদ্যালয় ব্যবস্থার অক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে না, তাকে মদতও জোগায়। গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করার সবচেয়ে বড় যুক্তি বোধ হয় এই যে, এই ব্যবস্থা আছে বলে অধিক প্রভাবশালী ও সম্পন্ন মা-বাবারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক লেখাপড়ার মান নিয়ে কম চিন্তিত হন (যেহেতু গৃহশিক্ষকের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের অতিরিক্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা সব সময়েই করতে পারেন)। যদি প্রাইভেট টিউশনের সুবিধা না পাওয়া যায়, তা হলে বেশি প্রভাবশালী পরিবারগুলিও তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ের উপর বেশি নির্ভর করবেন (দরিদ্রতর এবং কম প্রভাবশালীরা ইতিমধ্যেই যা করেন)। এর ফলে বিদ্যালয় প্রশাসনের উপর যে চাপ সৃষ্টি হবে তা বিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতার উন্নতির জন্য খুবই জরুরি হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যালয় শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করতে ইতিমধ্যেই এক দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। যে সব উদ্যোগ নিলে প্রাইভেট টিউশন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সে সবও এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। এই কাজ যে শিক্ষকদের ক্লাসের বাইরে পড়াবার জন্য পারিশ্রমিক আদায় করে একাধিক স্রোত থেকে আয়ের যোগান দেয় তা নয়, বিদ্যালয় শিক্ষাকে চরম অকর্মণ্য চেহারা দিয়ে গৃহশিক্ষকতাকে একটা আক্ষেপজনক বাধ্যবাধকতায় পরিণত করে (এ ব্যাপারটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও বহুলাংশে প্রযোজ্য। শিক্ষকরা নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের টিউশন না দিয়ে অন্যরা দিলেও)। এটাও আবার শিক্ষক, তাঁদের সংগঠন, শিক্ষা পরিকল্পনাকারী এবং হতাশ ও খানিকটা সন্ত্রস্ত সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক বর্গের মধ্যে আলোচনা, পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে করে তোলার বিষয়।

(৪) বিদ্যালয় শিক্ষাদানে বাড়তি উৎসাহ দেওয়ার একটি উপায় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলির হাতে আরও আইনী ক্ষমতা দেওয়া, এমন কী বিদ্যালয়ের রাজস্ব ব্যয়কেও তাঁদের অনুমোদন-সাপেক্ষ করা। গ্রাম শিক্ষা কমিটির (বিশেষ কোনও এক্তিয়ার যাদের কম) বদলে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলির ভূমিকাকে বিদ্যালয় বিশেষে নতুনভাবে শুরু করে যথেষ্ট প্রশস্ত করে তোলার কথাটা বিবেচনা করে দেখার দরকার আছে। এই কমিটিগুলির কার্যোপযোগিতা বাড়াতে বিভিন্ন শ্রেণির মাতাপিতাদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে মূলনীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করারও দরকার আছে। সভার মাধ্যমেই বিষয়গুলির আলোচনা ও অনুমোদন করতে হবে, ভুয়ো মিটিং-এ নয়।

অতীতে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলি এরকম কোনও ভূমিকা পালন

করেনি। মাতাপিতাদের, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা মাতাপিতাদের নতুন ক্ষমতার মধ্যে একটা গঠনমূলক সম্ভাবনা আছে। কাজটি অত্যাধুনিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের গবেষণা থেকে পাওয়া ফলগুলি দেখায় যে এ ধরণের পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা একটা আমূল সংস্কারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

(৫) গবেষণা থেকে একটি বিষয় আমরা দেখছি যে, শিক্ষকদের তুলনায় শিক্ষিকাদের সাফল্য বেশি। শিক্ষিকারা কেবল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। বস্তুত তিন জেলা মিলিয়ে করা আমাদের নমুনা-সমীক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের মা-বাবার ৮৩ শতাংশ একমত যে, শিক্ষিকারা শিশুদের অনেক বেশি যত্ন নেন। প্রাথমিক শিক্ষানীতি সংস্কারের সময় সাফল্যের এই তুলনামূলক প্রকৃতিটি মাথায় রাখতে হবে।

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবিধার অভাব বহু ক্ষেত্রের সমস্যা। যে সব বিদ্যালয় আমরা দেখেছি তার মধ্যে একটির কোনও বাড়ি নেই। আটটি স্কুলের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি করে ক্লাসঘরে চারটি করে ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসঘরের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু তহবিলে অর্থের অভাব বহু বিদ্যালয়েরই বড় সমস্যা।

(৭) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, বিশেষত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে, অত্যন্ত কম। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি অনেক দিক থেকে খুবই কম খরচে চলে এবং কাজে এরা যথেষ্ট সফল (অন্তত, তুলনা করে বললে)। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রাপ্ত সুবিধার তফাত শুধু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদেরই নয় (তাঁদের অনেকেই এ বিষয়ে মুখর) সাধারণভাবেই চিন্তার বিষয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে যেহেতু প্রধান যুক্তিই হল কম বেতনে চালানোর সুবিধা এবং এর ফলে একটি অন্যভাবে অব্যবহৃত সম্পদকে কাজে লাগানো যায়, সেই হেতু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বেতনবহির্ভূত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার প্রবণতাটা দূর করা বিশেষ জরুরি। এখানকার শিক্ষিকাদের বেতন প্রাপ্তিতে অনিয়ম, ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধার অভাব (তারা এখানে কেবল পাঠ্যবই বাবদই অনুদান পায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অন্যান্য যে সুবিধা মেলে তা কোনওটাই পায় না)। পড়ানোর জায়গাতেই সুযোগসুবিধার অভাব, দুপুরের খাবার বা অন্যরকম খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত না থাকা (কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা এ-ও দেখেছি যে অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয় থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুকে আনা যাচ্ছে না কেন না অঙ্গনওয়াড়ি তাদের খাবার বরাদ্দ থাকে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে থাকেনা) ইত্যাদি বিষয়গুলি এর মধ্যে পড়ে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুরা কেবল বিনামূল্যে বই পায়, অথচ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের বই ছাড়াও চাল বরাদ্দ থাকে, তফসিলী জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের শিশু ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের পোশাক বরাদ্দ থাকে। শিশুদের স্বার্থরক্ষার কাজে যদি আরো একটু অর্থব্যয় করা হয় (খাবার বরাদ্দ হলে নিঃসন্দেহে সে কাজ অনেক উপায়ে করা যেতে পারত) তা হলে এই সকল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সফলতর হতে পারে।

(৮) মধ্যাহ্ন ভোজনকে প্রকৃত মধ্যাহ্ন ভোজন করার পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। কোলকাতার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য ১০ই নভেম্বর, ২০০১ সালে আমাদের প্রাথমিক রিপোর্টে উপরোক্ত সুপারিশ ছিল। এরপর সুপ্রিম কোর্ট স্বয়ং এই সুপারিশের কার্যকারিতার দাবি জানিয়েছেন। ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গার মতোই পশ্চিমবঙ্গেও মধ্যাহ্নভোজনের যে ব্যবস্থাটি আছে তার সঙ্গে মধ্যাহ্ন বা ভোজন কোনোটিরই সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে কোনও রান্নাবান্নারও সম্পর্ক নেই। নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য (মোট দিনের আশি শতাংশ উপস্থিতিকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে) ছাত্র-ছাত্রীদের তিন কিলোগ্রাম করে কাঁচা চাল দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অনেক গোলমাল হয়ে থাকে (অন্য ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে বলে আমরা জানি, এখানেও ব্যাপারটা তেমনই, আলাদা কিছু নয়)।

মধ্যাহ্নভোজন বাবদ খরচ অল্প কিছু বাড়বে। কিন্তু (১) শিশুর পুষ্টি যোগানোর কাজে এটা খুবই সহায়ক হবে, (২) বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার অনেক বাড়িয়ে দেবে, (৩) শুকনো খাদ্যের অপব্যবহার এবং তা নিয়ে দুর্নীতি কমানো যাবে। দরিদ্রতর পরিবারের একবেলা খেতে পাওয়া কয়েকটি শিশুকে আমরা দেখেছি যারা আধপেটা খায় বলে ক্ষুধার জন্য বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার কাজও করতে পারে না। পুষ্টির পূর্তিই কেবল নয় (আফ্রিকার নিম্ন সাহারা অঞ্চলসহ দুনিয়ার অন্য বেশির ভাগ অঞ্চলের তুলনায় ভারতে শিশুদের অপুষ্টি থাকার দৃষ্টান্ত সংখ্যার মাপে বেশ উঁচু) তা বিদ্যালয় শিক্ষাকেও ফলপ্রসূ করে তুলতে অনুপূরকেরও কাজ করে। এ ছাড়া, প্রকৃত দ্বিপ্রাহরিক আহার 'শূন্যগর্ভ' কথার কথা নয়, প্রকৃত অর্থে শিশুদের বিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে (আগে বলা হয়েছে, আমরা যে যে দিনে বিদ্যালয়গুলিতে গিয়েছিলাম বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখানো শিশুদের মাত্র ৫১ শতাংশ সেদিন উপস্থিত ছিল)।[৯]

উপসংহার

আমাদের বর্তমান অন্বেষণ সীমাবদ্ধ অঞ্চলে হলেও চিহ্নিত সমস্যার ধরন-ধারণের মিল পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় ব্যবস্থার যে কিছু আমূল সংস্কার দরকার তার আভাস দেয়। এর জন্য শ্রেণিবিভেদকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সমাজে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অবহেলিত মানুষজনের সেবক সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের দিকটাতে জোর দেওয়ার কথাও বলার দরকার আছে। সবকিছু ছাড়িয়ে প্রয়োজন শ্রেণিবিভেদের যে অনড় বাধা আর্থিক এবং সামাজিক সুযোগবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করছে, সেই বাধা সরিয়ে দেওয়া। এই পরিবর্তন বেশি এগিয়ে থাকা মনে হলেও ভূমিসংস্কার এবং আঞ্চলিক প্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সাহস দেখিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে এটা করতেই হবে।

সাম্প্রতিক পরিবর্তন থেকে অনেক কিছু পাওয়া গেছে। বিশেষ করে শিশু শিক্ষা

কেন্দ্রগুলিতে যেখানে খরচ কম এবং ফল আপাতদৃষ্টিতে বেশি। তবু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় কম সুবিধা পায়, এবং এই অসঙ্গতি কিছুটা কমানো যেতে পারে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যয়োপযোগিতাকে বানচাল না করেই এ কাজ করা যেতে পারে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা যেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান পথ, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে না দেখে।

নিঃশুল্ক শিক্ষাতে সব শিশুর এখন আর অধিকার নেই। বিশেষ করে গৃহশিক্ষকতার কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়ার পরে। এই অনভিপ্রেত কাজটির চালু থাকাটাই বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার অক্ষমতাকে তুলে ধরে। যাঁরা খরচ করতে পারেন কেবল তাঁদেরই পর্যাপ্ত শিক্ষা পাওয়ার সামাজিক বৈষম্যকে দেখিয়ে দেয় এই ব্যবস্থা। ভারতের অন্যত্র বহু জায়গায় এই সমস্যা বর্তমান এবং পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে এর সমাধান করে তা জানা বাকি দেশের পক্ষেও খুব আগ্রহজনক এবং প্রাসঙ্গিক হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যবহারযোগ্য সম্পদের বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ সম্পদকে দক্ষতার সঙ্গে সমান ব্যবহারের কাজে লাগানো ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষকরা আর বেতনব্যবস্থায় শোষিত নন। তাঁদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকারের আমূলবৃদ্ধি ঘটার প্রয়োজন। পুরস্কারের সঙ্গে দায়িত্ব আসে, এবং এটা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী যে তাঁরা যে শিশুদের কাছে পৌঁছতে চান তাদের সঙ্গে প্রচুর আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবধানের দূরত্ব সৃষ্টিকারী নতুন একটা সুবিধাভোগী শ্রেণি যাতে তাঁরা হয়ে না ওঠেন। একাত্মতা ব্যাপারটি অংশত রাজনৈতিক এবং নৈতিক দায়িত্বের বিষয়, কিন্তু এর সঙ্গে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার একটি আন্তঃসম্পর্কও আছে। এবং একাত্মতার দুই দিকই পরীক্ষা করে দেখা জরুরী। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার কিছু মূল প্রশ্নকে (যা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত) আমাদের গবেষণা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে। সে অনুসন্ধান যতই প্রাথমিক পর্যায়ের হোক না কেন।

টীকা :

১। বিশেষ দ্রষ্টব্য, পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্স (নিউ দিল্লি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯)-এর সঙ্গে PROBE দল কর্তৃক প্রস্তুত, 'দ্য প্রোব রিপোর্ট' নামে যা পরিচিত। জ্যঁ দ্রেজ ও আমার যৌথভাবে লেখা, ইন্ডিয়া : ইকনমিক ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল অপরচুনিটি (*দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫*), এবং এর পরবর্তী কাজ, ইন্ডিয়া : পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, ২০০২-তে পূর্বোক্ত কিছু ত্রুটি ও তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২। আমার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ভিত্তিতে এই দুটি ট্রাস্ট গড়ে তোলা হয়েছিল। ভারতীয় ট্রাস্টটি তিনজন ট্রাস্টি — অন্তরা দেব সেন (ম্যানেজিং ট্রাস্টি), দীপঙ্কর ঘোষ এবং আমি। বাংলাদেশ ট্রাস্টের সভাপতি হলেন রহমান শোভান, এবং অন্য

ট্রাস্টিরা হলেন, কামাল হোসেন, ফজলে হাসান আবিদ, সুলতানা কামাল এবং মেঘনা গুহঠাকুরতা।

৩। প্রতীচী ভবনের কাজে নিয়োজিত সম্পদে নোবেল পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত, প্রদত্ত অর্থকে সম্পূরিত করবে ট্রাস্টকে দেওয়া ভারত সরকারের একটি ভালো টাকার অনুদান।

৪। এই গবেষণার কাজে তিনজন গবেষক ছাড়াও উপদেশ, পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে উপকৃত করেছেন স্যমন্তক দাস, শিবাদিত্য সেন এবং অরবিন্দ নন্দী।

৫। ভারতের মূল্যবান বিচিত্র সম্ভার থেকে শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব অন্যান্য সহযোগীদের সহযোগিতায় জ্যঁ দ্রেজ ও আমার যৌথভাবে করা বহু কাজের একটি প্রধান বিষয়। দ্রষ্টব্য : ইন্ডিয়া : ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন (২০০২); এবং দ্রেজ ও সেন সম্পাদিত ইন্ডিয়ান ডেভলপমেন্ট : সিলেকটেড্ রিজিওনাল পারস্পেকটিভ (*দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,* ১৯৯৬)।

৬। এ ব্যাপারে সি. মালিক সম্পাদিত ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ (*সিমলা, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডি,* ১৯৭০) এ প্রকাশিত লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক বক্তৃতা, 'ভারতবর্ষে শিক্ষার নানা দিক', পি. চৌধুরী সম্পাদিত, আস্পেক্টস্ অব ইন্ডিয়ান ইকনমিক ডেভলপমেন্ট (*অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, লন্ডন,* ১৯৭২) এ আমার রচনাটি দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য, জ্যঁ দ্রেজ-এর সঙ্গে আমার যৌথভাবে লেখা, ইন্ডিয়া : ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল অপরচুনিটি (১৯৯৫) এবং ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন (২০০২)। এ ছাড়াও দেখুন ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট : সিলেকটেড্ রিজিওনাল পার্সপেকটিভ (১৯৯৬) এ প্রকাশিত জ্যঁ দ্রেজ ও হ্যারিস গজদার, ভি.কে. রামচন্দ্রন এবং সুনীল সেনগুপ্তর গবেষণাপত্র।

৭। এ ব্যাপারে তুলনামূলক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্য সন্তোষ মেহরোত্রা এবং পিটার বাকল্যান্ডের, "ম্যানেজিং স্কুলটিচার কস্টস্ ফর অ্যাক্সেস্ অ্যান্ড কোয়ালিটি ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : এ কমপারেটিভ অ্যানালিসিস্", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি, ৩৬, ডিসেম্বর ৮, ২০০১ দ্রষ্টব্য।

৮। এই গবেষণাগুলির সঙ্গে ভারতের অন্যত্র করা কাজের সঙ্গে খুবই মিল আছে। বিশেষত দ্রষ্টব্য প্রোব রিপোর্ট (*পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া*), ১৯৯৯।

৯। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাদ্য কোনও অনতিক্রম্য বাধা হতে পারে না। যে দেশে সরকারি গুদামে ৬ কোটি টনের বেশি খাদ্যদ্রব্য মজুত থাকে (কোনোরকম যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই) সেখানে আরও অনেক পরিকল্পনাও তৈরি করা সম্ভব। এই বিষয়টি ১৩ নভেম্বর, ২০০১ এ নয়াদিল্লিতে আমার দেওয়া নেহরু স্মারক বক্তৃতার ('ভারতে শ্রেণি বিভাগের তাৎপর্য') বিষয়গুলির অন্তর্গত ছিল। এছাড়া ডিসেম্বর, ২০০১ এর দ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। রাজ্যগুলির অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা এ ব্যাপারটির ক্ষেত্রে নিকটতর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু তা করা অসম্ভব এ কথা বলা যায় না।

পর্ব : ১

১.১ পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা – একটি অবলোকন

আমাদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ মানুষকে খুশি করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান অবস্থার কারণ এবং পরিণতির ব্যাপারে মতামতের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনার অঙ্ক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের যথেষ্ট উন্নতি দেখাচ্ছে। এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের হ্রাস (১৯৮১-৯১ এর ২৪.৭৩ শতাংশ থেকে ১৭.৮৪ শতাংশে, এই সংখ্যা জাতীয় হার ২১.৩৪ শতাংশের নীচে), নারী-পুরুষ অনুপাতের উন্নতি, যা এখন ৯৩৪ (১৯৯১ এ ছিল ৯১৭), জাতীয় হার ৯৩৩ থেকে উপরে। যে সব রাজ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করতে সফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তাদের মধ্যে তিন নম্বরে (৬.৮৯ শতাংশ) — অন্ধ্রপ্রদেশ (১০.৩৩ শতাংশ হ্রাস) এবং ছত্তিশগড়ের (৭.৬৭ শতাংশ হ্রাস) পরে।

সাত বছরের উপরের বয়সের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ নারী-পুরুষ অনুপাতের উন্নতি করেছে। ১৯৯১ এ যা ছিল ৯০৭, এখন তা ৯২৯। যদিও সাত বছরের তলার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অনুপাত একটু নীচে নেমেছে। ১৯৯১ এ যা ছিল ৯৬৭, এখন তা ৯৬৩।

গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো করেছে।[১] গোটা দেশের নজর কেড়ে পঞ্চায়েতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে এ রাজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এত সব উন্নতি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে ভারতের ৩৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে কেবল ১৮ নম্বর স্থানেই আসতে পেরেছে। ১৯৯১ সালের ১৯ নম্বর স্থান থেকে এক ধাপ এগিয়ে। সাক্ষরতার হার (সাত বছর এবং তার উপরের জনসংখ্যায়) ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৬৯.২২ শতাংশ হয়েছে। পুরুষ জনসংখ্যার ৭৭.২২ শতাংশ যেখানে সাক্ষর, নারীদের মধ্যে সেই সংখ্যা ৬০.২২ শতাংশ। যদিও বলা হয় গত দশকে (১৯৯১-২০০১) পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ২ কোটি কমানো হয়েছে, এই সংখ্যা নিরক্ষরদের সংখ্যাহ্রাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের অবদানের তুলনায় খুবই কম।[২] নিরক্ষরদের সংখ্যা কমানোর অবদানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৭ নম্বরে এবং শতাংশের হিসাবে অবদান ৮.২৬ শতাংশ। পুরুষ নিরক্ষরদের সংখ্যা কমানোর অবদানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৬ নম্বরে এবং শতাংশের হিসেবে ৭.০৩। নিরক্ষর নারীর সংখ্যা-হ্রাসে এ রাজ্যের অবস্থা সামান্য ভাল — ৫ নম্বর স্থানে এবং শতাংশে ১০.৭৭। আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গে এখনও এক কোটি নিরক্ষর নারী আছেন। এবং গত দশকে নিরক্ষর নারীদের গড়পড়তা সংখ্যাহ্রাস বছরে এক লাখের একটু বেশি (দশ বছরে নিরক্ষর নারীর সংখ্যা হ্রাস - ১১,৩১,৯৬০)।[৩]

পশ্চিমবঙ্গে মোট নিরক্ষর মানুষের ৩১ শতাংশের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। এর অর্থ ১৯৭৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এ রাজ্যের শাসনভার যাঁদের উপর,

সেই বামফ্রন্টের রাজত্বকালেই এঁরা বড় হয়েছেন। তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার এখনও পর্যন্ত ৪২.২১ শতাংশ। জনজাতিদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি তিরিশের নীচে।[৪]

নাম লেখানো আর স্কুল ছাড়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী ৫২,৩৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৮৪,৯৪,০০০ শিশু ভর্তি হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছু গড়পড়তা ১৬২.১৪টি শিশু।

১৯৯৭-৯৮ সালে ৬-১১ বছর বয়সসীমার মোট শিশু সংখ্যার ১৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। এই সময়সীমার ভর্তির মোট হার ছিল ৮৫.৬০ শতাংশ এবং প্রকৃত ভর্তির হার ছিল ৪০.২ শতাংশ। আরও আশঙ্কাজনক ঘটনা হল, বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। ১৯৯৭-৯৮ সালে এর হার ছিল ৩৮.৪ শতাংশ। ছাত্রদের বিদ্যালয় ছাড়বার হার যেখানে ৩৫.৮ শতাংশ, ওই সময়ে ছাত্রীদের ছাড়বার হার ছিল ৪১.৩ শতাংশ। প্রকৃত হাজিরাও সন্তোষজনক স্তরের চেয়ে অনেক নীচে বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৬ শতাংশ। দুর্ভাগ্যবশত: এই রিপোর্ট রাজ্যের ১৮টি জেলার মধ্যে কেবলমাত্র ১০টি জেলা (প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প – ডি.পি.ই.পি.) থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান এর ভিত্তিতে করা। শিক্ষা দফতরের কিছু কর্মচারী আমাদের বলেছেন যে এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দিতে পারা যাবে না।[৫]

শিক্ষক-শিক্ষিকা

২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ১,৫৬,২৫৫ জন শিক্ষক (মোট সংখ্যার ২৪.৪৬ শতাংশ মহিলা শিক্ষক) কর্মরত আছেন। ওই তারিখে ২৫,৪৮৭টি শূন্য পদ ছিল বলে জানানো হয়েছে (এই রিপোর্টে শিক্ষকদের জাতি-ভিত্তিক ভাগ পাওয়া যায়নি)। অর্থাৎ প্রতি বিদ্যালয়ে গড়ে ২.৯৮ জন শিক্ষক আছেন। এটি দেখায় যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বর্তমান অনুপাত ৫৪:১, যা সরকার ঘোষিত অনুপাত (৪০:১) এর অনেক উপরে, এবং এই অবস্থা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্যই অত্যন্ত কষ্টকর।[৬]

প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ দূরত্ব

পশ্চিমবঙ্গের ৯৬,৩১১টি জনবসতির মধ্যে ৮৪,৬৩৬টি এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯,৯৪০টি বসতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে, ১৯৩৫টিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ২ কিলোমিটার দূরত্ব ছাড়িয়ে।[৭]

বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা

২০০১ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার (এস.ইউ.সি.আই.) ২,৪৫০টি বিদ্যালয়ের কোনও বাড়ি নেই বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট একটু অন্য অঙ্ক দেখায়। এই রিপোর্ট বলে যে ১৩৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনও ক্লাসঘর নেই। রিপোর্ট আরও বলে যে ১২,০৪৫টি বিদ্যালয়ে একটি করে ক্লাসঘর এবং ১২,০৮৫টি বিদ্যালয়ে দুটি করে ক্লাসঘর আছে।[৯]

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

দূরগম্য এলাকার শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশু শিক্ষা কর্মসূচি নামে একটি শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা শুরু করেছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ১১,০০০ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চলছে (ধার্য লক্ষ্যমাত্রা ২০,০০০ এর মধ্যে)। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের আদর্শের ভিত্তি শিক্ষায় জনসমাজের অংশগ্রহণ এবং শিশুদের অনুপ্রেরণা যোগানো। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উপসচিব (এই কর্মসূচির তদারকি করার দায়িত্ব যে দফতরের) দেবকুমার চক্রবর্তীর কথায় এগুলিকে অতিরিক্ত বিদ্যালয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।[১০] এদের আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাস একই এবং এখানেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো বিনামূল্যে বই দেওয়া হয়। যাই হোক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এখানে শিশুদের পাঠ্যবই সরবরাহ করা ছাড়া কোন উৎসাহ যোগানের ব্যবস্থা নেই। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকারা (সবাই সহায়িকা বলে পরিচিত এবং এদের সবাই মহিলা) মাসে ১,০০০ টাকা থোক মাইনে পান। আমাদের কাছে রাজ্যস্তরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বিষয়ে যথেষ্ট পরিসংখ্যান নেই।

যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর তাঁদের ২০০০-২০০১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নিম্নলিখিত সাহায্য দেবেন।

* প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু ১,০০০ টাকা অনুদান
* প্রতি সহায়িকা পিছু ২৫০ টাকার টি.এল.এম. অনুদান[১১]
* প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু ৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদান
* শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান সুনিশ্চিত করতে সহায়িকাদের সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রশিক্ষণ দান।

রিপোর্টে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যানও আছে। কিন্তু সেগুলি কেবল ১০টি ডি.পি.ই.পি. জেলার পরিসংখ্যান।[১২] সে যাই হোক (মোট ১১,০০০ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে) শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ১০টি জেলায় মাত্র ৪,৫১১টি কেন্দ্র থাকাটা কিছু বিস্ময়কর। ডি.পি.ই.পি.র অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ৮টি জেলার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর সংখ্যা ৬,৪৮৯টি।[১৩]

অসমতা

প্রাথমিক শিক্ষার এই হতাশাব্যঞ্জক অসমতার জন্য কিছু সমালোচক যখন পরিকাঠামোর অভাবের দিকটাকে বড় করে তোলেন, অন্য অনেকে দায়ী করেন বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানকে।[১৪] বিদ্যালয় শিক্ষার গুণমানকে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বব্যাপ্তির লক্ষ্যসাধন করতে না পারার পিছনে মনে হয় বিদ্যালয় শিক্ষার গুণমান, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ এবং অন্য অসামঞ্জস্যের কিছু কম ভূমিকা নেই।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত[১৫] একটি প্রতিবেদনে ডি.পি.ই.পি.র একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে বিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ শিশুকে গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নিতে হয়। ওই একই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বলছে প্রতি শিশুর শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৪৪ শতাংশ গৃহশিক্ষকতার জন্য খরচ হয়। এমন কি মন্ত্রীরাও স্বীকার করেন শিক্ষার গুণগত মানের অবনতিই শিশুদের গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নিতে বাধ্য করে। এর ফলে শিক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

১.১.১ সাক্ষরতার হার এবং জনগোষ্ঠীগত চরিত্র[১৬]

জেলা (২০০১ সালে সাক্ষরতার অবস্থান)	জনগোষ্ঠীগত চরিত্র	সাক্ষরতার শতাংশ হার	১৯৯১ সালে স্থান
বাঁকুড়া (১২)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (৩১%) ও আদিবাসী (১০%) জনসংখ্যা	৬৩.৮৪	১০
জলপাইগুড়ি (১৩)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (৩৭%) ও আদিবাসী (২১%) জনসংখ্যা	৬৩.৬২	১৪
বীরভূম (১৪)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (৩০%) ও আদিবাসী (৭%) জনসংখ্যা	৬২.১৬	১১
পুরুলিয়া (১৫)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (১৯%) ও আদিবাসী (১৯%) জনসংখ্যা	৫৬.১৪	১৫
মুর্শিদাবাদ (১৬)	উঁচু হারে মুসলিম জনসংখ্যা (৬০% এর উপরে)	৫৫.০৫	১৬
মালদা (১৭)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (১৮%) ও আদিবাসী (৬%) এবং লক্ষণীয় মুসলিম জনসংখ্যা	৫০.৭১	১৭
উত্তর দিনাজপুর (১৮)	উঁচু হারে তফসিলী জাতি (২৯%) ও আদিবাসী (৫%) এবং লক্ষণীয় মুসলিম জনসংখ্যা	৪৮.৬৩	১৮

শুধুমাত্র আর্থিক বৈষম্য নয়, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যগুলিও যথেষ্ট বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আগে দেখেছি যে তফসিলী জাতির মাত্র ৪২ শতাংশ শিক্ষিত। তফসিলী জনজাতির ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান কোনো নতুন কাহিনি শোনাবে না। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম মনে হচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অসমঞ্জতা সামাজিক অসাম্যের ভিতর দৃঢ়ভাবে গাঁথা হয়ে আছে। সংলগ্ন সারণীটি বলে,

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে শেষ সাতটি জেলার জনসংখ্যায় উঁচু হারে রয়েছে তফসিলী জাতি, জনজাতি এবং মুসলিম সম্প্রদায়। সারণী পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে কিছু কিছু শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া জেলা সাক্ষরতায় তাঁদের নীচু অবস্থান বজায় রেখেই চলছে। অন্য কয়েকটি জেলার ক্ষেত্রে (যেমন বাকুড়া ও বীরভূম) এটি অধোমুখী। কেবল জলপাইগুড়িই সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক ধাপ উঁচুতে উঠে পড়তে পেরেছে।

শিক্ষায় রাজনীতি

বর্তমান বামফ্রন্ট যদিও শিক্ষকদের কিছু অংশের কর্মবিমুখতার প্রবণতাকে স্বীকার করেছেন এবং শিক্ষকদেরও এখন কঠোর সমালোচনা এবং হুঁশিয়ারি শুনতে হচ্ছে, তবুও মনে হয় রাজনৈতিক দলে মধ্যে এঁদের একটা শক্তিশালী প্রভাব আছে।[১৭] আমাদের সমীক্ষাকৃত এলাকার গ্রামবাসীরাই শুধু নন, বহু রাজনৈতিক নেতাও স্বীকার করেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা গ্রামীণ রাজনীতি নিরূপণ এবং চালনা করার ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের আমলের এক মন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের কারণ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়ী করেন।[১৮] শোনা যায়, তিনি শিক্ষকদের কাজের কড়া সমালোচনা করে এবং রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা ছেড়ে শিক্ষার কাজে যোগ দিতে বলে হুঁশিয়ার করে শিক্ষকদের চটিয়ে দিয়েছিলেন। এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বীকার করেন শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার যথেষ্ট উঁচুতে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক নেতা তাঁদের চটাতে সাহস করেন না যেহেতু নির্বাচনে তাঁরা এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকেন।[১৯] তিনি বলেন তাঁরা কেবল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়ই নন, তাঁদের অনেকেই পঞ্চায়েতেরও সদস্য। সি.পি.আই.এম.-এর এক আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক[২০] এ কথাও বলেন যে, যে শিক্ষকরা তাঁদের কাজে নিষ্ঠাবান নন তাঁরা রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিও নিষ্ঠাবান নন। তিনি স্বীকার করেন যে একটি আঞ্চলিক কমিটির মোট ৬০ সদস্যের মধ্যে ৪০ জন প্রাথমিক শিক্ষক এবং এঁদের ৫-৬ জন মাত্র রাজনৈতিক কাজ ও শিক্ষকতার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবং যেহেতু কিছু পরিমাণ অর্থ দলকে চাঁদা বাবদ দিতে হয়, তাই বহু শিক্ষক দলের সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছেন। এই নেতা অবশ্য দল বা সরকারকেও ছেড়ে কথা বলেন না। সরকারের নিষ্ঠা নিয়েও তাঁর প্রশ্ন আছে এবং বলেন ক্ষমতাশীল দল শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক নীতি নিয়েছে। যেহেতু অশিক্ষা তাঁদের ভোট ব্যাঙ্ককে সুনিশ্চিত রাখে, সেইজন্য। শিক্ষা মানুষের আনুগত্যে চিড় ধরাতে পারে। তিনি বলেন, "লোকে শিক্ষিত হয়ে গেলে কেবল গণশক্তিই পড়বেন না, অন্য কাগজও পড়বেন।" তিনি মনে করেন, "এ জন্যই সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য আবশ্যিক করার ব্যাপারে আন্তরিক নন।"

এই তিন নেতাই দুর্দশাগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি (অনেক বিদ্যালয়ের কোনও বাড়িই নেই) পড়াশোনার যোগ্য করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। বিদ্যালয়ের সরকারি পরিদর্শনেরও একই অবস্থা -- শিক্ষকদের কারও কাছে

জবাবদিহির কোনও ব্যাপারই নেই।

আমাদের সাক্ষাৎকারে বহু শিক্ষকই শিক্ষার এই নৈরাশ্যজনক পরিবেশের জন্যও সরকারকে দায়ী করেন। মেদিনীপুর জেলার এক প্রাথমিক শিক্ষক স্বীকার করেন যে পঞ্চায়েতের কাজের জন্য তাঁর মাসে চারদিন সময় ব্যয় হয় এবং এই চারদিন তাঁর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না। তিনি বলেন, "আমি নির্বাচনে লড়তে চাইনি, কিন্তু দল আমাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করেছে।" যদিও তিনি শিক্ষকদের নির্বাচনে নামার গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হতে দিতে চান না।[২১]

একজন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি স্বীকার করেন যে শিক্ষক সমিতিগুলির মাধ্যমে বোঝা যায় সংসদে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠী আছে। তিনি স্বীকার করেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বন্টনের কাজটি সংসদ এখনও বাধাহীনভাবে করে উঠতে পারেনি। সংসদ যখনই শিক্ষক বন্টনের কাজটি ঠিকমত করার জন্য শিক্ষকদের এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলির চেষ্টা করেছে, একটি বিশেষ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে।[২২]

সরকারি কর্মপরিকল্পনা[২৩]

রাজ্য সরকার ২০০৬-০৭ সালের মধ্যে ৬-১১ বছর বয়সসীমার শিশুদের ৯৮ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার ভার নিয়েছেন। এতে ৩০,০০০ অতিরিক্ত শিক্ষক লাগবে এবং ৫,৬০০টি নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা, স্কুলছুটের সংখ্যা হ্রাস করা, ভর্তি এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য 'জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (ডি.পি.ই.পি.)' নামে একটি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (১৯৯৭-৯৮) কাজ শুরু হয়েছিল পাঁচটি জেলায় এবং সে কাজ তারপর থেকে আরও পাঁচটি জেলায় বিস্তৃত হয়েছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের ১৫ শতাংশ ব্যয়ভার নেন এবং এই খাতে ২০০০-২০০১ সালে ১,২০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি ৮৫ শতাংশ অর্থ যোগান দেন ইংলন্ডের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দফতর (ডি.এফ.আই.ডি.)।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ডি.পি.ই.পি.র প্রথম পর্যায়ের কাজ খুব সফল হয়নি। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কল্পনাটি ভাল ফল দেয়নি বলে ডি.পি.ই.পি.র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।[২৪] ডি.পি.ই.পি.র বাজেটের পঞ্চাশ শতাংশ এই প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ হয়েছে, কিন্তু তা ক্লাসঘর অবধি পৌঁছয়নি। ডি.পি.ই.পি. এখন তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনতার অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে গ্রাম শিক্ষা কমিটি ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিগুলির উপর জোর দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের ২০০০-২০০১ সালের আর্থিক রিপোর্ট অবশ্য দেখাচ্ছে যে ১০টি ডি.পি.ই.পি. জেলায় তফসিলী জাতি ও জনজাতি এবং বালিকাদের ভর্তির হারে আশাপ্রদ পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিগুলি এ কাজে সহায়তা করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী এই ১০টি জেলায় ১২,৪৪৮টি গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং ৪৬৯টি ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে গিয়েছে।

১.২ আমাদের সমীক্ষা-পদ্ধতি

এই গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের এপ্রিলে এক প্রস্থ প্রশ্নমালা তৈরি করে। গবেষক দলের দু'জন 'PROBE'[২৫] দলের পক্ষ থেকে জ্যঁ দ্রেজ, শিবকুমার, অনুরাধা দে এবং ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের পুনম মুত্রেজার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পান। প্রশ্নমালার মধ্যে ছিল :

(ক) **মা-বাবাদের জন্য পারিবারিক স্তরের প্রশ্ন** -- শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, পরিত্যাগ, বিদ্যালয়ে শিক্ষা বাবদ খরচ, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিশুর প্রগতি, অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি। প্রতিটি বাড়ি থেকে বিদ্যালয়গামী একটি শিশুর সাক্ষাৎকারের জায়গাও ছিল এই প্রশ্নমালায়।

(খ) **বিদ্যালয়ের জন্য প্রশ্নমালা** -- প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত প্রশ্ন যেমন, ভর্তি, উপস্থিতি, শিক্ষার পদ্ধতি, পরিকাঠামো, উৎসাহদান পরিকল্পনা-সহ -- প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রশ্নমালাটি পূরণ করা হয়।

(গ) **গ্রাম শিক্ষা কমিটি সদস্যদের জন্য প্রশ্নমালা** -- গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন, বৈঠকের আলোচ্য বিষয় তালিকা, প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন।

(ঘ) **অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য প্রশ্নমালা** -- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির কাছ থেকে প্রত্যাশিত কাজকর্ম বিষয়ে প্রশ্ন।

প্রশ্নমালা ভরা ছাড়াও গবেষকরা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদের সদস্য, রাজ্যের ও জেলার ব্লক স্তরের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কর্মসূচীর প্রধান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি, রাজনৈতিক নেতা, বিদ্যালয়ের জেলা পরিদর্শক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, গ্রামবাসীদের ও নির্বাচিত উত্তরদাতা ছাড়াও অন্য বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নেন।

জেলা নির্বাচন

প্রাথমিক শিক্ষাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জেলা ঠিক করাই ছিল নির্বাচনের ভিত্তি। বীরভূমকে যেমন গড়পড়তা একটি জেলার আদল হিসাবে বাছা হয়েছিল, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলাকে তেমন তুলনামূলক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা ও পিছিয়ে থাকা দুটি জেলা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

ব্লক নির্বাচন

বীরভূম ও মেদিনীপুর -- এই দুই জেলাতেই কোনও বাছবিচার না করে ব্লক ঠিক করা হয়েছিল। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বিন্যাসের ধরণের জন্য এভাবে এই কাজ করা যায়নি। এখানকার কিছু কিছু ব্লকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সংখ্যায় অত্যন্ত কম এবং একটি ব্লকে কোনও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রই নেই। সেই কারণেই পুরুলিয়ায় আমাদের সমীক্ষার সময় ব্লক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা একটি ব্লকের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যার উপরেই জোর দিয়েছিলাম।

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি (পুরুলিয়ার দুটি এবং মেদিনীপুরের দুটি ব্লকের), বিদ্যালয় পরিদর্শক (বীরভূমের দুটি ব্লকে) এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সুপারভাইজারদের (প্রতি জেলার ১টি ব্লকে) সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছিল।

নিম্নলিখিত বিচারের মাপ কাঠিতেই গ্রামগুলি নির্বাচন করা হয় :

(ক) গ্রামে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থাকতে হবেই

(খ) গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতেই হবে। সমীক্ষার গ্রাম/অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। ১৮টি গ্রামের মধ্যে ১৭টি গ্রামে এই বিশেষ লক্ষণগুলি দেখা গিয়েছিল। এবং এভাবে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার প্রত্যেকটি থেকে ৬টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬টি করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু বীরভূমের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যা ৬ হলেও সমীক্ষাকৃত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৫টি।

পরিবার নির্বাচন

গ্রামের পরিবারগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করার পর (বসতি বেশি হলে বা ছড়ানো-ছিটানো হলে একটা আংশিক তালিকা তৈরি করা হয়েছিল) আমরা যে যে বাড়িতে ৬-১১ বছর বয়সী শিশু পাওয়া গেছে সেগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম। তারপরে নির্বিচার চয়ন পদ্ধতিতে পরিবারগুলিকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। নির্বাচনের কিছু ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য কিছু স্বাধীনতা নিয়েছিলাম। যেমন, এমন কিছু পরিবার যেগুলির প্রধান হচ্ছেন মহিলা; যে সব বাড়ির শিশুরা বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে এবং যে সব বাড়ির শিশুরা কোনও দিন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।

১.৩ নির্বাচিত তিনটি জেলা

সমীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের যে তিনটি জেলা বেছে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল বীরভূম, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া।

বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য-পশ্চিমে বীরভূম জেলা অবস্থিত। এই জেলার কিছুটা অঞ্চল গঙ্গার অববাহিকায়, কিছুটা সাঁওতাল পরগণা এলাকার দিকে ব্যাপ্ত। পাকুড় (ঝাড়খন্ড) এবং মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) -- উত্তরদিকে এই দুই জেলার সঙ্গে বীরভূমের সীমানা। এর পূর্বদিকের সীমানা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে। অজয় নদী ঘিরে রেখেছে গোটা দক্ষিণ দিকের বর্ধমানের সঙ্গে সীমান্ত এলাকাকে। পশ্চিমে ঘিরে আছে ঝাড়খন্ডের দুমকা জেলা। জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তন ৪,৫৪৫ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৩.৭৫ ভাগ এবং রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪.৩০ ভাগের অবদান এই জেলার। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ৩০,১২,৫৪৬ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৬৩ -

মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৩১ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ তফসিলী জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে সাক্ষরতায় এই জেলা ১৪ নম্বর স্থানে। ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার ৬২.১৬ শতাংশ। ১৯৯১ ও ২০০১ সালের সময়সীমার মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ১৩.৬ শতাংশ।[২৬]

এই জেলায় ৭,৬৭০ জন শিক্ষক সহ ২,৩৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মহিলা শিক্ষিকা মোট শিক্ষকের মাত্র ১৪.৯৮ ভাগ। ২০০১-২০০২ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত জেলা তথ্য ব্যবস্থা (ডি.আই.এস.ই.) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শ্রেণিতে (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি) ভর্তির সংখ্যা ছিল ৩,৫৭,৫৪৭ জন, যার মধ্যে ৪৮.৪৩ শতাংশ ছিল বালিকা। বিদ্যালয় পিছু ভর্তির গড়পড়তা সংখ্যা যথেষ্ট উঁচু। বিদ্যালয় পিছু ১৫৩.১৯ জন শিশু। মোট শিক্ষার্থীদের শতকরা ৩৪ ও ৭ শতাংশ যথাক্রমে তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৬:১। অঙ্কটি রাজ্যের চেয়ে ভাল হলেও অন্য দুটি সমীক্ষাকৃত জেলার চেয়ে খারাপ। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি স্বীকার করেছেন, শিক্ষক বন্টনে এই জেলায় সমস্যা আছে। জেলার ১৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে একজন করে শিক্ষক নিয়ে। শিক্ষক সমস্যা ছাড়াও স্কুলবাড়ি সংক্রান্ত সমস্যা আছে। ১৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনও বাড়িই নেই।[২৭]

<u>শিশু শিক্ষা কেন্দ্র</u> : প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে এই জেলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে এবং এখানে ৭৫৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে[২৮]। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কর্মসূচীর দেখাশোনার ভার পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের হাতে।[২৯] প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মোট ১৩,৬০৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপর যেখানে বিশাল সংখ্যক ছাত্রের বাড়তি বোঝা রয়েছে, সেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু গড়পড়তা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৮ জন এবং ছাত্র-শিক্ষিকা অনুপাত ১৮ : ১। বিদ্যালয় পিছু গড়ে একজন করে শিক্ষিকা।[৩০] যেহেতু কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রতে একজনের বেশি শিক্ষিকা নেই তাই তার অর্থ দাঁড়ায় কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে যেখানে কোনও শিক্ষিকা নেই। আমরা যে পাঁচটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ঘুরেছি তার সব কটিতেই একাধিক শিক্ষিকা আছেন।

জেলায় ডি.পি.ই.পি. ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত জেলর ২,১০৮টি গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে।

মেদিনীপুর (অবিভক্ত)

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণ দিকে মেদিনীপুর। উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, পূর্বদিকে হুগলি আর হাওড়া। দক্ষিণ দিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা। ভূগোল, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বহু জাতির এবং ভাষার জটিল সমন্বয়ে এই জেলা বৈচিত্র্যে ভরপুর।

জেলার পূর্বাঞ্চল যেখানে কম-বেশি বাংলার মধ্য সমতলভূমির মধ্যে পড়ে সেখানে জেলার পশ্চিমাঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার বিস্তৃত অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ছাড়াও এই জেলায় আরও বহুবিধ ভাষায় কথা বলা হয় — মুখ্যত সাঁওতালি, কুর্মালি

এবং ওড়িয়া ভাষায়।

জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বিশাল সংখ্যায় সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, শবর এবং অন্যান্য তফসিলী জনজাতির বাস। জেলার এই অংশ শিক্ষার দিক থেকে অনেক অনগ্রসর। অন্যদিকে জেলার পূর্বাঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় বরাবর সম্মানজনক স্থান পেয়েছে।

এই জেলার ভৌগোলিক আয়তন ১৪,০৮১ বর্গ কিলোমিটার। রাজ্যের মোট এলাকার ১২.২৪ শতাংশ। জনসংখ্যার ১২.১৬ শতাংশ এই জেলার। জনসংখ্যার ঘনত্ব হল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৮৫ জন (এই হিসাব ২০০১ সালের। পরে জেলাটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়)।[৩১]

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলার মোট জনসংখ্যা ৯৬,৩৮,৪৭৩। প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ৯৫৫। ২০০১ সালের জনগণনায় সাক্ষরতার হারে এই জেলা ২ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে নেমে আসে। জেলায় সাক্ষরতার হার ৭৫.১৭ শতাংশ। গত দশকে তা ৫.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধির এই অঙ্ক রাজ্যের বা অন্য দুটি সমীক্ষাকৃত জেলার তুলনায় যথেষ্ট নিচে।[৩২]

এই জেলায় ৯,৬২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মোট শিক্ষক সংখ্যা ২২,২৮৬ এবং প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯,৫০,৫৩৫ জন। ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত যেখানে ৪৩:১, সেখানে বিদ্যালয় পিছু গড়পড়তা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯৮.৭৯ জন। বিদ্যালয় পিছু গড়পড়তা শিক্ষকের সংখ্যা ২.৩১ জন। এর মধ্যে শিক্ষিকারা মাত্র ১৯ শতাংশ।[৩৩]

জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস বা বার্ষিক রিপোর্ট কোনও কিছু থেকেই স্কুলবাড়ি গুলির অবস্থা, একজন শিক্ষক সম্বলিত স্কুলের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা পরিদর্শকের (প্রাথমিক) অফিস থেকে আমাদের ছাত্র ও শিশুদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য (সে তথ্য অনুমোদিত তথ্য নয় বলে ব্যবহার না করার অনুরোধ সহ) দেওয়া হয়েছিল। বার্ষিক রিপোর্ট কেবল ডি.পি.ই.পি. জেলার পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণই করেছে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

মেদিনীপুরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দেখাশোনা করেন জেলা পরিকল্পনা অফিস। এই জেলায় ১৪৫০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। তাতে সহায়িকা আছেন ৩,০২৬ জন। জেলা পরিকল্পনা অফিস থেকে দেওয়া ছাপানো একটি বিবৃতি অনুসারে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৩,৪০৩ জন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে গড়পড়তা ভর্তির সংখ্যা ৩৬ জন এবং ছাত্র-শিক্ষিকা অনুপাত ২১:১। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু গড়পড়তা শিক্ষিকার সংখ্যা ২.০৮ জন। বিবৃতিটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জাতি বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

যাই হোক বিবৃতিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বাড়িগুলির অবস্থা দেখানো হয়েছে। অন্য দুই জেলার বার্ষিক রিপোর্ট আমরা পাইনি। জানা গিয়েছে মোট ১৪৫০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ভিতর মাত্র ২১৯টির নিজস্ব বাড়ি আছে। বাকিদের মধ্যে ৬৪৬টি কোনো ব্যক্তির বাড়ির আঙিনায় বসে। ২৮৬টির ক্লাস ক্লাব ঘরে ও ১৪০টির পড়াশোনা পঞ্চায়েতের

ঘরে চলে। ১৫৮টির ক্লাস নেওয়া হয় খোলা আকাশের নিচে।

পুরুলিয়া

জেলাটি রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব দিকে বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পূর্বে মেদিনীপুর; উত্তরে বর্ধমান এবং ধানবাদ (ঝাড়খন্ড); পশ্চিমে গিরিডি (ঝাড়খন্ড) এবং দক্ষিণে পূর্ব সিংভূম (ঝাড়খন্ড)। ভৌগোলিক আয়তন ৬,২৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং পশ্চিম-বঙ্গের মোট আয়তনের ৩.২৭ ভাগ। জনসংখ্যা রাজ্যের ৩.২৭ শতাংশ।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা ২৫,৩৫,২৩৩ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত ৯৫৩, যা রাজ্যের নারী-পুরুষ অনুপাত থেকে ভাল। জনসংখ্যা-ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৫ জন। জনসংখ্যায় তফসিলী জাতি ও জনজাতির অনুপাত বেশ ভাল -- যথাক্রমে জাতি প্রতি ১৯ শতাংশ। জনসংখ্যায় বিশাল সংখ্যক অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির (যেমন মাহাতো) মানুষও আছেন। গ্রামাঞ্চলের মানুষ কুর্মালি বা মানভুঁইয়া ভাষায় কথা বলেন, বাংলা বলেন কেবল শহরের লোকেরা। পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে সাক্ষরতায় পুরুলিয়া ১৫ নম্বর স্থানে এবং গত দশকে এই স্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। সাক্ষরতার হার ৫৬.১৪ শতাংশ এবং গত দশকে (১৯৯৯-২০০১) সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ১১.৮ ভাগ।[৩৪]

জেলার ২,৯২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৬,১৯১ জন শিক্ষক কর্মরত। এঁদের ১০.০২ শতাংশ মাত্র মহিলা। বিদ্যালয়ে গড়পড়তা ভর্তির সংখ্যা ৯১.৩৭ জন, মোট ভর্তির সংখ্যা ২,৬৭,১৮৯ জন। প্রতি বিদ্যালয়ে গড়পড়তা শিক্ষকের সংখ্যা ২.১১ জন। মোট ভর্তির ২১.০৮ এবং ২০.৯৪ শতাংশ যথাক্রমে তফসিলী জাতির ও আদিবাসী শিশুরা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তি হওয়া শিশুর ৪৫.১০ বালিকা।[৩৫] ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনও বাড়ি নেই, এবং ৭৪১টি বাড়ির (২৫.৩৩ শতাংশ) বড় ধরনের মেরামতির প্রয়োজন। একক শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮১৯টি (২৮.০৪ শতাংশ)।[৩৬]

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

মেদিনীপুর এবং বীরভূমের তুলনায় এ জেলার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত তেমন জোরালো গতিবেগ পায়নি। পুরুলিয়া জেলা পরিষদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ামক কল্যাণ গাঙ্গুলি ৫ই জুলাই, ২০০১-এ এক সাক্ষাৎকারে বলেন এই কর্মসূচী বাবদ অর্থ প্রদানের কাজ তাঁরা কেবলমাত্র শুরু করেছেন এবং বিগত দুই বছর ধরে কাজ করে যাওয়া সত্বেও অল্প কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকেই অর্থ সাহায্য লাভ করেছে। জেলা গ্রামোন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সংযোগ মাধ্যম (নোডাল এজেন্সি) করা হয়েছে। সহকারী প্রকল্প আধিকারিককে নোডাল আধিকারিক করা হয়েছে। তিনি সম্প্রতি কাজে যোগ দিয়েছেন এবং সে কারণে কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ততটা অবহিত নন বলে তিনি জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতরের ২০০০-২০০১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১১৫ জন সহায়িকা নিয়ে জেলার ৯৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে।[৩৭] প্রতিবেদনে মোট ৩,৪৯২ জন শিশু ভর্তির খবর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১,৬৭০ জন বালক,

১,৮২২ জন বালিকা। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু গড়পড়তা ৪৩.৭২ জন শিশু ভর্তি হয়েছে, গড়পড়তা শিক্ষিকার সংখ্যা ১.১৮ জন। ছাত্র এবং শিক্ষিকার অনুপাত ৩০:১।

বরাদ্দ অর্থপ্রদানের কাজ যেহেতু এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি তাই এখানকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির নিজস্ব কোনও বাড়ি হয়নি। বেসরকারি বাসভবনে, ক্লাবঘর এবং পঞ্চায়েত ভবনে পড়ানোর কাজ চলছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

১৯৯৯ সালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের বিস্তৃত কর্মসূচিতে পুরুলিয়াকে একটি ডি.পি.ই.পি. জেলা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। সহকারী প্রকল্প আধিকারিক তপন বসু বলেন যে তাঁরা বালিকাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং স্কুলছুট রোখার উপর জোর দিচ্ছেন।[৩৮] তাঁরা নতুন বিদ্যালয় তৈরি করা এবং যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করছেন। জনসমাজের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন করছেন। এখনও পর্যন্ত খুব কম গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এর কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

সমীক্ষাকৃত এলাকার অবস্থান

তিনটি জেলার ৯টি ব্লকে অবস্থিত ১৮টি গ্রাম অঞ্চল, জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লভ্যতার দিক থেকে যথেষ্ট বৈচিত্র্য যোগায়। কিছু কিছু গ্রাম যেখানে প্রত্যন্ত প্রান্তে অবস্থিত (নিকটতম বাস স্টপ থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে) কিছু গ্রাম সেখানে রাস্তা বা রেললাইনের ধারে। ১৮টি গ্রামের মধ্যে অন্তত ৯টি গ্রাম নিকটতম বাসস্টপ থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে। সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলিতে পরিবারের সংখ্যা ন্যূনতম ৩২ ও সর্বাধিক ১০০০। কিছু গ্রামে অনাহার যেমন একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য, অন্য কিছু গ্রাম আছে যেখানে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি ইত্যাদির সমৃদ্ধির সূচক দেখা যায়। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও বৈচিত্রে কিছু কম নয়। কিছু গ্রাম যেমন পশ্চিমবঙ্গের পাললিক সমতটে অবস্থিত, কিছু গ্রাম যেমন ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের পার্বত্য ভূখন্ডে। এখানে অঞ্চলে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পার্থক্য আছে, আছে কৃষিজীবিকা এবং যোগাযোগ সুবিধার পার্থক্য -- বিশেষ করে সেচ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই পার্থক্য কেবল আন্তঃজেলা বা আন্তঃব্লক নয়, অন্তর্জেলা ও অন্তর্ব্লক-কেন্দ্রিকও বটে।

নির্বাচিত গ্রামগুলির বর্ণ ও শ্রেণিচরিত্র বিভিন্ন ধরনের। কোনও কোনও গ্রামের জনগোষ্ঠীগত চরিত্র একই ধরনের। যেমন বীরভূমের নানুর ব্লকের সূচপুর গ্রামের সব বাসিন্দাই মুসলমান। বীরভূমের রাজনগর ব্লকের ছাতিনা এবং ডেমুরতলা গ্রাম, মেদিনীপুর সদর ব্লকের সোতেরডাঙ্গা, পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের কুলটাড়ে যেমন খেড়িয়া-শবর ইত্যাদি জনজাতির বাস। কিছু কিছু গ্রামে যেমন ছাতিনায় সাঁওতাল ও কোঁড়া জনজাতি জনসংখ্যায় সমান অনুপাতে রয়েছে। বহু গ্রামের জনসংখ্যার চরিত্র জটিল নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় এবং বর্ণ পটভূমির বুনোটে গড়া। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন তফসিলী জাতি, জনজাতি ও মুসলমানরা।

যে সব গ্রামের জনগোষ্ঠীগত চরিত্র বেশি করে সমজাতীয় সেখানকার শ্রেণি-চরিত্রতেও সমানতা বেশি। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক থেকে মিশ্র প্রকৃতির গ্রামগুলিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের জমির মালিক, ব্যবসাদার, কারবারী, চাকরিজীবী, দিনমজুর এবং কারুশিল্পী পাচ্ছি। যেমন, পুরুলিয়ার একটি গ্রাম। সেখানে ব্রাহ্মণ হয় ভূস্বামী বা চাকরিজীবী, মাহাতোরা ছোট চাষী এবং তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা খেতমজুর। সংখ্যায় কম হলেও ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সরকারি পদমর্যাদায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেন। একজন ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়-শিক্ষক একই সঙ্গে গ্রামশিক্ষা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরা বলেছেন যে তফসিলী জাতি ও জনজাতির পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির এবং স্কুলছুটের হার বেশি। যেহেতু মা-বাবাদের রুজিরোজগারের কাজে তাদের সাহায্য করতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি জনজাতির এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলি থেকে বিদ্যালয় বেশি দূরে হয়। যেমন, চারটি সম্পূর্ণ জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে তিনটি গ্রামের ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়গুলি এক কিলোমিটার থেকে বেশি দূরে অবস্থিত। একটি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে, বিচ্ছিন্ন এক এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ঠিকই কিন্তু বিদ্যালয়ের কোনও বাড়ি নেই এবং একজন মাত্র শিক্ষক বিদ্যালয়টি চালান। স্থানীয় মানুষজন এই শিক্ষককে পান না, যেহেতু তাঁরা 'নোংরা' খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়ের লোক। ছাত্রদেরও ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে অনাগ্রহ। একটি আদিবাসী গ্রামের শিশুরা বিদ্যালয়ে পড়তে আসতে পছন্দ করে না, কেন না তাদের আলাদা জায়গায় বসতে হয় (সমবেত উচ্চবর্ণের শিশুরা যাতে তাদের জাতের 'শুদ্ধতা' বজায় রাখতে পারে!)

জাতি বর্ণ-চেতনা এবং পক্ষপাতিত্ব তিনটি জেলার সব ক'টি গ্রামেই চালু থাকতে দেখা গেছে। পুরুলিয়ায়-এর মাত্রাটা একটু বেশি। বীরভূম জেলার একটি গ্রামে ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিশু সন্তানদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান না বলে জানা গিয়েছে। কারণ, ওখানে নিচু জাতের ডোম শিশুদের সঙ্গে তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করতে হবে। যদিও তাঁরা মানেন যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশুনোর ধরন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ভাল। একজন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাকে বলতে শোনা গেছে যে, ছোটলোক পাড়া, অর্থাৎ নিচুজাতের পল্লি দিয়ে হাঁটেন না। যদিও তাঁর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বিশাল সংখ্যক তথাকথিত 'ছোটলোক'দের শিশুরা পড়তে আসে।

জেলা নির্বাচনের সময় গবেষক দল বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষাদান ব্যবস্থায় কিছু বৈপরীত্য খুঁজে পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তিনটি জেলার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মিলের দিকটা তার পার্থক্যকে গুরুত্বহীন করে দেয়।

সমীক্ষা অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সেগুলির পূরণের মধ্যে বড় আকারের বৈপরীত্য খুঁজে পেয়েছে। অনুসন্ধান পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়নে কৃষি, ভূমিসংস্কার, মজুরি কাঠামো ইত্যাদি উন্নতির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাদানে রাজ্যের প্রগতির বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছে।

১.৩.১ এক নজরে গ্রামগুলি মেদিনীপুর

গ্রাম	ব্লক	পরিবার	আনুমানিক জনসংখ্যা	জাতিগত পরিচয়	প্রধান জীবিকা	থানা থেকে দূরত্ব	এন.এফ.ই.* আছে কি নেই	ভি.ই.সি.** আছে কি নেই	অঙ্গনওয়াড়ি আছে কি নেই
সোতেরডাঙ্গা	মেদিনীপুর সদর	৯০	৫০০	সাঁওতাল (আদিবাসী)	কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, চাষবাস	২.৫ কিমি	নেই	নেই	নেই
ধেড়ুয়া	মেদিনীপুর সদর	১০০০	৫৫০০	ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বালিয়া (হিন্দু অন্যান্য), তেলি, রাজু (ওবিসি), বাউরি, দুলে, লোহার (তফসিলী জাতি)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি	বর্ণহিন্দু পল্লি থেকে ০ কিমি দূরত্বে, বাউরি, দুলে পাড়া থেকে ১ কিমি দূরত্বে	নেই	নেই	নেই
বরোমানিয়া	গোপী বল্লভপুর-১	৭০	৪৫০	কৈবর্ত্য, ভুঁইয়া, ধোপা, (তফসিলী জাতি), এক ঘর ব্রাহ্মণ	কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, ধীবরবৃত্তি, কাপড় কাচা	২ কিমি	নেই	নেই	নেই
গোপীনাথপুর-টিকায়েতপুর	গোপী বল্লভপুর-১	১৫০	৮০০	গোয়ালা, ছুতোর, তেলি (ওবিসি), কৈবর্ত্য, কামার, ধোপা (তফসিলী জাতি), কোঁড়া (আদিবাসী)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, শিকার বৃত্তি, কাপড় কাচা	ওবিসি (অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়) পল্লি থেকে ০ কিমি এবং তফসিলী জাতি পল্লি থেকে ১ কিমি	নেই	নেই	নেই
বেলিয়াঘাটা বৈদ্যপুর	দাসপুর-১	৪০০	২২০০	ব্রাহ্মণ (হিন্দু অন্যান্য), মাহিষ্য, তেলি, স্বর্ণকার (ওবিসি), সাঁওতাল (আদিবাসী)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, রূপোর কাজ, ধীবর বৃত্তি, চাকরি	০ কিমি	নেই	আছে	নেই
বৈকুণ্ঠপুর	দাসপুর-১	২৬৬	১৫০০	কায়স্থ (হিন্দু অন্যান্য), মাহিষ্য (ওবিসি), দুলে, বাগদি (তফসিলী জাতি)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি	০ কিমি	নেই	আছে	আছে

দাসপুর ব্লকের দুটি গ্রামের কমিটিগুলিকেই নিয়ামক কমিটি বলা হয়। কিন্তু জেলার ভিইসি-র মতো করেই এগুলি গঠিত।

* এন.এফ.ই.—নন ফর্মাল এডুকেশন সেন্টার

** ভি.ই.সি.—ভিলেজ এডুকেশন কমিটি

গ্রাম	ব্লক	পরিবার	আনুমানিক জনসংখ্যা	জাতিগত পরিচয়	প্রধান জীবিকা	থানা থেকে দূরত্ব	এন.এফ.ই. আছে কি নেই	ভি.ই.সি. আছে কি নেই	অঙ্গনওয়াড়ি আছে কি নেই
সূচপুর	নানুর	১৬২	৯০০	মুসলিম	কৃষি শ্রমিক	০.২৫ কিমি	নেই	আছে	আছে
মুইতিন	নানুর	১৭০	১০০০	ব্রাহ্মণ, সদগোপ (সাধারণ), গোয়ালা এবং কায়স্থ (ওবিসি), বাগদি ও হাঁড়ি (তফসিলী জাতি)	চাষবাস, কৃষি শ্রমিক, পশু পালন ও অন্যান্য কাজ	০ কিমি	নেই	আছে	আছে
ইসলামপুর ছোটলাইন পাড়া	সাঁইথিয়া	৫০০	২৭০০	মুসলিম, সাঁওতাল (আদিবাসী), ডোম (তফসিলী জাতি) এবং অন্য কহিন্দু	ছোট ব্যবসা, কৃষি শ্রমিক অন্যান্য মজুরির কাজ	০ কিমি, কাছাকাছি ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নেই	আছে	আছে
গড়গড়িয়া	সাঁইথিয়া	৫০০	২৫০০	ব্রাহ্মণ, সদগোপ, বানিয়া (অন্যান্য), তন্তুবায়, তেলি (ওবিসি), ডোম, বাগদি, শুঁড়ি, সাঁওতাল (আদিবাসী)	খেতখামার, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি	০ কিমি	নেই	আছে	আছে
ডেমুরতলা	রাজনগর	৩২	১৩০	আদিবাসী	কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, চাষবাস জঙ্গল থেকে নানান জিনিষ সংগ্রহ করা	১ কিমি	নেই	আছে	নেই
ছাতিনা	রাজনগর	৬৬	৩৭০	সাঁওতাল, কোঁড়া (আদিবাসী)	কৃষি ও অন্যান্য মজুরি	১ কিমি	নেই	আছে	আছে

গ্রাম	ব্লক	পরিবার	আনুমানিক জনসংখ্যা	জাতিগত পরিচয়	প্রধান জীবিকা	থানা থেকে দূরত্ব	এন.এফ.ই. আছে কি নেই	ভি.ই.সি. আছে কি নেই	অঙ্গনওয়াড়ি আছে কি নেই
ভাদসা	পুরুলিয়া-১	১৬১	১০০০	ভাট, বৈষ্ণব, ময়রা (হিন্দু অন্য), তেলি, মাহাতো, চিত্রকর, সহিস (ওবিসি), ডোম (তফসিলী জাতি)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, কারুকর্ম	০ কিমি	নেই	আছে	আছে
ঘাগরজোড়ি	পুরুলিয়া-১	৭০০	৩৭০০	ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভাট (অন্যান্য), মাহাতো, তেলি, নাপিত, কলু, সহিস (ওবিসি), ডোম (তফসিলী জাতি)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, কাজকর্ম	০ কিমি গ্রামে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে	নেই	আছে	আছে
লৌলাড়া	পুঞ্চা	৫০০	৩০০০	ব্রাহ্মণ, (হিন্দু অন্য), ভুঁইয়া, বাউরি (তফসিলী জাতি), সহিস (ওবিসি)	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, কারুকর্ম	১ কিমি	নেই	আছে	আছে
কুলটাড়-খুদিটাড়	পুঞ্চা	৫৮	৩৫০	খেড়িয়া শবর (আদিবাসী)	কৃষি ও অন্যান্য মজুরি এবং জঙ্গল থেকে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে	০ কিমি একটি পল্লি থেকে, ১ কিমি অন্য পল্লি থেকে	আছে	নেই	নেই
হেটজারগো	ঝালদা-১	৭২৫	৪০০০	ব্রাহ্মণ, বৈশ্য (হিন্দু অন্য), মাহাতো, নাপিত, স্বর্ণকার, তেলি, সহিস, শুঁড়ি (ওবিসি), কামার, ডোম (তফসিলী জাতি), কামার	চাষবাস, ব্যবসা, কৃষি ও অন্যান্য মজুরি, কারুকর্ম	০ কিমি	নেই	আছে	আছে
কলমা	ঝালদা-১	৩৪০	১৯০০	ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব (হিন্দু অন্য), মাহাতো, ভগত, সহিস, কর্মকার, শুঁড়ি (তফসিলী জাতি), সাঁওতাল, মাঝি (আদিবাসী)	চাষবাস, ব্যবসা, কষি ও অন্যান্য মজুরি, কারুকর্ম	০ কিমি	নেই	আছে	আছে

সারসংক্ষেপ ঃ

এখানে আমরা আমাদের সমীক্ষার তাৎপর্যময় অংশগুলো তুলে ধরছি। রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে সমীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

(ক) উত্তরদাতা মাতা-পিতার আকাঙ্ক্ষা

দেখা গিয়েছে যে মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। কেবল ০.৫ শতাংশ মা-বাবা চান না যে তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া হোক। কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে কেবল ৩ শতাংশ মা-বাবা চান না যে তারা লেখাপড়া শিখুক।

কোনও উত্তরদাতাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবশ্যিক হওয়ার বিরুদ্ধে মতামত দেননি। খুব অল্প সংখ্যক মা-বাবাই ভবিষ্যৎ চাকরি-বাকরির কথা ভেবে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান। বেশির ভাগ মা-বাবাই মনে করেন যে দৈনন্দিন কাজকর্মের (যেমন, হিসেব-নিকেশ করা, চিঠি লেখা, ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, আত্মবিশ্বাস পাওয়া ইত্যাদি) জন্যই লেখাপড়া শেখার দরকার আছে। কন্যাসন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তার পিছনে বড় কারণ ভাল বিয়ের সম্ভাবনা। এবং প্রায় সবারই বিশ্বাস, আজকের দুনিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব।

ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মা-বাবাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে, এ কথা সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্বীকার করেন।

শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ

যে সব শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের একটা বড় অংশই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে তাদের ইচ্ছার কথা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৯১ ভাগ এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আরও বেশি - ৯৪ ভাগ শিশু এ কথা জানিয়েছে।

(খ) ভর্তি ও স্কুলছুট

ভর্তি : প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তির হার থেকেও শিশুদের এই আকাঙ্ক্ষার ছবিটা বেরিয়ে আসে। সাক্ষাৎকার নেওয়া মোট পরিবারের ৯২ ভাগ শিশু সন্তানরা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়া ২১২টি পরিবারের মাত্র একটি তাদের শিশুদের (ভর্তি উপযুক্ত) বিদ্যালয়ে পাঠাননি।

পরিবার পিছু বর্তমানে ভর্তি হওয়া শিশু সন্তানদের গড় সংখ্যা ২.০৭। প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা (গড়ে) ১২৭ এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু (গড়) ৫৩।

কোনওদিন ভর্তি না হওয়ার হার : কখনোই স্কুলে ভর্তি করা হয়নি এমন বাচ্চা থাকা পরিবারগুলি মোট পরিবারের ৮ শতাংশ। কিন্তু কোনওদিন ভর্তি না হওয়া মোট ৩৩ জন শিশুর মধ্যে ১৩ জন (৩৯ শতাংশ) ৬-১১ বছর বয়সের মধ্যে, বাকিরা তার থেকে বড়। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈপরীত্যের ব্যাপারে এটা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপারটা আরও

মনোযোগ দাবি করে। আদৌ ভর্তি না হওয়ার ঘটনার প্রধান কারণ হিসাবে, জানা গিয়েছে দারিদ্র্য বা শিশুদের অন্য কাজে আটকে থাকার বাধ্যতা। প্রধানত তফসিলী জাতি ও আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই কখনোই ভর্তি না হওয়া শিশুদের পাওয়া যায়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ : এটাও কোনও দিন ভর্তি না হওয়া শিশুদের মতো তফসিলী জাতি, জনজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পিছনে প্রধান কারণ আর্থিক প্রতিবন্ধকতা হলেও, নিম্নস্তরের শিক্ষাদান, অতিরিক্ত শারীরিক নিগ্রহমূলক শাস্তি এবং উঁচু ক্লাসে উঠতে শিশুদের ব্যর্থ হওয়ার কারণেও (যা কিনা নিরস শিক্ষাদানের পরিণতি) ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হয়। ২০ শতাংশ ঘরের শিশুদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে দেখা গেছে কিন্তু এদের মাত্র ১৬ শতাংশের বয়স ৬-১১ বছরের মধ্যে। কিন্তু এটাও তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা যে শুধুমাত্র ৬-১১ বছর বয়সসীমার শিশুরা করে থাকে তা নয়। বস্তুত, কিছু কিছু গ্রামে ১২/১৩ বছরের বালক-বালিকারা তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

(গ) চিন্তাজনক বাস্তবতা

শিশুদের উপস্থিতি, মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা, শিশুদের লেখাপড়া চালানোর ইচ্ছা একেবারে বদলে যায় শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রকৃত উপস্থিতির হতাশাব্যঞ্জক নীচু হারে। গবেষকগণ যে সব দিন ঘুরে দেখতে যান সেদিনগুলোয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার ছিল ৫১ শতাংশ এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে একটু ভাল (৬৪ শতাংশ) হলেও প্রত্যাশাজনক নয়। অনুপস্থিতির পিছনে প্রধান কারণ যদিও বলা যায় পরিবারের দরিদ্র দশা এবং শিশুদের বাড়ির কাজ ও খেতমজুরি সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত থাকা, এর জন্য শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশ এবং পাঠ্য বিষয়ে শিশুদের অনাগ্রহকেই শিশুদের বিদ্যালয়ে না আসার কারণ হিসাবে দোষারোপ করেছেন কিছু সংখ্যক (সংখ্যাটি ১৬ শতাংশের কম নয়) মা-বাবা। মিড-ডে-মিল কর্মসূচি আপাতদৃষ্টে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে কোনও ইতিবাচক ছাপ ফেলতে পারেনি। তার কারণ এই কর্মসূচিতে শিশু পিছু প্রতি মাসে ৩ কিলোগ্রাম চাল দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তা-ও আবার ৩-৪ মাস পরপর (সব শিক্ষকই স্বীকার করেছেন যে ৮০ শতাংশ উপস্থিতির ভিত্তিতে এই চাল বন্টন করার নীতি মেনে চলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না)। ফলে ঝামেলা এড়াতে সব শিশুদেরকেই চাপ দেওয়া হয়। বিতরণের দিন শিশুদের উপস্থিতি একশোয় একশো হয়ে যায়। পরদিন থেকে আবার যে-কে-সেই অবস্থা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাদের মধ্যে উপস্থিতির পার্থক্য খুব বেশি না থাকলেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বালিকাদের উপস্থিতির হার বালকদের থেকে অনেক বেশি (যথাক্রমে ৫৫ ও ৪৫ শতাংশ)।

শিক্ষকদের উপস্থিতি : অনুপস্থিতির দিক দিয়ে শিক্ষকরা তাঁদের ছাত্রদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই। বিদ্যালয়ে ঘুরে দেখার দিনগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের

অনুপস্থিতির হার ছিল ২০ শতাংশ, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাদের অনুপস্থিতির হার ছিল ১৪ শতাংশ।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা বিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় অন্যরকম কোনও কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন বলে জানা নেই। সেক্ষেত্রে ৭২ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষক বলেছেন মাসে ১-৭ দিন তাঁদের অন্য কাজে লিপ্ত থাকতে হয় (নির্বাচন ডিউটি, শিক্ষক সংগঠনের বৈঠক, পঞ্চায়েত সংক্রান্ত কাজ এবং বিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে)। বহু প্রাথমিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন যে সরকার তাঁদের জনগণনা, নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজে এমন জড়িয়ে রাখেন যে, তাঁদের দিনের পর দিন শিক্ষকতার কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়।

<u>প্রকৃত পঠনপাঠন</u> ঃ শিশুদের বক্তব্য অনুযায়ী এমন কি যে সব শিক্ষকরা পঠনপাঠনের প্রকৃত সময় বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন তাঁরাও সব সময় ক্লাস নেন না। আগের দিন কী পড়ানো হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে ৩১ শতাংশ শিশু বলেছে যে সেদিন কিছুই পড়ানো হয়নি।

অনেক মা-বাবার অভিযোগ, শিক্ষকরা সময়ানুবর্তী নন। গবেষক দলও লক্ষ্য করেছে যে বেশ কিছু শিক্ষক দেরীতে আসেন, তাড়াতাড়ি চলে যান। বিশেষ একজন শিক্ষক শনিবার ও সোমবার ক্লাস নেন না। যেহেতু সপ্তাহান্তে তিনি বাড়ি চলে যান, যা অনেক দূরের পথ। এক শিক্ষক স্বীকার করেন যে পঞ্চায়েতে বৈঠক থাকলে (নির্বাচিত সদস্য হিসাবে সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকা দরকার) সেদিন তিনি কেবল ঘন্টাখানেকের জন্য বিদ্যালয়ে থাকেন।

<u>শিক্ষার মান</u> : প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় বাধা শিক্ষার ভীতিপ্রদ নিম্নমান। নিজেদের নামটুকু খালি লিখতে পারার জন্য শিশুরা গৃহ-শিক্ষকের শরণাপন্ন হচ্ছে এটা খুবই বেদনাদায়ক। গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য না পাওয়া শিশুদের মধ্যে মাত্র ৭ ভাগ নিজেদের নাম লিখতে পারে। গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে লেখাপড়া শেখা ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই সাফল্যের হার ৮০ শতাংশ।

মা-বাবাদের কাছে গৃহশিক্ষকতা একটা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। বেশির ভাগ মা-বাবাই মনে করেন গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া না শিখলে ছেলেমেয়েদের কোন শিক্ষাই হবে না। কারণ, 'স্কুলে কোনও লেখাপড়াই হয় না'।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে ৪৫ ভাগ শিশুই গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অঙ্কটা হল ৫১ শতাংশ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে অঙ্কটা অনেক কম — যথাক্রমে ৩৩ ও ২৮ শতাংশ।

সমীক্ষার একটি পীড়াদায়ক তথ্য হচ্ছে এই যে, যারা গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নিচ্ছে না তারা স্বেচ্ছায় সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না তা নয়, তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য গৃহশিক্ষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের সবচেয়ে বড় শিকার তারা। কেন না তারা সে দলে পড়ছে যাদের জোর করে শিক্ষা তো দূরের কথা,

সাক্ষরতার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটি শ্রেণি বিভাজনের ফলেই হচ্ছে। সুতরাং এই পরিবারের সন্তানরা না পাচ্ছে গৃহশিক্ষকতার সাহায্য, না পাচ্ছে নিজেদের পরিবার থেকে সহায়তা। এ কথা আমাদের পরিসংখ্যান থেকে আরও সমর্থন পায়। এবং খেতমজুরদের ঘরের ছেলেমেয়েদের (গ্রামের অল্প কিছু লোক বাদ দিলে খেতমজুরদের অধিকাংশই তফসিলী জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে থেকেই আসেন) মাত্র ২১ শতাংশ গৃহশিক্ষকতার সাহায্য পায়। এটা একটা এমন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে যাদের কাছে পয়সা আছে শিক্ষা তারাই কিনতে পারেন। 'ব্যয়হীন শিক্ষা' শব্দটা এখন কম-বেশি অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সামাজিক গতিপ্রকৃতি : ঘটনা শুধু এটাই নয় যে মানুষের দরিদ্রতর অংশ গৃহশিক্ষক দিয়ে বা বাড়িতে পড়িয়ে তাঁদের শিশুদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে পারেননা, তফসিলী জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ এ অভিযোগও করেছেন যে ক্লাসঘরে, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই সব শিশুদের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করা হয়। সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলিতে একটা কথা সবাই বলে থাকেন, 'শিক্ষকরা কেবল বাবু ছেলেপুলেদের দিকেই নজর দেন'। এমন কি, একটি স্কুলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের-আলাদা বসানো হয়। এর প্রত্যক্ষ পরিণতি, শিশুদের ক্লাসে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। অন্যদিকে বাবু বাড়ির ছেলেপুলেরা তিনগুণ সুবিধা ভোগ করে -- বাড়িতে সহায়তা, গৃহশিক্ষকতার সাহায্য এবং বিদ্যালয়ে সযত্ন তত্ত্বাবধান।

কিছু শিক্ষক তফসিলী জাতি, জনজাতি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের শিশুদের সম্পর্কে তাঁদের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে দ্বিধা পর্যন্ত করেন না। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, 'লেখাপড়া ওদের কম্মো নয়'। উঁচু ও মাঝারি জাতির শিক্ষকদের ৭৫ শতাংশ মনে করেন, তফসিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবারের শিশুরা তুলনায় উঁচু জাতের শিশুদের থেকে কম বুদ্ধিমান এবং পড়াশুনোয় কম উৎসাহী।

কয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা-ছাত্র সম্পর্ক শিক্ষাদান এবং শিক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক বলে মনে করা হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, এলাকার নৃতাত্ত্বিক চরিত্র (জনসংখ্যায় এখানে একটা কম বেশি সমসত্বতা আছে) এবং মা-বাবারাও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজের তত্ত্বাবধান করতে পারা এর কারণ বলে মনে হয়।

(ঘ) বস্তুগত কারণ

পরিকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা : প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোই শিক্ষাদীক্ষার পথে সব চেয়ে বড় বাধা, এটাই এখানকার শিক্ষকদের সাধারণ অভিযোগ। ঘুরে দেখা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৬ শতাংশের কোনও ক্লাসঘর নেই, ৬৬ শতাংশের আছে এক থেকে দুটি ক্লাসঘর (৪টি ক্লাস নেওয়ার জন্য)। কেবল ২৮ শতাংশের দুই এর থেকে বেশি সংখ্যক ক্লাসঘর আছে। যে সব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশি সেগুলিতে ভিড় ও হই হট্টগোলের কারণে শিক্ষকরা না পারেন পড়াতে, না পারে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অবস্থা আরো খারাপ। ২৪ শতাংশের ছোট এক কামরার ঘর আছে। বাকিদের ক্লাস চলে গোয়ালঘরে, বারান্দার নিচে এবং চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারি সমাজভবনে।

<u>শিক্ষকের সংখ্যা</u> : এটা আর একটা অভিযোগের ক্ষেত্র। প্রধানত শিক্ষকরাই এটা করে থাকেন। কিছু মা-বাবাও সমস্যাটার দিকে আঙুল তোলেন।

সমীক্ষাকৃত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫০:১; কিছু বিদ্যালয়ে এই সংখ্যা অত্যন্ত খারাপ। কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা শিক্ষক সংখ্যার ১০০ গুণ বেশি। শিক্ষক সংখ্যার এই সমস্যা প্রকৃত সংখ্যার স্বল্পতার কারণে নয় বলে কিছু সরকারি মুখপাত্র স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষক বন্টনে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। প্রতি বিদ্যালয়ে গড়পড়তা শিক্ষক সংখ্যা যেখানে ২.৫৫, সেখানে এমন কিছু বিদ্যালয় দেখা যাচ্ছে যা কেবল একজন শিক্ষক চালিত এবং অন্য কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন অনেক বেশি সংখ্যায়।

<u>বিদ্যালয় শিক্ষার খরচ</u> : সংবিধানের ৭৩-তম সংশোধনী নিয়ে দেশজুড়ে যে আলোচনা ও বিতর্ক চলেছিল তার বিশেষ ঝোঁক ছিল প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষা বাবদ ব্যয় নিয়ে। সেই বিতর্কের তালে তাল মিলিয়ে আমাদের সমীক্ষা দেখেছে যে 'ব্যয়হীন প্রাথমিক শিক্ষা' এখনও দূরের স্বপ্ন। মা-বাবাকে বিদ্যালয়-শিক্ষার ব্যয় বহন করতে বাধ্য করা হয় এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মা-বাবাদের রোজগারের তুলনায় বেশ বড় অঙ্কের ব্যয়। আমাদের উত্তরদাতাদের ২৭ শতাংশ তাঁদের বাড়ির প্রতি শিশুর বই খাতা, পেন পেনসিল, জামা কাপড় বাবদ বছরে ২০০ টাকার কম খরচ করেন। স্পষ্টতই এই মা-বাবারা দরিদ্রতম পরিবারের লোক। এঁদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে ছেঁড়াখোঁড়া ছাঁট কাগজের টুকরোয়। ৭৩ শতাংশ মাতাপিতাকে এর থেকে অনেক বেশি খরচ করতে হয় (২০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকার উপরে)।

কম আয়ের পরিবারগুলোর পক্ষে এই খরচই যদি যথেষ্ট ক্ষতিকারক না হয়, তা হলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার জন্য রয়েছে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা। যে বাড়িতে গৃহশিক্ষক রাখা হয় তাদের শিশু পিছু বছরে অন্তত ২০০ টাকা খরচ করতে হয়। 'বাচ্চাদের দু'বেলা খেতে দিতে পারি না, এই খরচ চালাব কেমন করে?' মোটামুটি সব গরিব উত্তরদাতাই গবেষকদের কাছে এই ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এই উত্তরদাতারা প্রধানত তফসিলী জাতি, আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক।

<u>উৎসাহ দান পরিকল্পনা</u> : এই ধরনের সমস্যার সুরাহা করতে নানা ধরনের উৎসাহ-দান প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প (মিড-ডে-মিল), বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং বালিকা ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া।

মধ্যাহ্ন আহার কথাটার যে আসলে আর কোনও মানে হয় না (যেহেতু খাবার না দিয়ে অনিয়মিতভাবে চাল দেওয়া হয়) এটা সত্যি হলেও গরিব পরিবারে এর একটা গুরুত্ব আছে। অনিয়মিতভাবে হলেও এর থেকে এঁরা কিছু পরিমাণ চাল পান, যা পরোক্ষে

শিশুদের পুষ্টি যোগানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় (ঘরে ভাত রান্না হলে বাচ্চারাও তার থেকে কিছুটা পায়, সে রান্না বাচ্চাদের জন্য না হলেও)।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশু ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য এই পরিকল্পনার সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ছাত্র-ছাত্রদের মাতাপিতাদের ১০০ শতাংশ যখন এই সুবিধা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, সেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কোনও শিশুই এটা পায় না, যেহেতু তাদের জন্য এ ধরনের কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি।

আরও উদ্বেগের বিষয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের যদিও বিনামূল্যে পাঠ্যবই পাওয়ার কথা, শিশুদের মা-বাবাদের কেবল মাত্র ৪৭ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাঁদের শিশু সন্তানরা এই বই পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও বিনামূল্যে বই বিতরণের সমস্যাটি কম গুরুতর নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যেখানে মে মাস থেকে শুরু হয় সেখানে জুলাই মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে বই না পাওয়ার অভিযোগ করেছে বহু ছাত্র-ছাত্রী।

মা-বাবাদের ১৪ শতাংশ (সকলেই তফসিলী জাতি ও জনজাতি পরিবারের) যখন বালিকা ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করার পরিকল্পনায় লাভবান হওয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, উঁচু বর্ণের শিক্ষকরা এই সুবিধার মাপকাঠি নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। এই পরিকল্পনা কেবল মাত্র তফসিলী জাতি ও জনজাতির সব বালিকার ক্ষেত্রে এবং অন্য বালিকাদের কেবল ২৫ শতাংশ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এখানেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুরা বঞ্চিত, এবং যেহেতু বেশির ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রই তফসিলী জাতি ও জনজাতি এলাকায় অবস্থিত; এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যের কাছেই এর সুবিধাগুলো পৌঁছাতে পারে না।

<u>শিক্ষার মাধ্যম</u> : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে ইংরেজি তোলা বা রাখা নিয়ে যখন একটা চড়া (আরো বলা যায় কড়া) বিতর্ক চলছে তখন এই সমীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে ভাষার প্রশ্নটিতে আরও বড় মাত্রা আছে। কোঁড়া এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিশুরা এর ভুক্তভোগী। এরা সম্পূর্ণ একটা অন্য ভাষায় কথা বলে এবং শিক্ষকরা যেহেতু বাংলায় কথা বলেন, এরা তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। সাঁওতাল ও কোঁড়া সম্প্রদায়ের শিশুরা পড়ে এমন সব বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক স্বীকার করেছেন যে তাঁরা শিশুদের কথা বুঝতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদিও সাঁওতালি ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাস্তবে কিন্তু সাঁওতালি বলা শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এ ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করা হয়নি। মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই সব সম্প্রদায়ের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার দোরগোড়াতেই হোঁচট খায়।

(ঙ) জবাবদিহির দায়

বিদ্যালয় পরিদর্শনের সরকারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান আরও নিচে নেমেছে। ২২ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন যে, আমাদের পরিদর্শনের বারো মাস আগে থেকে স্কুলে কোনও সরকারি পরিদর্শন হয়নি। বাকি বিদ্যালয়গুলিতে উক্ত সময়সীমার মধ্যে একবার মাত্র সরকারি পরিদর্শন হয়েছে। কিন্তু এই পরিদর্শন, বিদ্যালয় শিক্ষকদের মতে ছিল নিছকই আনুষ্ঠানিক।

(চ) গ্রাম শিক্ষা কমিটি

খাতায়-কলমে গ্রাম শিক্ষা কমিটি তথা ভি.ই.সি.-গুলি ৬৬ শতাংশ গ্রামে গঠন করা হয়েছে। অবশ্য গবেষক দল পাঁচটি গ্রামের প্রতিটিতে একজন করে গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্যকে সাক্ষাৎকারের জন্য পেয়েছেন। যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য পাওয়া যায়নি। কিছু গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য জানেনই না যে তাঁরা কমিটিতে আছেন!

যে পাঁচজন গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্যের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁর সব ক'জনেই বলেছেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি।

(ছ) অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক

সন্তোষজনক না হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের ৩৫ শতাংশ মাতা-পিতা এই বৈঠক সম্পর্কে সচেতন আছেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠরত শিশুদের ৬০ শতাংশ মাতাপিতা অবশ্য এ সম্পর্কে জানেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের ৬২ শতাংশ মাতাপিতা মনে করেন যে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থার উন্নতি করতে ভূমিকা নিতে সক্ষম। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ৭৭ শতাংশের বেশি। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মাতাপিতারা বলেছেন, শিক্ষকরা নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঘটনাটা এরকম নয়।

<u>শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ</u> : বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ভাল কাজ করে। ব্যতিক্রমগুলো শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের এলাকা এবং সহায়িকা নির্বাচনের অনিয়মগুলোকে দেখিয়ে দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার সুবিধা হওয়ায় তেমনভাবে আলাদা করে কোনও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দরকার নেই এমন, অথবা সহায়িকা নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে এমন গ্রামগুলোতেই সেইরকম শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে পাওয়া গেছে যাদের কাজকর্ম ঠিকমতো চলে না।

(জ) প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা

বহু গ্রামে স্থাপিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত কর্মসূচি-সহ, প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষাদানকে সহজসাধ্য করে তোলার কথা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলির ৩৩ শতাংশের কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। মাত্র ১৫ শতাংশ পরিবার বলেছেন যে তাঁদের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায়। উক্ত বাড়িগুলির ৫৯ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষাদানে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অঙ্গনওয়াড়ির কাজকর্ম সম্পর্কে গ্রামের লোকেদের মধ্যে একটি ধারণা চালু আছে যে এগুলিতে শুধুই রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। এই বক্তব্য সাক্ষাৎকার দেওয়া কয়েকজন সহায়িকাদের কথা থেকেও পুষ্ট হয়। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে কাজের লোক, সুযোগসুবিধা এবং পরিকাঠামোর অভাবে অঙ্গনওয়াড়িতে কোনও প্রাক-বিদ্যালয়

শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। যাই হোক, দারিদ্র্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা কিছু পরিবারের কাছে ওই খাদ্য - তা সে পরিমাণে যত কমই হোক, যথেষ্ট মূল্যবান। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে একটি জনজাতি গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অন্য ভূমিকা দেখা গেছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হলে অঙ্গনওয়াড়ি থেকে নাম বাদ যাবে এবং ফলত সে আর অঙ্গনওয়াড়ির যোগানো খাবার পাবে না। তাই একটি পরিবারের শিশুকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তিই করায়নি।

(ঝ) নীতিনির্ধারণে পরিবর্তন

সমীক্ষার ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারে আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা একই সঙ্গে আশা ও নিরাশার উদ্রেক করে।

আশা : বিদ্যালয় শিক্ষার উপযুক্ত প্রায় সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় এনে এই ব্যবস্থাকে বাস্তব অর্থেই সার্বজনীন করে তোলা। জাতি বা শ্রেণি নিরপেক্ষভাবে তিনটি জেলাতেই সন্তানের লেখাপড়ার জন্য মা-বাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও শিশুদের পড়াশুনো চালিয়ে যাবার আগ্রহ আমাদের আশাকে আরও জোরালো করে তোলে।

হতাশার কারণ : শিক্ষাদানের উপায় এবং শিক্ষার গুণমান শ্রেণিপার্থক্যকে আরও তীব্র করে তুলে প্রায়শই গরিব ঘরের শিশুদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। সমীক্ষার ফলাফল থেকে এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার সময় এসেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বিভেদের কবল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া হল সব চেয়ে জরুরী প্রশ্ন। গুণগত মানের দিক দিয়ে দেখতে গেলেই পরিসংখ্যান (সাক্ষরতার হার, ভর্তির হার, ইত্যাদি) তার সব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। শিক্ষাদানের নিম্নমান কেবল শিশুদের খারাপভাবে লেখাপড়া শেখায় তাই নয়, এটা দুই শ্রেণির — এক শ্রেণি যারা শিক্ষা কিনতে পারে এবং অন্য শ্রেণি — যারা তা পারে না — এর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষাদানের নিম্নমান শিশুদের গৃহশিক্ষকের সাহায্য নিতে বাধ্য করে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, প্রাইভেট টিউশন একটা 'দুঃখজনক প্রয়োজনীয়তা'।[৩৯] যাঁরা গৃহশিক্ষক রাখতে পারেন না, তাঁদের যেন প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারই নেই।

শিক্ষার গুণগত মান অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষাদান, শিক্ষাদানের সামগ্রী-সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি। এর সঙ্গে অন্য দিকও জড়িয়ে আছে। অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা, ছাত্রদের (এবং শিক্ষকদের) মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ বজায় রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্য সরকার,[৪০] কেন্দ্র এবং বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকার[৪১] যেখানে শিক্ষার মানকে উপেক্ষা করে সংখ্যার দিকেই গুরুত্ব দেওয়ার জন্য

সঠিকভাবে অভিযুক্ত, বামফ্রন্ট সেখানে, বিশেষ করে মে, ২০০১ এ ষষ্ঠবারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর থেকে, শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনে সরকার ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন। শিক্ষকদের বহুবার তাঁদের কাজে মন দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আরো অনেক কাজ এখনও করার দরকার আছে।

প্রথমেই দরকার, প্রাইভেট টিউশন নামক ব্যাধিটিকে রোখা। এর জন্য দু'ভাবে কাজ করা প্রয়োজন। প্রথমটা হল, প্রাথমিক বিদ্যালয়-শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষকে সুনিশ্চিত করা। এর জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষ মনোযোগের দরকার আছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে হবে এবং তা ঠিক মতো চালাতে হবে।

আমরা এটা দেখেছি যে, একদিকে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা গোটাটাই প্রায় ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় জনসাধারণের অংশ নেওয়ার কোন স্থান নেই। পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করতে অভিভাবকদের যোগদানের সামান্যই সুযোগ রয়েছে। সুতরাং বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার সময় এর উন্নতিতে সহায়তা করতে ইচ্ছুক মা-বাবাদের বিদ্যালয় প্রশাসনে জায়গা দিতে হবে। বিদ্যালয়-ভিত্তিক (গ্রামসংসদ-ভিত্তিকের বদলে) অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিকে স্কুলগুলির অনুদান মঞ্জুর করার বিশেষ আইনি ক্ষমতার দ্বারা শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সমাজের সব স্তর (শ্রেণি, জাতি এবং লিঙ্গভিত্তিক) থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা কমিটিগুলি যথেষ্ট উপযোগিতার পরিচয় দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ঘাটতি এবং পরিকাঠামোর সমস্যার সমাধানে জোর দিতে হবে। পরিকাঠামোর অভাব, বিশেষত, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একটা বড় বাধা। এর দিকে ভাল করে নজর দেওয়ার দরকার।

মা-বাবা ও ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকেই মনে করেন যে শিক্ষিকারা তাঁদের কাজে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দেন (বিশেষত, যে দরদ দিয়ে তাঁরা পড়ান সে কারণে)। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তুলনামূলক কৃতিত্বের এটা একটা মুখ্য কারণ।

তাই এর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের আরও বিপুল সংখ্যায় নিযুক্ত করার সুপারিশ নীতিগতভাবে করা যেতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহদানের পরিকল্পনা ক্ষেত্রটি, বিশেষ করে দুপুরের খাবার বিতরণের বন্দোবস্তটির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রতি মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের তিন কেজি করে শুকনো চাল বিতরণ করার বর্তমান ব্যবস্থাটিকে পাল্টে শিশুদের প্রকৃত দ্বিপ্রাহরিক আহারের বন্দোবস্ত করার অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহদানের অন্য কর্মসূচিগুলি যেমন বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা ইত্যাদিও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে করা দরকার।

পরিকাঠামোর উন্নতি এবং উৎসাহবৃদ্ধির পরিকল্পনার ভার নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার (যাতে এই কেন্দ্রগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান হয়ে দাঁড়ায়) সঙ্গে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির প্রধান ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও দূর করা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রগুলির স্থান নির্বাচনের গলদ এবং শিক্ষক মনোনয়নে পক্ষপাতিত্ব থেকে ঘটে, বা শিক্ষা বহির্ভূত অন্যান্য

স্বার্থরক্ষার কারণে ঘটে থাকে। সহায়িকা নিয়োগ হওয়া দরকার প্রয়োজন অনুযায়ী, রাজনৈতিক বা অন্যান্য চাপে নয়। অল্প যে কটি নিষ্ক্রিয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আমাদের চোখে পড়েছে সেগুলি হয় ভুল জায়গায় করা নতুবা কম যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মমত্বহীন সহায়িকা মনোনয়নের ফল। এই সহায়িকাদের নিযুক্ত করা হয়েছে নানারকম চাপে। এঁরা দায়িত্ব পালন করেন না।

গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগ তার মধ্যে একটি। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণি ও জাতি-বর্ণের ব্যবধান দূর করতে হবে। সামাজিক এবং আর্থিক সুযোগবঞ্চিত পরিবারের শিশুরা যাতে সঠিক এবং সমান ব্যবহার পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যা কেবল জাতের তফাত থেকেই উদ্ভূত নয়। জাতি-গোষ্ঠীগত দিক থেকেও সমস্যা আছে। রাজ্যের জনসংখ্যার একটা বড় অংশে রয়েছেন সাঁওতালদের মতো জনজাতিরা যাঁরা বাংলা প্রায় বোঝেনই না। রাজ্য সরকার যদিও সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন, এমন কোনও সাঁওতাল ছাত্র-বহুল বিদ্যালয় চোখে এল না যেখানকার শিক্ষার মাধ্যম সাঁওতালি। সাঁওতাল-বহুল কিছু বিদ্যালয় ঘুরে আমাদের সমীক্ষা, ভাষার প্রশ্নটির উপর অবিলম্বে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে জোর দেওয়া দরকার বলে মনে করছে।

পর্ব : ২

২.১ আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন

"মাঁয় বাপে লিখা পড়্হা করায়নি, বকা ছিল, মুর্খ ছিল, হামিও আছি .... কিন্তু এখন দিন বদলাঁই গেছে, এখন মূর্খ থাইকলে আর সংসারে বাঁচতে পারব্যেক নাই।"

মেদিনীপুরের গ্রামের এক ৪০ বছর বয়সী খেতমজুরের এই কথা। এই মানুষটির কাছে তাঁর সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা সব চেয়ে আগে। "*খাতে পাই বা না পাই।*"

আমাদের উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই ধারণা এই রকম। বিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে, কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীনতার সম্পর্কে ক্ষোভ থাকলেও ২১২ জন উত্তরদাতার ১৭৮ জনই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য সম্ভব করে তুলতে একজন উত্তরদাতাও অসম্মত নন, যদিও উত্তরদাতাদের ৩৪ জন আমাদের এই নির্দিষ্ট প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারেননি। "*জানি না, কি করা উচিত*", ওই ৩৪ জনের মোটামুটি এটাই ছিল উত্তর। এঁদের প্রত্যেকেরই পঞ্চাশের উপর বয়স, নিরক্ষর এবং অধিকাংশই মহিলা। রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মচারীদের কথায় সাধারণ মানুষের ইচ্ছেটাই ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে।

"*প্রতিদিন ছবিটা পালটাচ্ছে। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগের থেকে অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে*", এক বিদ্যালয় পরিদর্শক-এর এই মন্তব্য। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রয়োগে বহু ত্রুটি আছে স্বীকার করেও এই পরিদর্শক বিশ্বাস করেন ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষা মা-বাবাদের মধ্যে বেড়ে উঠছে। পুরুলিয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী (কংগ্রেস-ই) মনে করেন ছবিগুলো পালটে গিয়েছে। "আমাদের ছোটবেলায় খুব কম বাচ্চাকেই প্রাইমারি স্কুলে যেতে দেখা যেত। এখন প্রায় সবাই বাচ্চাদের লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে অনেকটা সজাগ।" মতাদর্শ নির্বিশেষে রাজনৈতিক দল তা সে সিপিআই(এম) বা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক যে দলই হোক না কেন, কিংবা সরকারী কর্মচারী, সাধারণ মানুষ যে-ই হন না কেন – এই একটা ক্ষেত্রে অন্তত সবাই একমত।

(ক) পিতা-মাতাদের মতামত

আমাদের ২১২ জন উত্তরদাতাদের মাত্র একজন বলেছেন যে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁর কোনও লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন না। উত্তরদাতাদের ৮ জন আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। ২১২ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭ জন বলেছেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো জরুরী নয়। ২১ জন এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন নি। তার মানে সব মিলিয়ে আমাদের ২০৩ জন উত্তরদাতা ছেলেদের শিক্ষাকে জরুরী বলে মনে করেছেন। ১৮৪ জন উত্তরদাতা মনে করেছেন মেয়েদেরও পিছনে ফেলে রাখা উচিত নয়।

সব উত্তরদাতাই জানিয়েছেন ভাল জীবনযাপন করার জন্য ছেলেমেয়ে সবারই লেখাপড়া শেখা উচিত। *"বেঁচে থাকার জন্য পড়াশোনা করতে হবে।"*

অনেক উত্তরদাতারই এ ব্যাপারে একটি স্পষ্ট ধারণা আছে যে শিক্ষা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারি বা অন্য কোনও মাস মাইনের চাকরি যোগাবেনা। কিন্তু তাঁরা মনে করেন, *"লেখাপড়া চোখ খুলে দেয়"*। তাঁদের ছেলেমেয়েরা হিসেব-পত্র করতে পারবে, নিজেরা কারবার চালু করতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি। দাশপুরের একজন উত্তরদাতা তো স্পষ্ট করেই বলে দিলেন দেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই এবং চাকরি খুব অল্পই আছে। তাই লেখাপড়া শিখলে চাকরি মিলবে এ আশায় তিনি ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না। ঠিক করে বললে তিনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে জরুরী। তা সে একজন দিনমজুরই হোক, বা রিকশাওয়ালা বা ধীবর — বুনিয়াদি শিক্ষা সবারই দরকার। বর্ধমানে দিনমজুরি খেটে পয়সা রোজগার করা পুরুলিয়ার একজন মজুর বলেন, *"বেশি ধুর পঢ়ার দরকার নাই, বাসটা কুথা যাব্যেক লককে জিগাস করতে হব্যেকনি, চিঠি লিখতে পারবে, দরখাস্ত লিখতে পারবে"*। নম্বর না বুঝে ভুল বাসে চাপা, বাড়িতে চিঠি লিখতে না পারা – এর থেকেই তাঁর লেখাপড়া শেখানোর প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে।

আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি বিশেষে বদলায়। মেদিনীপুরের এক মিস্ত্রী তাঁর কম রোজগার সত্ত্বেও ছেলেকে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান—*"ছেলে ইংরাজি লেখাপড়া"* শিখবে বলে।

<u>এক আদিবাসী দিনমজুর</u>

ডেমুরতলার মঙ্গল হাঁসদা (৩৫) কোনও স্কুলে যাননি। *"উনজোখে মা অবস্থা আডি খারাপ তাহেঁ কানা"* (ছেলেবেলায় আমার বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল)। *"গ বা দো ইস্কুল বাং কুলকেদা"* (বাবা-মা ইস্কুলে পাঠায়নি), *"ইস্কুল দো সাঁগিঞ গে তাহেঁ কানা"* (ইস্কুল বহু দূরে ছিল)। ৪-৫ বছর বয়সেই মঙ্গলকে গরু চরানোর কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দশ বছর বয়সে তিনি চাষের জন্য মাটি কুপোনোর কাজ শুরু করেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি একজন বয়স্ক মজুর। সে সময়ে সাঁওতালরা গ্রামের ভিতরে বা কাছাকাছি যথেষ্ট কাজ পেতেন না। তাঁদের বোলপুরে বা বর্ধমানে যেতে হত। এখন অবস্থা পালটেছে। ছেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে চোরা মোড়ের একটি অবৈতনিক আবাসিক বিদ্যালয়ে দু বছর পড়াশোনা করে, কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষায় ফেল করার পর পড়া ছেড়ে দেয়। বিদ্যালয়ের নিয়ম মাফিক ফেল করা ছাত্রদের অবৈতনিক আবাসিকের সুবিধা নেওয়া হয় না। *"আদো ইঞঠেন পাইসা হো বানু খরচা এমঃ লাগিত, জোম ঞুরেআঃ বেবোস্তা হুয়ুআ তবে ত পাঢ়াও আকাইঞ"* (খরচা চালানোর মতো পয়সা আমার নেই, খাবার জোগাড় হবে তবে তো পড়াশুনো)। এখন মঙ্গলের ছেলেও দিনমজুরের কাজ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও লিঙ্গ বিভাজন

বালক এবং বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

বেশিরভাগ মা-বাবা তাঁদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান ভাল বিয়ে, বিয়ের কম পণ এবং মা হওয়ার পরে মেয়েরা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে সক্ষম হয় সেই কারণে। কিছু কিছু মা-বাবার মাথায় আবার অতিরিক্ত উদ্দেশ্য থাকে। তাঁরা মনে করেন তাঁদের বাড়ির কন্যাসন্তান যদি দশম শ্রেণিতে উঠে যায়, তাহলে তারা হয়তো শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরি পেতে পারে। এতে তাদের ভাল বিয়ে হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

বহু মা-বাবা'ই চান মেয়েরা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যাক। কিন্তু কিছু সম্প্রদায়ভুক্ত মা-বাবা (যথা তফসিলী জনজাতি কোঁড়া সম্প্রদায়ের) প্রথানুসারে তাঁদের মেয়েদের বাল্যবয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। ধীবর বা কুম্ভকার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির মেয়েদের পড়াশোনা শিখিয়ে যাওয়ার জন্য তারা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তর ছাড়িয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে এটা ঠিক বলা যাবে না।

বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেন, লেখাপড়া জানা মেয়েরা সংসার আরও ভাল করে চালাতে পারে। কেন না তারা হিসেব-পত্র রাখতে পারে, দৈনন্দিন সংসার খরচ হিসেব করে করতে পারে ইত্যাদি। ফলে তারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির চোখে সম্মান পাবে। লেখাপড়া জানা থাকার জন্য তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও পড়াতে পারবে। এক ছাত্রীর মায়ের কথায়, "আমরা নিজেরাই এত কম লেখাপড়া জানি যে বাচ্চাদের পড়া দেখাতে পারি না", পুরুলিয়ার কিছু বিত্তবান পরিবার ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠান। পুরুলিয়ার লৌলাড়া গ্রামের এক ছাত্রীর মা বলেন, "মেয়ে ভাল পড়লে, ইংরাজি শিখলে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বিনা পয়সায় বিয়ে করে নিয়ে যাবে।"

অন্যদিকে, বহু সাঁওতালই মনে করেন না যে লেখাপড়া ঘরের মেয়েদের বিয়ের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে, যেহেতু তাঁরা মেয়ের বিয়েতে পণ দেন না। তাছাড়া, সাঁওতালদের অনেকের মধ্যে এখনও মেয়ের বিয়েতে পণ নেওয়াটাই চালু আছে। যাই হোক, তুলনায় শিক্ষিত মেয়েদের সাধারণত সম্পন্ন ঘরে বিয়ে হয়।

এ সত্ত্বেও ছেলেরাই মা-বাবার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য হওয়ায় শিক্ষাগত ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকার পায়।

পরের পাতার সারণী দেখলে বোঝা যাবে যে বিভিন্ন মাতা-পিতার বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিপুল সংখ্যক মাতা-পিতা চান তাঁদের সন্তানরা প্রাথমিক শিক্ষা পাক। ২১২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮৮ জন কন্যাসন্তানের ভালো বিয়ের সম্ভাবনার কথা ভেবেই যে এটা চান তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারণী থেকে বোঝা যায় ৭৭ জন উত্তরদাতার কাছে মেয়েদের শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা কন্যারা যাতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারে, সেই কারণে। ছেলেদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৪৮। ছেলে হোক বা মেয়ে, শিক্ষাপ্রাপ্তিকে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। রুজিরোজগারের সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসাবে দেখা হচ্ছে।

২.১.১ শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা

	ছেলে	মেয়ে
কর্মে নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি/রোজগারের সম্ভাবনা	১৩৮	৮৯
সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি	৯৬	৭৪
আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা গঠন	১০৫	৭০
আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি	৮৬	৫৬
চিঠিপত্র লেখা/হিসাবপত্র রাখার সক্ষমতা	৯৭	৮১
আপন সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো	৪৮	৭৭
বিবাহ সম্ভাবনা	৭	৮৮

(একই উত্তরদাতা একাধিক প্রয়োজনের কথা বলেছেন)

শিশুরা কতদূর পড়বে – মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা

বেশির ভাগ মা-বাবা'ই যদিও তাঁদের শিশু সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চান, অনেকেই কিন্তু জানেননা কতদিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবেন। ৬২ জন উত্তরদাতা তাঁদের পুত্র সন্তানদের লেখাপড়া যতদূর পর্যন্ত সম্ভব চালিয়ে যেতে চান, কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ২৭। কিন্তু এই ইচ্ছাটা বিভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম -- পরিবারের সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষাদীক্ষার স্তর অনুযায়ী এটি বদলে যায়।

শিশুদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধাই মা-বাবাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে বারবার জানানো হয়। "*পড়াতে তো চাই, কিন্তু কতদূর টানতে পারবো কে জানে,*" এ কথা বলার সময়ে বীরভূমের এক খেতমজুরের স্ত্রীর গলায় তীব্র হতাশা ঝরে পড়ছিল। ১৬ জন উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা তাঁদের পুত্রদের প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াতে চান, কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আট। বিশাল সংখ্যক উত্তরদাতা (পুরুষ ৩৪, নারী ৪২) তাঁদের কন্যাদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে চান। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, নীচের সারণী দেখাচ্ছে, ২৫ জন উত্তরদাতা তাঁদের পুত্রদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরেও পড়াতে চাইছেন। কন্যাসন্তানদের বেলায় অঙ্কটা ১০। আঠারো জন উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা চান বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কন্যারা লেখাপড়া চালিয়ে যাক।

২.১.২ ছেলেমেয়েদের কতদূর পর্যন্ত মা-বাবারা পড়াতে চান

	পুত্র	কন্যা
৫ম ক্লাসের নিচে	৩(১.৮)	৫(৩.৬)
প্রাথমিক থেকে ৫ম ক্লাস পর্যন্ত	১৬(৯.৮)	৮(৫.৮)
৮ম ক্লাস পর্যন্ত	৮(৪.৯)	১৮(১৩.১)
৯-১০ম ক্লাস পর্যন্ত	৩৪(২০.৮)	৪২(৩০.৪)
উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত	৭(৪.২)	৪(২.৯)

	পুত্র	কন্যা
বিএ/বিএসসি পর্যন্ত	১৩(৭.৯)	৭(৫.০)
এমএ/এমএসসি পর্যন্ত	১২(৭.৩)	৩(২.২)
যতদূর সম্ভব	৬২(৩৮.৪)	২৭(১৯.৬)
পয়সা যতটা দেয়	৮(৪.৯)	৬(৪.৩)
কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত	--	১৮(১৩.১)
মোট	১৬৩(১০০)	১৩৮(১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মা-বাবা'রা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠেছেন তাঁদের পুত্রসন্তানদের লেখাপড়া চালানোর জন্য তাঁরা যতটা সম্ভব খরচ করবেন। কিন্তু কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৫০ শতাংশেরও কম।

ক্ষমতা এবং শিক্ষা – একজন শবর-এর উদাহরণ

কৃষ্ণ শবরকে এক চাষী জিজ্ঞাসা করেন, "*কাল কাজে (মজুরি) আসবি তো?*" "*কাল .... মানে .... কাল আমার কিছু অন্য কাজ আছে .... পরশু দিন করা যায় না?*" বিনীত, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলেছিলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ জমি মালিকের সঙ্গে এমনভাবে টক্কর দিয়ে কথা বলার সাহস রাখে না। কৃষ্ণ পুরুলিয়া জেলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। পঞ্চায়েত সদস্য বলে এইটুকু হিম্মৎ তার আছে, কৃষ্ণ পরে আমাদের বুঝিয়েছিলেন। "*আমি সোজা রাজি হয়ে গেলে ও তখন আমাকে ওর ইচ্ছে মতো কাজ করাতো – মজুরি বা অন্য ব্যাপারে।*"

এলাকার খেড়িয়া শবরদের মধ্যে কৃষ্ণর কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ওই ক্ষমতাটুকু তাঁকে দিয়েছে। তিনি এই সদস্যপদ অর্জন করেছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হওয়ায়। তিনি প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন শিক্ষাগত যোগ্যতায়— চার জন শিশু সমেত ছয় জনের পরিবারে তিনি একজন '*ক্লাস এইট পাস*' লোক। রাজনৈতিক দল, পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরমের মারফৎ বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তারই ভিত্তিতে তিনি তাঁর দুই ছেলেকে পুরুলিয়ার মিশন স্কুলে ভর্তি করতে পেরেছেন।

বাকি শবরদের কাছে এটা নিছক স্বপ্ন মাত্র। এলাকার শিশু বনে বনে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এলাকার হাতে গোনা কয়েকটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। "*খেতে পায়নি, পড়বে কী?*" এলাকা জুড়ে এই সুর।

কৃষ্ণ নিজেই দিনমজুর। এলাকার সব খেড়িয়া শবরই দিনমজুর। কখনও যখন মজুরের কাজ মেলেনা এঁরা শিকার বা অন্যান্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করেন, কখনও কাজের খোঁজে বর্ধমানে চলে যান। "*ছেনাপুনা সভেই যায়, কী ক্যরব্যেক এথা?*" প্রশ্ন ধেনু শবরের। আগেকার দিনে জঙ্গল থেকে খাবার পাওয়া যেত, এখন তো তাও শেষ হয়ে গেছে। একান্তই ক্ষুধার তাড়নায় ছোট ছেলেমেয়েরা খোলা মাঠে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, নানা

ধরনের খাদ্য সংগ্রহ করে -- মরা বা জ্যান্ত জানোয়ার, ফলপাকুড় ..... এইসব। *"বড়রা সহি লেয়, এটাই নিয়ম, ছেনাপুনাদের কি সহে?"* কৃষ্ণর মতে এলাকার খেড়িয়া শবররা দিনে একবার খেতে পান। তার বেশি খাওয়াটা কশ্চিৎ কদাচিতের বিলাসিতা। *"নুন দিয়ে আমরা অনেকটা করে চা খাই। রাতের খাবার এক বাটি চায়ে হয়ে যায়। রাতে যদি কখনও খাওয়া হয় তো নুন-চায়ের বাটি পরদিন একসঙ্গে সকাল দুপুরের খাবার হয়ে যায়।"* বাচ্চারা এই অভ্যাসটা এখনও রপ্ত করতে পারেনি। তারা খিদের জ্বালায় কাঁদে। নিজেদের মতো করে খিদের জ্বালা মেটায়। অক্ষর চর্চার থেকে ইঁদুর মারা ওদের কাছে অনেক বেশি জরুরী।

কৃষ্ণ বিশ্বাস করেন যে এখানে থাকলে তাঁর ছেলেদেরও ওই একই দশা হত। পড়াশোনা শিখতে পারার জন্য তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। *"আমি লেখাপড়া শিখেছি, তাই আমার ছেলেরাও লেখাপড়া শিখতে পারছে।"*

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি লেখাপড়া শিখলেন কী করে? *"আমি ভাগ্যবান, ছেলেবেলায় আমি আমার কাকার বাড়ি গিয়েছিলাম। কাকা আমাকে একটা বিনা খরচের আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিতে পেরেছিলেন। এটা নাহলে আমার ৮ ক্লাস পাস করা হোত না।"* একটু হেসে তিনি বলেন, *"অন্তত খাবারের জন্য আমাকে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না।"*

শিক্ষকদের অভিমত

ভর্তির হারে নিঃসন্দেহে একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে প্রায় সব বিদ্যালয় শিক্ষকই জানিয়েছেন। শিক্ষার দৃশ্যপট পালটেছে এটা স্বীকার করে নিয়েই বহু শিক্ষক তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে কম হারে উপস্থিতি এবং বর্ণহিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় তাদের ভাষাগত সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিছু কিছু শিক্ষকদের মতে মা-বাবা'র শিক্ষা-চেতনার অভাব শিশুদের শিক্ষাপ্রাপ্তির পথে গুরুতর বাধা। ইসলামপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মতে, ছেলেমেয়েদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে মা-বাবা'রা যথেষ্ট সচেতন নন। শিক্ষকরা তাঁদের কাছে এসে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে বলেন। কিন্তু তাতে আদৌ সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায়না।

আর এক শিক্ষক বলেন, "এখন সব মা-বাবা'ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চায়। ভর্তি সমস্যা নয় -- সমস্যা নিয়মিত উপস্থিতির হার এবং বিদ্যালয় ছেড়ে না দেওয়ার।"

যে ১৮ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ১৭ জন বলেছেন যে তাঁদের বিদ্যালয়ে যতজনকে পড়ানো সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। কেবল পুরুলিয়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ব্যতিক্রম, মাত্র ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষকরা এত কম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য তাদের মা-বাবাদের (খাদ্য সংগ্রহই যাঁদের প্রধান উপজীবিকা ছিল সেই খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়) সম্পূর্ণ দায়ী করেন।

১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব ক'টির শিক্ষকই মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দরকারী জিনিসগুলি হল :—

(ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক

(খ) শ্রেণিকক্ষের জন্য যথেষ্ট জায়গা

(গ) শিক্ষার উন্নততর গুণমান

(ঘ) মধ্যাহ্ন আহার দেওয়ার কর্মসূচি (প্রকৃত অর্থে 'খাবার'। বর্তমানে সময়ান্তরে দেওয়া 'চাল' নয়)

(ঙ) তফসিলী জাতি, জনজাতি এবং অন্য গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক আবাসিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

"*এটাই ঠিক সময়*", এক শিক্ষকের মন্তব্য। "*মা-বাবা'রা শিক্ষায় আগ্রহী। সরকারের পক্ষ থেকে এখন প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তুলতে আরও শক্তি নিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।*"

(গ) শিশুদের প্রেরণা

শিশুরা কতটা অনুপ্রাণিত? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের ৯২ শতাংশই খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে যে বিদ্যালয় তাদের ভাল লাগে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের ৯৮ ভাগ শিশুরই পড়তে যেতে ভাল লাগে। বিদ্যালয় ভাল লাগার অন্য কারণ থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এই দুইয়েরই সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুরা জানিয়েছে যে তাদের পড়াশোনা করতে ভাল লাগে। শ্রমজীবী ঘরের বহু শিশু জানিয়েছে যে তাদের খেতমজুরের কাজ করতে ভাল লাগেনা, "*পরের ঘরে নাঁয় খাট্যব*"। বহু শিশুর কাছে বিদ্যালয় দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের বোঝা হাল্কা করার জায়গা। ("*বাগালি করতে যেতে হয় না*" ইত্যাদি)। কারও কারও কাছে, বিদ্যালয় মানে, সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি। এক খেতমজুরের ছেলের কথায়, "*আমার বাবা লিখাপড়া জানে না, চিঠিও লিখতে পারে না .... কিন্তু আমাকে লোকে মূর্খ বলবে না।*"

সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার পিছনে আরও উচ্চাশা কাজ করে – তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিদ্যালয় শিক্ষক ইত্যাদি হতে চায়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বহু ছাত্রীর চোখে সহায়িকারা হয়ে ওঠেন আদর্শ – "*দিদিমণি হব*"।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, যে সব শিশুরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে তারা তাদের বিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়ার আনন্দ পায়। মাত্র ৮.৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু তাদের বিদ্যালয় ভাল লাগে না বলে জানিয়েছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৯৮ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই জানিয়েছে যে তাদের পড়তে ভাল লাগে।

২.১.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়/শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভাল লাগার কারণ

কারণসমূহ	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলার সুযোগ	২৫	১০
লেখাপড়া করতে ভাললাগা	৬৩	৪৪
শিক্ষককে পছন্দ করা	২০	১৮
উত্তর নেই	৩	৩

লেখাপড়া চালিয়ে যাবার ঝোঁক

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ৯১ শতাংশ পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। ৯ শতাংশ জানিয়েছে তারা আর পড়তে চায় না। শেষোক্তদের মতে লেখাপড়া শিখে জীবনে কিছু লাভ নেই। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ৯৪ শতাংশ পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় এবং ৬ শতাংশ তা চায় না, যেহেতু এতে কোনো লাভ নেই।

২.১.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠরত শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
আরও পড়তে চায়	৭৯(৯১)	৪৬(৯৪)
চায় না	৮(৯)	৩(৬)
মোট	৮৭(১০০)	৪৯(১০০)

(বন্ধনীতে দেওয়া সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

"*কেন পড়তে চাও?*" এ প্রশ্নের উত্তরে শিশুরা নানা ধরনের জবাব দিয়েছে। উত্তরগুলি নিচের সারণীতে দেওয়া হল :

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
চাকরি করতে চাই	৬(৭.২)	৩(৬.৫)
ডাক্তার হতে চাই	১(১.২)	০
হিসেব-পত্র রাখতে চাই	৩(৩.৬)	১(২.২)
আরও পড়তে চাই	২৮(৩৪.০)	১৪(৩০.৪)
পড়লে উন্নতি হবে	৫(৬.০)	১(২.২)
নার্স হতে চাই	১(১.২)	২(৪.৩)
রোজগারের সুযোগ বাড়বে	৬(৭.২)	৪(৮.৭)
ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই	২(২.৪)	০
শিক্ষক হতে চাই	১১(১৩.২)	৮(১৭.৪)
উত্তর নেই	২০(২৪.০)	১৩(২৮.৩)
মোট	৮৩(১০০)	৪৬(১০০)

(বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

২.২ বাস্তব অসঙ্গতি

বর্ণ-শ্রেণী-লিঙ্গ নির্বিশেষে উত্তরদাতাদের মনে যে ধারণার মিল দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেটা এই রকম, "*সমাজে চলতে গেলে লেখাপড়া দরকার।*" অথবা বাইরে গেলে কিছু না জানলে বাস চিনতে পারবে না, ট্রেনে চড়তে পারবে না, ইত্যাদি। কোনও

কাগজ এলে অন্য জনের কাছে পড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, "*আমরা লেখাপড়া শিখি নি, আমাদের ছেলেমেয়েদের আর কিন্তু মূর্খ করে রাখতে চাই না।*"

(ক) স্কুলে ভর্তি ও স্কুলছুট

ভর্তির হার বাড়ার মধ্যে উপরোক্ত ধারণা কাজ করে। আমাদের উত্তরদাতাদের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা) ৪১.৫ শতাংশ যেখানে নিরক্ষর এবং কেবলমাত্র ১৪.৬২ শতাংশ অষ্টম শ্রেণির ওপরে লেখাপড়া করেছেন (দ্রষ্টব্য সংযোজনী সারণী ৩.৩.৩) সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে প্রতি ঘর থেকে গড়পড়তা ২.০৭ জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখাচ্ছে।

২.২.১ সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির অবস্থা

পরিবারের সংখ্যা	১৯৬
বালকদের সংখ্যা	১৯৯
বালিকাদের সংখ্যা	২০৭
প্রতি গৃহে গড়পড়তা বিদ্যালয়ে ভর্তি শিশু	২.০৭

বিদ্যালয়ে কখনোই ভর্তি না হওয়া শিশু এবং স্কুল ছেড়ে দেওয়া শিশুদের বয়সসীমা (দ্রষ্টব্য, সারণী ২.২.৩) থেকে মনে হয় যে মোটামুটিভাবে কোনও মা-বাবা'ই আজকাল আর চান না তাঁদের সন্তান বিদ্যালয়ে না যাক। আমাদের সমীক্ষাকৃত ১৮টি বিদ্যালয়ে আমরা দেখেছি যে প্রতি বিদ্যালয়ে গড়পড়তা ১২৭.২৭ জন শিশু আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারে বালক আর বালিকারা প্রায় সমান সমান (৫০.১৯ শতাংশ বালক, ৪৯.৮১ শতাংশ বালিকা)। মোট সংখ্যার ২৮.১০ শতাংশ তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের। তফসিলী জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ১০.০৩ শতাংশ। এই ১৮টি বিদ্যালয়ের ৪টিতে কোনও তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের এবং ৫টিতে তফসিলী জনজাতি সম্প্রদায়ের শিশু ছিলনা (সেই এলাকার জনবিন্যাসের কারণে)।

২.২.২ ১৮টি বিদ্যালয়ে ভর্তির জনগোষ্ঠীগত শ্রেণিবিভাগ

সব শ্রেণি			তফসিলী জাতির ছাত্র			তফসিলী জনজাতির ছাত্র		
বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
১১৫০	১১৪১	২২৯১	৩৩৭	৩০৭	৬৪৪	১২৪	১০৬	২৩০

আমাদের দেখা ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আমরা মোট ভর্তির সংখ্যা পেয়েছি ৮৯২। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পিছু গড়ে ৫২.৫ জন শিশু ভর্তি ছিল। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি চালানোর জায়গার দুর্দশাটির কথা মাথায় রাখলে এই সংখ্যা উৎসাহজনক বলে মনে হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা যেখানে মোট ৪৬৯ (৫২.৫৭

শতাংশ) সেখানে ছাত্রী ভর্তি হয়েছে মোট ৪২৩ জন (৪৭.৪৩ শতাংশ)।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ঘুরে দেখার সময় শিক্ষক এবং সহায়িকারা বলেছেন যে, এ সব এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বহুসংখ্যক শিশু বিদ্যালয়-ব্যবস্থার মধ্যে আসতে পারত না।

কখনোই ভর্তি না হওয়ার মাত্রা

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির একটা তাৎপর্যময় শতাংশ (১৪ শতাংশ)তেই যেমন কখনোই ভর্তি না হওয়া বালক/বালিকাদের দেখা গিয়েছে, তেমনই বলা যায় এদের বড় সংখ্যা (৭৩ শতাংশ)ই তুলনায় বেশি বয়সের (১১-১৮)। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ১১ বছরের থেকে কম বয়সী এমন শিশু খুব কম ঘরেই আমরা দেখতে পেয়েছি যাদের কখনোই স্কুলে ভর্তি করা হয়নি।

২.২.৩ কখনোই স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিশু

যে কটি বাড়িতে শিশু কোনওদিন ভর্তি হয়নি	৩০ (১৪.১৫ শতাংশ)
বালক	২২ (৭.০২ শতাংশ)
বালিকা	২৬ (৭.৩৪ শতাংশ)
মোট	৪৮ (৭.১৯ শতাংশ)

যাই হোক, কিছু বাড়ি আমরা পেয়েছি যেখানে স্কুলে ভর্তি শিশুর সঙ্গে সঙ্গে কখনোই ভর্তি না হওয়া বা স্কুলছুট শিশুও আছে। সাধারণত তুলনায় বেশি বয়সের, বিশেষ করে বালিকাদেরই দ্বিতীয় ভাগটিতে বেশি করে দেখা যায়। তিনটি জেলাতেই কখনোই ভর্তি না হওয়া বালিকাদের সংখ্যা বালকের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।

কোনও দিন ভর্তি না হওয়ার কারণ

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে না আসার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক হলেও, বিদ্যালয়ের দূরত্ব, পারিবারিক বাধ্যতা এবং সামাজিক ব্যবধানের কারণগুলি সহ অন্য আরো কারণ আছে (এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পেতে ২.৩ বিভাগ দেখুন)।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শিশুদের দিয়ে বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম করানোর প্রয়োজনীয়তা। গরিব ঘরের শিশুদেরই এরকম কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মজুরি খাটতে যাচ্ছেন, তুলনায় বেশি বয়সী বাচ্চারা আরও কম বয়সী শিশুদের দেখাশোনা করছে। একটু বড় মেয়েরা ঘর সামলাচ্ছে, রান্নাবান্না করছে ইত্যাদি।

বালকদের মধ্যে স্কুলে যেতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হল দারিদ্র। স্কুলে না যাওয়া এইসব বাচ্চারা রোজগারের কাজে জড়িয়ে পড়ছে। গরু-ছাগল-মোষ চরাচ্ছে, অন্যের বাড়িতে বাগাল খাটছে ইত্যাদি। কিছু মা-বাবা'র মতে, 'বাগাল খাটলে অন্তত নিজের পেটের বন্দোবস্ত করতে পারে, কখনও কখনও ঘরেও দু-চার পয়সা সাহায্য করতে পারে'। বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুদেরও প্রায় সবাই তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের।

প্রথমে দরকার আমাদের পেট ভরানোর

"*পইসা দাও যাব পড়তে*" নির্দ্বিধায় এ কথা বলে পুরুলিয়ার লৌলাড়া গ্রামের শিবানী বাউরি (১৫)। স্কুলে যেতে চায় কি না সেই প্রশ্নের জবাবে সে মুখ বেঁকিয়ে বলে, "*আগে পেটের জোগাড়।*"

খেতমজুর দয়াময় বাউরির দ্বিতীয় কন্যা শিবানী। এলাকায় কাজের সুযোগ কম থাকায় দয়াময় সপরিবারে বর্ধমানে চলে যান খেতমজুরির জন্য। বাড়ির বাচ্চা মেয়েদের মধ্যে শিবানী সবচেয়ে বড় হওয়ায় তার উপর দায়িত্ব ছিল তার ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করার এবং সে সংসারের আরও বড় ধকল—রান্নাবান্না, জল আনা এ সব পোয়াতে পোয়াতে বড় হয়ে ওঠে। এখন সে আরও বড়, তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্ধমানে চলে গেছে মজুরি খাটতে।

শিবানীর বড় ভাই (১৮) কিন্তু শিবানীর মতো হয়নি। সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখায়। শিবানীর ছোট বোনও। দুজনেই অবশ্য তৃতীয় শ্রেণি পাস করার আগেই বিদ্যালয়ে পড়া ছেড়ে দেয়। কেন? "*ওই যে বল্লি, পেট চালাবেক না ইস্কুলে যাবেক*", বিদ্যালয়ে যাওয়া মানে রোজগার না করা। শিশুরাও সংসারে চুলো জ্বালিয়ে রাখার মতো পয়সা দেয়, তা সে যত কমই হোক না কেন। স্কুলে না গিয়ে শিবানীর ভাই অন্যের গরু-মোষ চরিয়েছে। এখন সে বড় হয়ে ওঠা খেতমজুর। ছোট বোন শিবানীর পথ ধরেছে। ওদের ছোটভাই এখন গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণির ছাত্র। ওরা চায় ভাই আরও বেশি পড়াশোনা করুক। কিন্তু ওদের সে ইচ্ছে পূর্ণ হবে কি না ওরা জানে না।

"*এতে টাকা পয়সা লাগে*", শিবানী ফের বলে। "*জানি না কতদিন ইশকুলে যাতে পারব্যেক, হয় তো কিছুটা হিসাব নিকাশ আর চিঠি লিখা শিখব্যেক। তারপর পড়া ছাড়্যি দিব্যেক।*" হয় তো সাগর এর মধ্যেই বাগাল খাটা শুরু করেছে। বিদ্যালয়ের খাতায় প্রায়ই গরহাজিরার ঢ্যারা পড়ে ওর নামের পাশে।

তবুও সে হাইস্কুল পরীক্ষা পাশের স্বপ্ন দেখে। গাড়ি মেরামতির কারখানায় কাজ পেতে চায়।

২.২.৪ বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার কারণ

	বালক	বালিকা	মোট
শিশুকে অন্য কাজের জন্য লাগানো	৫	৯	১৪
বিদ্যালয় খরচসাপেক্ষ	১	৩	৪
বিদ্যালয় দূরে	৮	১	৯
শিশু প্রতিবন্ধী	১	১	২
শিশুর পড়াশোনায় অনাগ্রহ	১০	১০	২০
দারিদ্র্য	৮	৭	১৫

স্কুলছুটদের বয়স

কখনোই ভর্তি না হওয়া শিশুদের মতো ৬-১১ বয়সসীমার শিশুদের মধ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা খুব কম। ৩৭ জন বিদ্যালয় স্কুলছুটের মধ্যে মাত্র ৬ জন ৬-১১ বয়সসীমার মধ্যে পড়েছে।

২.২.৫ স্কুলছুটের বয়স

বয়সসীমা	বালক (কিশোর)	বালিকা (কিশোরী)	মোট
৬-১১	৩	৩	৬
১২-১৫	১৪	১২	২৬
১৬-১৮	৩	২	৫

কখনোই ভর্তি না হওয়া শিশুদের সঙ্গে স্কুলছুটদের পার্থক্য এই যে এ ক্ষেত্রে বালিকাদের থেকে বালকদের সংখ্যা বেশি। এ ক্ষেত্রেও সংখ্যায় বেশি আসছে তফসিলী জাতি ও জনজাতি/মুসলিম সম্প্রদায়ের শিশুরা।

২.২.৬ স্কুলছুট শিশুদের গৃহের জনগোষ্ঠীগত শ্রেণি

তফসিলী জাতি	৬২-র মধ্যে ৮ জন (১৩ শতাংশ)
তফসিলী জনজাতি	৬০-র মধ্যে ১৩ জন (২১.৬৬ শতাংশ)
বর্ণ হিন্দু	৭০-র মধ্যে ৯ জন (১৩ শতাংশ)
মুসলিম	২০-র মধ্যে ৭ জন (৩৫ শতাংশ)

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পিছনে দারিদ্র প্রধান কারণ হলেও, অন্য কারণও আছে। একটি হল, শারীরিক শাস্তির ভয়। পুরুলিয়ার এক শিশু তার আত্মীয় বাড়ি গিয়েছিল। এর জন্য সে কুড়ি দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি। শিক্ষক শাস্তি দেবেন এই ভয়ে বাড়ি ফেরার পর সে আর স্কুলে যেতে চায় না। এ ঘটনার পরে তাকে আর কোনদিন বিদ্যালয়ে পাঠানো যায়নি।

২.২.৭ স্কুলছুটের কারণ

শিশুটি আর পড়তে চায়নি	১৬
খাতা থেকে নাম কেটে গেছে	৫
আর্থিক দারিদ্র্যদশার জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে	৪
মা-বাবা'রা ছাড়িয়ে আনছেন	৪
বিদ্যালয় অনেক দূরে ছিল	৭
শিক্ষার নিম্ন মান	৫
শিশু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি	৩
মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক শাস্তির ভয়ে	৩
অন্যান্য কারণে	১

উত্তরদাতারা একসঙ্গে একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন

২.২.৮ স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের কাজকর্ম

ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা	৪
ঘরের কাজে সাহায্য	৭
অন্য কাজ করে সংসারে আর্থিক সাহায্য	৭
মজুরি	৩
গরু-মোষ চরানো	৩
খেলে বেড়ানো	৫

উত্তরদাতারা একসঙ্গে একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন

বিদ্যালয়ের দূরত্ব

ভর্তির সংখ্যাবৃদ্ধি খানিকটা নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কতটা দূরে তার উপরে। প্রতিষ্ঠানটি যখন দূরে হয় সেখানে ভর্তি হতে/করাতে শিশু এবং তাদের মা-বাবাদের মধ্যে অনিচ্ছা কাজ করে। সোতেরডাঙ্গা বলে একটি সাঁওতাল গ্রামের ২.৫ কিমি ব্যাসার্ধের ভিতরে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। মিনিটে মিনিটে বহু ট্রাক বাস চলা ব্যস্ত হাইওয়ে পার হওয়ার মস্ত ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের হেঁটে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হত। বারমানিয়া গ্রামেরও সেই দশা। ধানখেতের কাদাভরা আলের মধ্য দিয়ে ২ কিমি পথ হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হত শিশুদের। প্রাথমিক বিদ্যালয়-শিক্ষা ব্যবস্থায় দূরত্ব ব্যাপারটা দেখা গিয়েছে ভর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা জরুরী দিক। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কেবল শিশু ভর্তির সংখ্যাই বৃদ্ধি করেনি, সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে নিয়ে আসতেও পেরেছে।[৪২]

পরিকাঠামো

ঘুরে দেখা ১৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি বিদ্যালয় (এবং বেশ কয়েকজন মা-বাবা) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর দুর্গতি নিয়ে অভিযোগ করেছেন। ১৮টি বিদ্যালয়ের মাত্র একটিতে শ্রেণি পিছু একটি করে শ্রেণিকক্ষ আছে। বাকি সব ক'টিতেই দুই বা ততোধিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা। "*এই ব্যবস্থায় পড়ানোর মান কী আশা করেন?*" এক শিক্ষকের প্রশ্ন। "*আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের পড়াই তখন প্রথম শ্রেণির শিশুরা চিৎকার চেঁচামেচিতে নরকগুলজার করে তোলে*" —তিনি অভিযোগ করেন।

ঘুরে দেখা ১৮টি বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরের অবস্থা

২.২.৯ বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরের অবস্থা

কোন ক্লাসঘর নেই	১টিতে
একটি ক্লাসঘর	৪ টিতে
দুটি ক্লাসঘর	৮ টিতে
তিনটি ক্লাসঘর	৪ টিতে
চার কিংবা তার বেশি ক্লাসঘর	১ টিতে

অনেক ক্ষেত্রেই ক্লাসঘরগুলির অবস্থা শোচনীয়। সব বিদ্যালয়েই ক্লাসঘরের সংখ্যা ও আয়তনের হিসাবে ব্যবহারযোগ্য জায়গা পর্যাপ্ত নয়। সব বিদ্যালয়েই ৪টি করে শ্রেণির (প্রথম থেকে চতুর্থ) শিশুদের পড়ানো হয়। যাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স হয়নি কিন্তু মা-বাবা'রা বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন, যদি সেই একেবারে ছোট শিশু শ্রেণির বা ছোট এক শ্রেণিকেও হিসাবে আনা যায় তাহলে কিছু বিদ্যালয়ে বস্তুত ৫টি করে শ্রেণিও আছে।

সূচপুরে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে এলাকাতে একটি ব্যাপক হত্যাকান্ড ঘটে যাওয়ার ফলে বিদ্যালয় ভবনটি (বাইতাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়) পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিল এবং এখনও তেমনই আছে। এক শিক্ষক জানান, "*আমরা গাছের তলায় ক্লাস নিই।*" ওই একই জেলার আর একটি স্কুলবাড়ির অবস্থা ভগ্নদশাগ্রস্ত। ডিপিইপি'র বানানো ছোট একটি পাকা ঘর আছে। আর আছে তুলনায় বড় একটি পুরোনো ঘর — টিনের চালা, মাটির দেওয়াল। মাটির মেঝেতে বৃষ্টির জল ফোঁটাফোঁটা করে পড়ে এবং শিশুরা কোনওক্রমে (প্রধানত শিক্ষকদের ভয়েই) ওই মেঝেতেই বসে। এটি একটি জনজাতি অধ্যুষিত বিদ্যালয়। ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুপ্রধান গ্রামে আমরা পাকাবাড়ির একটি বিদ্যালয় দেখেছি — এটির নিয়মিত দেখাশোনা করা হয় সেটা বোঝা যায়।

দারিদ্র ও স্কুলছুট

চুনু শেখ একজন ছোট ব্যবসায়ী। ছেলেকে টিউশনের টাকা যোগানোর মতো অর্থবল তাঁর নেই। "খেতে দিতেই প্রাণ যায়", তাই তিনি যখন গ্রামে গ্রামে চুলের ফিতে, টিপ, প্লাস্টিকের খেলনা, সংসারের সাজ সরঞ্জাম বেচতে যান, সঙ্গে তাঁর ১০ বছরের ছেলেকেও নিয়ে যান। ছেলে বাবার বোঝা কিছুটা বয়, যাতে, "আমরা বিক্রির আরও জিনিস রাখতে পারি।" কঠিন ভবিষ্যৎ বোঝার শিক্ষাটা পাওয়ার সময় সে অন্তত পেটটা চালানোর মতো রোজগার করছে। "ইসকুল কি এসব দেবে?" চুনুর প্রশ্ন।

কালু হাঁসদার দু বিঘে জমিতে ফলানো ফসলে ৪-৬ মাসের খাদ্য উৎপন্ন হয়। কাছের দিকুদের (অ-সাঁওতাল) জমিতে তিনি মজুরি খাটেন। তাঁদের ১২ বছরের মেয়ে মুন্নি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। কালু বলেন, "ও লেখাপড়ায় ভাল ছিল", তবু সে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। কেন না তার বাবা প্রাইভেট টিউশনের টাকাও যোগান দিতে পারেন না (যা, কালুর মতে, লেখাপড়া শেখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়)। প্রয়োজনীয় বই খাতা কালি কলম পেনসিল কেনার পয়সার বন্দোবস্ত করতেও পারেন না। "দু বেলা ভরপেট খাওয়ার যোগানোই তো কঠিন", ফলে মুন্নি চাষের মরসুমে তার মায়ের সঙ্গে খেতমজুরি করে।

পুরুলিয়ার একটি জনজাতি এলাকা, একটি শবর টোলার বিদ্যালয়ের কোনও বাড়ি নেই। হস্টেলের জন্য তৈরি হওয়া একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে (বহুদিন ভগ্নদশাপ্রাপ্ত) বিদ্যালয় বসে। এই প্রেততুল্য বাড়িটির বিপরীত ছবিটি মেলে ওই একই জেলার একটি ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে। এর ইঁটের গাঁথনি। উপরতলাতে বিদ্যালয়ের কোনও কাজ হয় না। রাতে, সেখানে কিছু ছন্নছাড়া লোক থাকে। দিনে দুই বেকার যুবক প্রাইভেট টিউটোরিয়াল চালায়। একই গ্রামে একটি হরিজন বিদ্যালয়ে আছে একটিমাত্র মাটির ঘর।

মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি একটি বিদ্যালয়ের যেখানে ৪টি ক্লাসঘর, সেখানে

গোপীবল্লভপুরের প্রত্যন্তরে একটি বিদ্যালয় ভবনের কোনও দরজা, জানালা নেই।

ঘুরে দেখা অন্য বিদ্যালয়ের কোনওটিতেই দুয়ের বেশি ক্লাসঘর নেই। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই লেখাপড়ার বাইরে অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। নির্বাচন থেকে অন্নপ্রাশন, কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কাজে।

বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব আছে। নীচের সারণী থেকে বিদ্যালয় পরিকাঠামোর দুর্দশা বোঝা যাবে।

২.২.১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা	১৮
বাড়ি ছাড়া বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১
দরজা জানালাহীন স্কুলবাড়ির সংখ্যা	৪
মেরামতির যোগ্য স্কুলবাড়ির সংখ্যা	১৬
বাথরুম না-থাকা বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা	১৬
খেলার মাঠ না-থাকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৩
পানীয় জলের ব্যবস্থাহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬
ব্ল্যাকবোর্ড না-থাকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪
ম্যাপ নেই, চার্ট নেই যে সব বিদ্যালয়ে	৩
খেলনা, খেলার সরঞ্জাম নেই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৯
পড়ানোর সরঞ্জাম নেই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৯
গান বাজনার যন্ত্র নেই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫

<u>শিশু শিক্ষা কেন্দ্র</u> : ঘুরে দেখা ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কোনটিরই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঠিকঠাক বসার জায়গা নেই। ৩টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর নিজস্ব বাড়ি আছে, কিন্তু সেগুলি আয়তনে এতই ছোট যে অনেক শিশুকেই বাইরে বসতে হয়।

বেসরকারি বাড়িতে যেসব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। বেশিরভাগই কাজ চালায় কোনও বাড়ির বারান্দার নীচে বা গোয়ালঘরে। অন্য শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি যেগুলি পঞ্চায়েত বা সমাজ অনুমোদিত, তারাও জায়গার দিক থেকে ভাল অবস্থায় নেই। পুরুলিয়া জেলার কলমায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি চলে একটি "ষোল আনার ঘরে", মানে দশ ফুট বাই বারো ফুট একটি সমাজ ভবনে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬০।

মেদিনীপুরের ধেড়ুয়া, বারোমানিয়া এবং গোপীনাথপুরের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আরও ছোট। আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনগুলিতে আমরা বাচ্চাদের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামতা পড়তে দেখেছি।

শুধু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা নন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবা'রাও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বাড়ি বানানোর সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেন।

অন্যান্য সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা আরও খারাপ।

২.২.১১ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো

মালিকানা এবং ব্যবহার	বাড়ির ধরণ	সংখ্যা
বেসরকারি মালিকানা, বিনা ভাড়ায় চলে	বারান্দা, গোয়াল	৯
বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি	পাকা দেয়াল, টিনের চাল	৪
পঞ্চায়েতের বাড়ি, বিনা ভাড়ায় চলে	পাকা দেয়াল, ছাদ, মাটির মেঝে	২
সমাজ ভবন, বিনা ভাড়ায় চলে	চন্ডিমন্ডপ, দেয়াল নেই শুধু মাথায় ছাউনি	১
সমবায় সমাজের বাড়ি, বিনাভাড়ায় চলে	দরজা জানালা নেই পাকা মেঝে	১

শিক্ষকদের সংখ্যা

"জরুরী সমস্যা হিসেবে, আপনার মতে, শিক্ষক সংগঠনের কোনটা বেছে নেওয়া উচিত?" ১৮ জন শিক্ষকের ১৭ জনই এর উত্তরে বলেন, "শিক্ষকদের ঘাটতির সমস্যাকে অনতিবিলম্বে উপরে তুলে ধরা উচিত।" আমাদের মনোনীত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৫০:১।

বিদ্যালয়পিছু গড়পড়তা শিক্ষকের সংখ্যা ২.৫৫, রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গের গড়পড়তা শিক্ষকের সংখ্যা ৩.৩ জনের থেকে যা অনেক নিচে।[৪৩] ১৮টি বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র ৫টির শিক্ষক সংখ্যা ৩ কিংবা তার বেশি। বিদ্যালয়ে ৪টি নিয়মিত শ্রেণি ছাড়াও কিছু বিদ্যালয়ে ছোট-এক বা শিশু শ্রেণি আছে। সেই সব নিতান্তই ছোট শিশুদের নাম লেখানো না হলেও, সংখ্যায় তারা কম নয় বলে একজন শিক্ষক জানান।

তাই, বেশির ভাগ শিক্ষকের যা অভিযোগ এবং বহু মা-বাবার'ই যাতে সহানুভূতি আছে, তা হল শিক্ষকরা শিশুদের শিক্ষাদান করেন না, শিশুচারণ করেন ("আমরা ছেলে পড়াইনা, ছেলে চরাই")।

মাতা-পিতাদের একটা বড় অংশ যদিও শিক্ষিকাদের বেশি পছন্দ করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষিকা পেয়েছি। তফসিলী জনজাতির শিক্ষক আছেন ৬.৫২ শতাংশ এবং তফসিলী জাতির ১৭.৩৯ শতাংশ। তফসিলী জাতি ও জনজাতি শিক্ষকদের হারের সঙ্গে ভর্তি হারের নকশাটি মেলে না (২৯.৬৬ শতাংশ তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের শিশু এবং ১০.৫৯ শতাংশ তফসিলী জনজাতি সম্প্রদায়ের)।

এখানেও, শিক্ষকদের আবন্টনের ব্যাপারটি বড় প্রশ্ন। যেখানে শহরের কাছাকাছি কিছু বিদ্যালয়ে তিন বা ততোধিক শিক্ষক দেখা যায়, সেখানে প্রত্যন্ত এলাকায় একজন শিক্ষককে একশো বা তার অধিক ছাত্র-ছাত্রী কে পড়াতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেদিনীপুরের একটি গ্রামের উল্লেখ করা যায়, যেখানে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৩৫:১ এবং মোট শিক্ষক হচ্ছেন ৫ জন (সব কজনই মহিলা)। বীরভূমের মুসলিম অধ্যুষিত সূচপুর গ্রামে ৩

জন শিক্ষক ৪টি ক্লাস নেন। প্রতি ক্লাসে, গড়ে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে হয়।

২.২.১২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা

সমস্ত শ্রেণির			তফসিলী জাতি			তফসিলী জনজাতি			প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়
বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট		
৩২	১৪	৪৬	৭	১	৮	১	২	৩	২৮	১৮

<u>শিশু শিক্ষা কেন্দ্র</u>

শিক্ষক-সংখ্যার দিক থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অনেক ভাল। ঘুরে দেখা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির কেবল একটিই মাত্র একজন সহায়িকার দ্বারা চালিত। বাকিগুলিতে দুই বা তার বেশি সহায়িকা আছেন। বেশিরভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিই নতুন হয়েছে এবং কেন্দ্রগুলিকে কেবল দু'টি শ্রেণী (প্রথম ও দ্বিতীয়) চালাতে হয়। নির্বাচিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৫:১, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রপিছু গড়পড়তা ২.১১ জন সহায়িকা আছেন। শিক্ষার গুণগত মানের এই ব্যাপারটা একটা বড় পার্থক্য সৃষ্টি করে বলে শিক্ষক এবং মাতা-পিতারা জানিয়েছেন।

২.২.১৩ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা সংখ্যা

মোট	তফসিলী জাতি	তফসিলী জনজাতি
৩৬	১	১

শিক্ষকদের সংখ্যা সন্তোষজনক হলেও শিক্ষকদের সামাজিক গঠন শিশুদের সামাজিক গঠনের সঙ্গে খাপ খায় না। বেশির ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই তফসিলী জাতি এবং জনজাতি- প্রধান এলাকায় অবস্থিত, কিন্তু আমরা এই সামাজিক গঠনের দু'জন সহায়িকাই কেবলমাত্র পেয়েছিলাম। আমাদের সমীক্ষার কাজের সময় আমরা ছাত্র এবং সহায়িকাদের সামাজিক দূরত্ব টের পেয়েছিলাম। কিছু সহায়িকা শিশুদের 'ছোটলোকের ছেলে' হিসাবে আচরণ করেন, কিছু সহায়িকা স্বীকার করেন যে তাঁরা শিশুদের ভাষা বুঝতে পারেন না (যে শিশুরা সাঁওতাল বা কোড়া সম্প্রদায়ভুক্ত)। কিন্তু সমস্যাটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সংশ্লিষ্ট বহু-উদ্যোক্তা উল্লেখ করেছেন, তা হল এই যে, "*আমাদের [তফসিলী জাতি/জনজাতি] সম্প্রদায়ে শিক্ষিত মহিলা পাওয়া যায় না।*"[৪৪]

বিদ্যালয় শিক্ষার খরচ

ফেলে দেওয়া কাগজের ফালির উপর হোমটাস্ক করছিল সূচপুরের এক সাত বছরের বাচ্চা ছেলে। ৫-৬ টাকা দামের খাতা কিনে দেওয়ার ক্ষমতা তার মা-বাবা'র নেই। এ ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামের চলতি দৃশ্য, চমকে যাওয়ার কিছু নেই। "*পেটে দিতে ভাত নাই, খাতা কেমন করি কিনবা?*" গোপীবল্লভপুরের এক শিশুর মায়ের এই বক্তব্য। পুরুলিয়ার কুলটাঁড় গ্রামের এক শিশুকে ২০০১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের

নমুনা ব্যালট কাগজে পড়াশোনার কাজ করতে দেখা গিয়েছে।

আমাদের উত্তরদাতাদের ২৭ শতাংশ জানিয়েছেন যে (দ্রষ্টব্য, সারণী ২.২.১৪) বিদ্যালয় শিক্ষার একমাত্র আবশ্যকীয় বস্তু হল জামাকাপড় -- যেহেতু এটা এমন একটা খরচ, যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ২২ শতাংশের কাছে জামাকাপড় ছাড়া সামান্য কয়েকটা জিনিসও দরকার -- যেমন স্লেট, পেনসিল, ইত্যাদি।

বিভিন্ন খাতে খরচের অঙ্কটা ঘরে ঘরে পালটায়। যেমন এক খেতমজুর বলেন, জামাকাপড় বাবদ শিশু পিছু বছরে তাঁর ২০০ টাকা খরচ হয়। এই একই খাতে খরচ, এক কৃষকের ঘরে হয় বছরে ৫০০ টাকা। আর চাকরিজীবী, সম্পন্ন চাষী, ব্যাপারীর শিশুসন্তান বছরে ১০০০ টাকার জামাকাপড়েও খুশি হয় না। আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী বিদ্যালয়-শিক্ষা বাবদ খরচ তিন খাতে হয়—

(ক) জামাকাপড়; (খ) কাগজ-বই-পেনসিল ইত্যাদি; (গ) প্রাইভেট টিউশন

সুশীলার কাহিনী

সুশীলা সোরেন বীরভূমের এক গ্রামের অল্পসংখ্যক নারীদের মধ্যে একজন, যাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা হয়েছে। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। তাঁর ধর্ম কী জিজ্ঞেস করাতে তিনি যখন বলেন 'সারি ধরম' (সাঁওতাল ও অন্যান্য কিছু জনজাতির ধর্মীয় আচারের নাম), তখন তিনি যেন গর্বের প্রতিমূর্তি। বিস্ময়কর ভাবে যে ৩০ জন সাঁওতালদের সাক্ষাৎকার আমরা নিয়েছি তার অতি কম অংশই এমন ভাবে ধর্মীয় পরিচয়কে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান। তাঁদের ধর্মীয় মত হিন্দু/খ্রিস্ট ধর্মের বদান্যতায় ক্রমশ হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় মত থাকা সত্ত্বেও সাঁওতাল উত্তরদাতা বেশিরভাগ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছিলেন (এ সব গ্রামে খিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি)। ক্রমবর্ধমান হিন্দু -- বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, বাঙালি-প্রভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অবদমন সম্পন্ন করেছে। শ্রেণি-পটভূমির দৌলতে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সুশীলা কি করে এই চলতি হাওয়ার বাইরে রাখতে পারলেন নিজেকে?

"*আমি সাঁওতাল ভাষার বই আর পত্র-পত্রিকা পড়ি*", তিনি বলেন। "*আমাদের সাহিত্যে লেখা আছে সাঁওতালদের সারিধর্ম মেনে চলতেই হবে।*" "*কিন্তু এসব নীতিকথা তো সব সাঁওতালেরই শুনে শেখা*", বাধা দিয়ে বলি আমরা। "*হ্যাঁ, তা ঠিকই কথা, কিন্তু অকাটা অল মেনাআ: অনা দ আডি পাতিয়াও রেয়া জিনিস -- লেখা কথা (মানুষের মনে) বেশি বিশ্বাস আনে।*"

বিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তা তাঁকে এই আত্মপরিচয় সচেতনতা তৈরিতে সক্ষম করেছে। তিনি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী অ-আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয়ে আত্মপরিচয় নিমজ্জিত হওয়াকে আটকে দিয়েছেন। জমির মালিকানা, চাকরি, শিক্ষা, রাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সুবাদে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-আদিবাসী উচ্চশ্রেণির লোক। সুশীলার পরিবারের মেলামেশা বেশিকরে এঁদের সঙ্গেই। তাঁর কন্যা রোজ সাইকেল চালিয়ে রাজনগর গার্লস্ হাইস্কুলে যায়। সে সেখানে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সুশীলার বড় ছেলে আবাসিক বিদ্যালয় নেগুড়ি মিশন স্কুলে পড়ছে। ছোট ছেলে পড়ে সিউড়ি জেলা স্কুলে।

বড় ছেলের জন্য বছরে সুশীলার পরিবারকে ৩,৩২০ টাকা খরচ করতে হয়, যা সুশীলার প্রতিবেশী অনেকের সংবৎসরের রোজগার। সুশীলার পরিবার এই টাকা খরচ করতে পারে, কেননা তাদের ৬০ বিঘা (২০ একর) জমি আছে। চাষের উদ্বৃত্ত কেবল তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ বহন করতেই সক্ষম করে না, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতেও সাহায্য করে। এই যোগাযোগের সুবাদেই তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে জেলা স্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছেন। এখানেও, আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষমতা গ্রামের পরিবেশ শিশুদের শিক্ষার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বলে তাঁদের ভাবতে শিখিয়েছে। "আতো পরিবেশ দো আড়ি খারাপ, গিদরাকু মা আতোরে তাঁহেন কাতে বাং পাড়হাও দাড়েআ:।" নিজেকে হিন্দু বা খ্রিস্টান বলে পরিচয় না দিলেও, তাঁর শ্রেণি এবং সামাজিক অবস্থান (শ্রেণিগত অবস্থানের কল্যাণে যা আরও জোরদার হয়েছে) তাঁকে সমাজের মূল ধারার মতো করে চিন্তা করতে শিখিয়েছে – যে কারণে তিনি চান না তাঁর মেয়ে খাটা-খাটনির কাজ করুক। বরং সুশীলা চান যে তাঁর মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন করুক, যাতে সে ভাল বড়লোক পাত্র (সরকারি চাকুরে হলে আরও ভাল) পায়।

বড় রাস্তার উপরে তাঁর বাড়ির বারান্দায় এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল। তাঁর বাড়ির সামনে, রাস্তার ওপারে বয়স, দারিদ্র আর কাজের চাপে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধা বসেছিলেন। তিনি মাদুর বুনছিলেন। তাঁর মোট তিন নাতি – একজন মেয়ে অন্য দু'জন ছেলে। এক নাতি (বড়টি)ই কেবল বিদ্যালয়ে যায়, অন্য নাতি গরু-মোষ চরায় আর তাদের বোন ঘর গেরস্থালির দেখাশোনা করে এবং কিছু সময় সুশীলাদের বাড়িতে কাজ করে। "*মেয়েদের ইশকুলে পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই। হয় মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, নয় তো বা পেটের ধান্দায় মজুরি করবে*", ঠাকুমা বলেন, "*ছেলেদের অল্প একটু শেখা উচিত, যাতে তাদের চোখ খোলে*" – "*মেত্ খুলাওয়া:*"।

ছোট ভাই গরু চরাতে না গেলে বড় ভাই ও কাজ করতো। না হলে, "*জোম ওকাখোন এআমআ:*" – খাবার আসতো কে.থা থেকে?

খাদ্য যে কি জরুরী বস্তু তা এখানে এসে বোঝা যায়। কেবল ঠাকুমার কাছেই নয়, জনজাতিদের এই ছোট গ্রামের বাকি সব উত্তরদাতার কাছেও। এই কারণে ৬ বছর বয়েসের পরের কোনও শিশুকে তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করান না। তা করলে ওই শিশুরা অঙ্গনওয়াড়িদের কাছ থেকে সামান্য যা খেতে পেত (ছোট এক তাল আটা, বা এক ডাবু খিচুড়ি) তা-ও পাবে না।

৬ বছরের বড় বাচ্চারাও অঙ্গনওয়াড়িতে যাওয়া ছাড়ে না, কারও কারও বয়স ৭-৮ বছর বা আরও বেশি হলেও "*মিত দং ইস্কুলরে ভর্তি লেনখান অঙ্গনবাড়িরে জোম বাং এআমআ:*" – একবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে অঙ্গনওয়াড়ি থেকে আর খাবার দেবে না, ঠাকুমা জানান।

"*হড় হপন কোওয়া আড়ি দুখ্, জাই যুগ রেঁগেচ্*" – সাঁওতালদের দুঃখের কোনও শেষ নেই। খিদে সারাজীবন তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়, ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সুশীলা তাঁর চাওয়াগুলোকে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন, অগ্রাধিকারগুলো ঠিক করতে পেরেছেন। ঠাকুমা ও আরও অনেকের চাহিদার অগ্র-পশ্চাৎ নেই, তাদের কেবল একটিই চাওয়া, ভাত!

খরচের নকশাটা এ-রকম :

২.২.১৪ বই, পেনসিল, স্লেট, জামাকাপড় ইত্যাদির বার্ষিক খরচ

খরচের সীমা	শিশুদের সংখ্যা
২০০ টাকার কম	৫৩ (২৭ শতাংশ)
২০১ - ৩০০ টাকা	৪৪ (২২ শতাংশ)
৩০১ - ৪০০ টাকা	১৯ (১০ শতাংশ)
৪০১ - ৫০০ টাকা	১৮ (৯ শতাংশ)
৫০১ - ৬০০ টাকা	১৪ (৭ শতাংশ)
৬০১ - ৭০০ টাকা	৪ (২ শতাংশ)
৭০১ - ৮০০ টাকা	৭ (৪ শতাংশ)
৮০১ - ৯০০ টাকা	৪ (২ শতাংশ)
৯০১ - ১০০০ টাকা	৪ (২ শতাংশ)
১০০০ টাকার উপরে	১১ (৬ শতাংশ)
বলতে পারেনি	১৮ (৯ শতাংশ)
মোট	১৯৬ (১০০ শতাংশ)

গৃহশিক্ষকতা বাবদ খরচ

বিদ্যালয়-শিক্ষার একটা বড় খরচ প্রাইভেট টিউশন। শিশু পিছু প্রতি মাসে প্রাইভেট টিউশন বাবদ খরচ হয় ২০-৫০ টাকা এবং বছরে প্রাইভেট টিউশন নেবার সময়কাল ৬-১২ মাস পর্যন্ত হয়। সুতরাং শিশু পিছু প্রাইভেট টিউশন বাবদ বছরে ন্যূনতম ১২০ টাকা খরচ হয়। তিনটি পরিবারের খরচের ধরন থেকে শিশু পিছু বিদ্যালয় শিক্ষা বাবদ বার্ষিক খরচের ছকটা আমরা দেখতে পাই। এই তিনটি বাড়ির প্রথমজন এক খেতমজুর, দ্বিতীয়জন একই সঙ্গে কৃষক ও খেতমজুর এবং তৃতীয় জন চাকরিজীবী। উল্লেখিত শিশুরা সবাই প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

১. পুরুলিয়ার এক খেতমজুর

বিদ্যালয় শিক্ষাবাবদ বার্ষিক ব্যয়	
জামাকাপড় বাবদ	১৫০ টাকা

২. বীরভূমের এক কৃষক খেতমজুর

বিদ্যালয় শিক্ষাবাবদ বার্ষিক ব্যয়	
জামাকাপড় বাবদ	২০০ টাকা
স্লেট, পেনসিল, বইপত্র	১০০ টাকা
প্রাইভেট টিউশন	২০০ টাকা (২৫ টাকা করে ৮ মাস)

৩. মেদিনীপুরের এক চাকরিজীবী

বিদ্যালয় শিক্ষাবাবদ বার্ষিক ব্যয়	
জামাকাপড় বাবদ	৬০০ টাকা
বইপত্র, স্লেট, পেনসিল ইত্যাদি	২৫০ টাকা
প্রাইভেট টিউশন	৪৮০ টাকা (৪০ টাকা করে ১২ মাস)

১৯৬টি ঘরের মধ্যে ৮৯টির বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুরা (৪৫.৪০ শতাংশ) প্রাইভেট টিউশন নেয়। গরিষ্ঠসংখ্যক যেখানে এ বাবদ ২০১ টাকা থেকে ৫০০ টাকার ভিতরে খরচ করেন সেখানে কিছু কিছু পরিবার এর বেশি বা কম খরচ করে। বিভিন্ন পরিবারে প্রাইভেট টিউশন বাবদ খরচের হিসেব ভাগ করে দেখানো হল।

২.২.১৫ প্রাইভেট টিউশন বাবদ ব্যয়ের নিরিখে পরিবারের সংখ্যা

খরচ সীমা (টাকায়)	পরিবারের সংখ্যা (এবং শতাংশ)
২০০ টাকার কম	১০ (১১ শতাংশ)
২০১ - ৩০০ টাকা	১৩ (১৫ শতাংশ)
৩০১ - ৪০০ টাকা	৩০ (৩৪ শতাংশ)
৪০১ - ৫০০ টাকা	১৫ (১৭ শতাংশ)
৫০১ - ৬০০ টাকা	৮ (৯ শতাংশ)
৬০১ - ৭০০ টাকা	৮ (৯ শতাংশ)
৭০১ - ৮০০ টাকা	৩ (৩ শতাংশ)
৮০১ - ৯০০ টাকা	২ (২ শতাংশ)
মোট	৮৯ (১০০ শতাংশ)

উৎসাহ-দান পরিকল্পনা

'দুপুরের খাবার' 'ছাত্রীদের জন্য নিখরচায় ইউনিফর্ম' এবং বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে উৎসাহ দান পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। মাতা-পিতা, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, রাজনীতিবিদ মিলিয়ে এক শ্রেণির উত্তরদাতা এই উৎসাহদান পরিকল্পনা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

"*মাসে তিন কিলো করে চাল, তাও আবার অনিয়মিত -- কী এসে যায় এতে?*" প্রশ্ন করেন, বীরভূমের এক বিদ্যালয় পরিদর্শক। "চাল বিলোনোর দিন ঘর ভর্তি হয়ে যায়। পরের দিন যে কে সেই", বলেন মেদিনীপুরের এক শিক্ষক। বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স হয়নি বা খাতায় নাম লেখানো নেই এমন শিশুরাও তাদের "ভাগ" নিতে আসে৷ নিয়মানুসারে যে সব ছাত্ররা ৮০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থেকেছে তাদেরই চাল পাবার কথা। কিন্তু, "*কার বুকের এত পাটা? মা-বাবা'রা লাঠি নিয়ে আসেন ছেলের চাল নিয়ে*

যেতে'', এক প্রধান শিক্ষক এ কথা বলেন।

'দুপুরের খাবার' পরিকল্পনা যদি সঠিকভাবে করা হয় তা হলে ছাত্র হাজিরা বাড়তে পারে বলে বহু শিক্ষক এবং অন্যান্য উত্তরদাতা মনে করেন।

বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ পরিকল্পনায় তফসিলী জাতি/জনজাতি শিক্ষকরা খুশি হলেও অন্য কিছু শিক্ষক মনে করেন এই পরিকল্পনার আওতায় সব শিশু ছাত্রীকেই নিয়ে আসা উচিত। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী সব তফসিলী জাতি/জনজাতি ছাত্রী এবং ২৫ শতাংশ অন্যান্য ছাত্রীকে বছরে একবার এক প্রস্থ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ''অন্যদের থেকে ২৫ শতাংশকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কোনও মাপকাঠি নেই'', বীরভূমের এক প্রধান শিক্ষক বলেন। ''তাছাড়া এতে নিরীহ শিশুদের মধ্যে বর্ণ বিভাজনের চেতনা তৈরি হতে পারে''।

পাঠ্যবই পরিকল্পনাতে সব উত্তরদাতাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ এই বই বিতরণের ব্যবস্থায় খুশি নন। ''এটা জুন মাস, এখনও আমরা বই পাইনি'', বীরভূমের এক প্রধান শিক্ষক বলেন। অন্য শিক্ষকদের অভিযোগ, তাঁদের পুরোনো বই দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে।

২.২.১৬ উৎসাহ দান পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মতামত

পরিকল্পনা	প্রভাব		সমস্যা - উত্তরদাতা শিক্ষকদের সংখ্যা	সমাধান - উত্তরদাতা শিক্ষকদের সংখ্যা
	হ্যাঁ	না		
দুপুরের খাবার	১২	৬	বিতরণ-১৫ অনিয়মিত সরবরাহ-১০	প্রকৃত দুপুরের খাবার-১৪ নিয়মিত বিতরণ-১০ খাদ্যের পরিবর্তে অর্থ-১
বিনামূল্যে পোশাক	১০	৮	যোগ্যতার মাপকাঠি-১০ অনিয়মিত বিতরণ-১	সবাই যোগ্য-১০
বিনামূল্যে পাঠ্যবই	১৮	০	অপ্রতুল সরবরাহ-৯	সরবরাহ সুনিশ্চিত করা-৯

শিক্ষকদের বিরুদ্ধ মনোভাব মা-বাবা'দের মতামত থেকে সমর্থন পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের উত্তরদাতা ১১৮ জন পিতা-মাতাই বলেছেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা চাল পেয়েছে, কিন্তু অনিয়মিতভাবে এবং কখনও ওই বরাদ্দ চাল নিকৃষ্ট মানের ছিল। ১৬ জন কেবল বলেছেন যে তাঁদের কন্যারা ইউনিফর্ম পেয়েছে। ৮৭ জন বলেছেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবই পেয়েছে।

২.২.১৭ উৎসাহদান পরিকল্পনায় যে ক'জন সুবিধা পেয়েছে

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
বরাদ্দ শুষ্ক খাদ্য (দুপুরের খাবার)	১১৮	০
পোশাক	১৬	০
পাঠ্যবই	৮৭	৩৭
মোট উত্তরদাতা	১১৮	৭৮

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য উৎসাহ-বর্ধক পরিকল্পনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পার্থক্য : শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রদের উৎসাহ দিতে কেবল বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হয়। এক সহায়িকা বলেন, "*যত খারাপ ব্যবস্থাই হোক না কেন উৎসাহ-বর্দ্ধক পরিকল্পনা মা-বাবা'র উপর প্রভাব ফেলে।*" শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তা মেলেনা, "*সুতরাং বাচ্চারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়*" বলে তিনি আরও জানান। ১৭ জন সহায়িকার সব ক'জনই বলেছেন যে উৎসাহ-দান পরিকল্পনাকে সার্বজনীন করে তুলতে হবে। "*শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুরা গরিব ঘর থেকে আসে, তাই উৎসাহ তাদের আরও বেশি দরকার*", বলেন এক সহায়িকা।

বর্তমানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুরা কেবল বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পায়। সাক্ষাৎকার দেওয়া ৭৮ জন মাতাপিতার মাত্র ৩৭ জন জানিয়েছেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়ার বই পেয়েছে। বাকিরা পুরোনো বই দিয়ে চালাচ্ছে। কিছু ছাত্রকে বই ভাগাভাগি করে পড়তে দেখা গেছে।

২.৩ বিদ্যালয়-শিক্ষার মান

উপস্থিতি

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ঘুরে আমরা আমাদের পরিদর্শনের সময় ছাত্র উপস্থিতির হিসেব নিয়েছিলাম। তাতে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ছিল গড়ে ৫০.৯৯ শতাংশ এবং ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে গড়-উপস্থিতি ছিল ৬৩.৫৬ শতাংশ।

২.৩.১ পরিদর্শনের দিনগুলিতে উপস্থিতি

	ভর্তি সংখ্যা	পরিদর্শনের দিনগুলিতে উপস্থিতির হার (শতাংশে)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,০৫৯ জন	১,০৫০ জন (৫০.৯৯)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৮৯২ জন	৫৬৭ জন (৬৩.৫৬)

আমাদের সমীক্ষার জন্য সমীক্ষাকৃত পরিবারে ঘোরার সময় আমরা দেখেছি ১১৮ জন উত্তরদাতার ২০.৩৩ শতাংশ জানিয়েছেন সেই নির্দিষ্ট সপ্তাহে পরিবার থেকে বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি। ২৩ জন (১৯.৪৯ শতাংশ) ১-৩ দিনের জন্য বিদ্যালয়ে গিয়েছে বাকি ৭১ জন (৬০.১৬ শতাংশ) ৪-৬ দিনের জন্য উপস্থিত ছিল।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি এরকম : ৭৮ জনের মধ্যে ১১ জন (১৪.১০ শতাংশ) ওই সপ্তাহে বিদ্যালয়ে যায়নি, ২৩ জন (২৯.৪৮ শতাংশ) ১-৩ দিনের জন্য গেছে এবং ৪৯ জন (৫৬.৪১ শতাংশ) ৪-৬ দিনের জন্য উপস্থিত ছিল।

২.৩.২ আমাদের পরিদর্শনের আগের সপ্তাহে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি

উপস্থিতির দিন সংখ্যা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১-৩ দিন	২৩ (১৯.৪৯)	২৩ (২৯.৪৮)
৪-৬ দিন	৭১ (৬০.১৬)	৪৪ (৫৬.৪১)
অনুপস্থিত	২৪ (২০.৩৩)	১১ (১৪.৪০)
মোট উত্তরদাতা মাতা-পিতা	১১৮ (১০০)	৭৮ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

৯ জন উত্তরদাতা বলতে পারেননি সাক্ষাৎকারের আগের সপ্তাহে তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল কি না। এবং আমরা যখন অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাই উত্তরদাতাদের মাত্র ৮৩ জন স্পষ্টভাবে কারণ জানাতে পারেন। ২.৩.৩ সারণীতে তাঁদের উত্তরগুলো পাওয়া যাচ্ছে। মা-বাবা'রা এটাও জানান যে ছেলেমেয়েরা যখন বিদ্যালয়ে থাকেনা তখন তারা অনেক ধরনের কাজ করে, যদিও এর জন্য তাদের সবসময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয় না। বাচ্চাদের কাজগুলো নিম্নপ্রকার :

২.৩.৩ মাতা-পিতা বিবৃত অনুপস্থিতির কারণ

ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করা	৯ (১০.৮৪)
ঘরের অন্য কাজ	১২ (১৪.৪৫)
বাবা-মা'কে চাষের কাজে সাহায্য	৫ (৬.০২)
আত্মীয় বাড়ি যাওয়া	১১ (১৩.২৫)
যা পড়ানো হয় তাতে অনাগ্রহ	৪ (৪.৮১)
বিদ্যালয়ের বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশ	৩ (৩.৬১)
বাড়ির লোকদের রোগ/অসুখ	১৫ (১৮.০৭)
বাজে আবহাওয়া	১ (১.২০)
গরুমোষ চরানো	৮ (৯.৬৩)
খেতে কাজ	৬ (৭.২২)
শিক্ষকের অনুপস্থিতি	৬ (৭.২২)
অন্যান্য	১ (১.২০)

কোনো সঠিক কারণ নেই	২ (২.৪০)
মোট উত্তরদাতা	৮৩

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। সংখ্যারা পরস্পর সম্পর্কিত হতেও পারে)

২.৩.৪ বাচ্চারা অন্য যে সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত

ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করা	১৯ (২২.৮৯ শতাংশ)
ঘরের অন্য কাজ করা	৫৩ (৬৩.৮৫ শতাংশ)
মা-বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করা	১৩ (১৫.৬৬ শতাংশ)
মা-বাবাকে উপার্জনে সাহায্য করা	৯ (১০.৮৪ শতাংশ)
শ্রমিক	১ (১.২০ শতাংশ)
গরু-মোষ চরানো	১৩ (১৫.৬৬ শতাংশ)
মোট উত্তরদাতা	৮৩ (১০০ শতাংশ)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। সংখ্যারা পরস্পর সম্পর্কিত হতেও পারে)

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি যে একটা সর্বক্ষণের সমস্যা এটা সুনিশ্চিত। "*এখন ইস্কুলে আপনারা কিছু বাচ্চাকে দেখতে পারছেন। চাষের মরসুমে এলে তফসিলী জাতি এবং আদিবাসী বাড়ির বাচ্চাদের কারওকেই পেতেন না*", স্কুলে এক প্রাথমিক শিক্ষক জানান। "*মা-বাবা'রা বাইরে কাজে গেলে ওরা সবাই ঘর সামলানোর কিছু কিছু দায়িত্ব নেয়*"। তিনি আরও বলেন, "*ওরা যেহেতু নানা ধরণের কাজ -- ঘরের কাজ, বাইরে রোজগারের কাজ, এই দুই ধরনের কাজই করে থাকে, তাই অবরে সবরে ইশকুলে যায়। যেমন ধরুন ১০ বছরের বাচ্চা মেয়ে গোবর কুড়িয়ে বিক্রি করে।*"

খেড়িয়া শবর প্রধান একটি গ্রামে আমাদের পরিদর্শনের দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল ২১ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৮ জন। "মা-বাবা বেরাঁয় যায়। কী কইরবে, ভোখের জ্বালা বড় জ্বালা", বল্লেন কৃষ্ণ শবর।

সাক্ষাৎকার নেওয়া ১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫ জন বলেছিলেন, তফসিলী জাতি এবং জনজাতি বাড়ির ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি কম হয়। ৫ জন বলেছিলেন সব গরিব বাড়ির বাচ্চারাই অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে হাজিরা দেয়। ৮ জন শিক্ষক এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াটাই পছন্দ করেন। যাঁরা উত্তর দেন তাঁরা মনে করেন গরিব পরিবারের বাচ্চারা পরিবারের আর্থিক দুর্দশার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হতে বাধ্য হয়।

উপস্থিতির ব্যাপারে তফসিলী জাতি/আদিবাসী এবং অন্যান্য জাতির ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুলনা করতে বললে ১২ জন জানান সাধারণ জাতির ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। তফসিলী জাতি ও আদিবাসী ঘরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে কেউ কিছু বললেন না।

বিশেষ করে পুরুলিয়া এবং বীরভূম জেলার বহু মা-বাবা শিক্ষকদের এই অভিমতের সঙ্গে একমত। ধেনু শবর বলেন — "বাচ্চারা আমাদের সঙ্গে বর্ধমানে খেতমজুরি করতে যায়। এলাকায় আমাদের বেশি মজুরির কাজ নেই, তাই বাইরে যাই। বাচ্চারা কী করবে?

ওরাও আমাদের সঙ্গে যায়।"

বীরভূমের গ্রামের এক সাঁওতাল মহিলা জানালেন যে, তিনি আর তাঁর স্বামী যখন মজুরির কাজে যান তখন তাঁর মেয়ে আরও ছোটগুলোর দেখাশোনা করে। "গরু মোষ কে চরাবে? আমার হাত খালি থাকলে আমিই চরাই। না হলে আমার ছেলে (দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র)কে গরু চরাতে হয়।"

আর্থিক বাধ্যতা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির প্রধান কারণ হলেও, বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার অন্য কারণও আছে।

বীরভূমের ছাতিনা গ্রামের এক বাচ্চাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইশকুলে যাও না কেন?"

"আমি ইশকুলে যাইনা। মাস্টার দিকু (অ-আদিবাসী) বাচ্চাদের থেকে আলাদা করে আমাদের বসায়। "আর আডি কিন দালআ:" — আর দু'জন শিক্ষকই খুব মারেন।

খুদিটাঁড় গ্রামের শবর বাচ্চারা বিদ্যালয়ে যেতে চায়না, কেননা, শিক্ষক অন্য জাতের লোক এবং ওদের ঘেন্না করেন। শিক্ষক তাঁর এই মনোভাবকে স্বীকার করেন। বলেন যে, "শবর বাচ্চারা মরা জন্তুর পচা মাংস খায়, সাপ ব্যাঙ কি না খায়।"

বীরভূমের আর এক গ্রামের বাচ্চারা অভিযোগ করে যে শিক্ষক ঘুমিয়ে থাকেন আর তাঁর পাকা চুল বেছে দিতে বলেন। কেউ কেউ মারের ভয়ে তা করে, আবার তফসিলী জাতি, জনজাতি বহু বাচ্চা পড়া বুঝতে পারেনা। "চেদ কোচঁ অডং বডং লেয়আ:" (শিক্ষক কি সব আবোল তাবোল পড়ান বুঝতে পারি না)। অন্ততপক্ষে তিনজন শিক্ষক জানিয়েছেন যে ভাষার সমস্যা ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বড় ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। এই দিকটা নিয়ে আমরা পরের উপ-অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

লিঙ্গভেদ

ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে তুলনা করতে অনুরোধ করলে ৮ জন শিক্ষক আমাদের বলেন, মেয়েরা বেশি নিয়মিত, ৫ জন বলেন, ছেলেরা এবং ৫ জন বলেন নিয়মিত উপস্থিতির ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের কোনও তফাৎ নেই। অনেক মা-বাবা'ই প্রথম অভিমতের সমর্থক।

সূচপুর গ্রামের এক উত্তরদাতা জানালেন, "*আমার ছেলেটা ইশকুল যেতে চায় না, পালিয়ে যায়, খেলে বেড়ায়। কিন্তু মেয়েটার কোনওদিন ইশকুল কামাই হয় না। ইশকুল যাওয়ার আগে খাবার রান্না হয়ে গেল কি না ও তা নিয়েও মাথা ঘামায় না*"। "*আমার মেয়ে ইশকুল কামাই করতে চায় না, কিন্তু জানেন, মাঝে মাঝে আমরাই ওকে যেতে দিইনা। ছোটদের দেখাশোনা করতে ঘরে থাকতে বাধ্য করি। সাধারণত চাষের মরসুমেই সেটা হয়*", মেদিনীপুরের এক গ্রামের খেতমজুর এ কথা জানান।

আমাদের পরিদর্শনের আগের সপ্তাহে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৪-৬ দিন উপস্থিত থাকা ছেলেমেয়েদের হিসাব (নির্বাচিত পরিবারগুলির)।

২.৩.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছেলে ও মেয়েদের সাপ্তাহিক উপস্থিতি

আমাদের পরিদর্শনের আগের সপ্তাহে উপস্থিতির দিনসংখ্যা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৪ দিনের বেশি	৭১ (ভর্তির ৬০ শতাংশ)	৪৪ (ভর্তির ৫৬ শতাংশ)
ছেলে	৩৬	২০
মেয়ে	৩৫	২৪

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতি

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে দুই কারণে ভাল। প্রথমত, বিদ্যালয়ের সময় বাচ্চাদের, বিশেষ করে শ্রমজীবি বাড়ির শিশুদের পক্ষে উপযোগী। বেশিরভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সকালে ২-৩ ঘন্টার জন্য চলে, কিছু কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বসে বিকেল বেলায়। বিকেলে মা-বাবা'রা চাষের কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে বাচ্চারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে। ডেমুরতলা গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সবসময় সকালেই বসে। ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে এলে মা-বাবা'রা, বিশেষ করে মায়েরা, জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ, পাতা এবং অন্যান্য বনজ সামগ্রী সংগ্রহ করতে যান এবং সন্ধে নাগাদ ঘরে ফিরে আসেন। অনেক বাচ্চা মেয়েও জঙ্গলে গিয়ে তাদের মা-বোনেদের সঙ্গে কাজগুলো করে দেয়। উত্তরদাতারা এর মুখ্য কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আসে। ডেমুরতলার এক উত্তরদাতা জানালেন, "ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা, পড়া পড়তে না চাওয়া বাচ্চাগুলোও সহায়িকাদের নজরের আড়াল হতে পারে না"।

প্রকৃত শিক্ষাদান :

<u>পড়ানোর সময় এবং গুণগত মান</u>

"*দিনে দু ঘন্টা পঢ়েইনে ভি ঢের হিতা, সেটি কো ভি করেনটেন কাঁই।*" দিনে কেবল দু ঘন্টা পড়নোই যথেষ্ট, তবু এটুকুও ওঁরা করে না – হতাশায় কণ্ঠরুদ্ধ তিক্তবিরক্ত মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামবাসী। "উয়াদের সময় আছে? উয়ারা পঞ্চায়েতি কইরবেক না পঢ়াবেক?" এক উত্তরদাতার গলায় বিদ্রুপের ঝাঁঝ।

"*হ্যাঁ, আমাকে পঞ্চায়েতের কাজে অনেকটা সময় দিতে হয়*", মেদিনীপুরের এক প্রাথমিক শিক্ষক স্বীকার করেন। উনি পঞ্চায়েত সমিতিরও সদস্য। "*আমাকে মাসে অন্তত ৪ দিন ব্লক-এ যেতে হয়, আর সে ক'দিন আমাকে স্কুল কামাই করতেই হয়।*"

কেবল এই শিক্ষক নন, আরও বহুজন আছেন যাঁদের শিক্ষকতা বহির্ভূত দায়িত্বের জন্য বিদ্যালয় কামাই করতেই হয়। পঞ্চায়েতের সদস্য নন বা শিক্ষকতা বহির্ভূত দায়িত্ব পালনের দরকার যাঁদের নেই তাঁরাও গ্রামবাসীদের এই সমালোচনার বাইরে নন।

এই সমীক্ষার সময় আমরা এমন শিক্ষক দেখেছি যাঁরা বিদ্যালয়ে অন্তত এক ঘন্টা

দেরি করে আসেন। অন্তত ৫টি বিদ্যালয়ে আমরা কিছু শিক্ষককে দেখেছি নির্ধারিত ছুটির সময়ের এক ঘন্টা আগে বিদ্যালয় থেকে চলে যেতে।

জুন মাসের সকাল সাড়ে সাতটা। আমরা এক বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে আছি। এক শিক্ষক এসে দেরির জন্য ক্ষমা চাইলেন। "বুঝতেই তো পারছেন, দূর থেকে আসি"।

"*আপনার জায়গা থেকে প্রথম বাস ছাড়ে কখন?*" আমরা জিজ্ঞেস করি। উত্তর এল, "*সকাল ৬.৩০টায়*"।

আধ ঘন্টা পরে আমরা সেই শিক্ষককেই স্কুলের চলার সময় জানতে চাই। "*এখন চলে সকাল ৬.৩০টা থেকে ১১টা। এখন এটা মর্নিং স্কুল। দিনে স্কুল চললে সময় হবে* ১০.৩০-৩.৩০", শিক্ষকটি জানালেন। অর্থাৎ স্কুল শুরুর সময় তাঁর বাস ছাড়ে আর তিনি স্কুলে পৌঁছান পুরো এক ঘন্টা দেরিতে! এ রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিক্ষক শনিবারে ক্লাস না নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান, এ রকম ঘটনাও এর মধ্যে আছে। সোমবার বিকেলে তিনি এসে পৌঁছোন, আবার ক্লাস কামাই হয়।

বিদ্যালয়ের সময় : বিবৃতির গোলমাল

শিক্ষকদের কথা অনুযায়ী গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় চলার সময় সকাল ৬.৩০-১১টা এবং অন্য ঋতুতে সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৩.৩০। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের ১১৮ জন মাতা-পিতা'র ১০০ জনই এ ব্যাপারে শিক্ষকদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। হয়তো মা-বাবা'রা সঠিক তথ্য জানেন না, কিন্তু সে ধরনের মা-বাবা'র সংখ্যা থেকে বোঝা যায় শিক্ষা দানের প্রকৃত সময় এবং ধার্য সময়ের মধ্যে একটা ফাঁক আছে।

শিক্ষক কি সারাক্ষণ ছিলেন? ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর

প্রশ্নটা যে সাবধানে উত্তর দেওয়ার মতো শিশুরা তা বুঝেছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী এর জবাব দেয়। এর মধ্যে ২৫ জন বলে হ্যাঁ, ১০ জন বলে শিক্ষক সব সময় উপস্থিত ছিলেন না (এবং শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ওরা খেলে বেড়ায়) এবং ৬ জন বলে শিক্ষক বিদ্যালয়ে আদৌ আসেননি।

বীরভূম জেলার একটি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বলে আমাদের সমীক্ষার একদিন আগে শিক্ষক এসেছিলেন এবং বিদ্যালয়ে গ্রামের হরিনাম সংকীর্তন চলবে বলে ছুটি ঘোষণা করেন।

আমাদের সমীক্ষার দিন বা তার আগে বিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয় পড়ানো হয়েছে জানতে চাওয়া হলে তারা বলে কোনও কিছুই পড়ানো হয়নি।

২.৩.৬ গবেষকদের পরিদর্শনের দিন বা তার আগে কী কী বিষয় পড়ানো হয় : প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর

কিছু পড়ানো হয়নি	২৪ (৪১.৩৭)
বাংলা	৩০ (৫১.৭২)
অঙ্ক	২৪ (৪১.৩৭)

ইংরিজি ইতিহাস	৬ (১০.৩৪) ৪ (৬.৮৯)
মোট উত্তরদাতা	৫৮ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

গ্রামের সামাজিক গঠন এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি

গ্রামগুলির জনগোষ্ঠীগত চরিত্রের সঙ্গে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির একটি দিক জড়িয়ে আছে। মেদিনীপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান ব্লক অফিসের কাছে এবং ওখানে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা সবাই শিক্ষিত ও বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের। এঁরা অনেকেই চাকরি-বাকরি করেন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত আছেন। এই গ্রামে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হার তুলনায় কম। এর বিপরীত ছবিটা পুরুলিয়ার এক গ্রামে দেখা যাবে। এই গ্রাম নিম্ন বর্ণের হিন্দু (তফসিলী জাতি এবং মাহাতো) -প্রধান। শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন বেলা বারোটায় এবং বিদ্যালয় থেকে চলে যান বেলা দু'টোয়।

জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিরও একই কাহিনী। আমাদের ১৮টি সমীক্ষা-গ্রামের মধ্যে শিক্ষক অনুপস্থিতির হার সব চেয়ে বেশি ছিল একটি মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামে এবং ৮টি তফসিলী জাতি/জনজাতি-প্রধান গ্রামে। "উনকু মনমৌজি হিজুখান হিজুআ: বাংখান দো বাং, ওকোয় এেএলেআ:?" ওদের মনমর্জি, ওরা আসতে চাইলে আসবে, না আসলে আসবেনা। কে দেখবে? প্রশ্ন করেন এক সাঁওতাল উত্তরদাতা।

<u>শিশু শিক্ষা কেন্দ্র</u> : শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সহায়িকাদের সম্পর্কে মানুষের মনে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের থেকে বিপরীত ভাব দেখা গেছে।

পুরুলিয়ার দুটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে ব্যতিক্রম ধরলে (এর মধ্যে একটি প্রায় বন্ধ) উত্তরদাতারা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের পড়তে নিয়ে আসার জন্য সহায়িকাদের প্রচেষ্টার প্রচুর প্রশংসা করেন। "ওঁরা খুব খাটেন", গ্রামের মানুষের সহায়িকাদের সম্পর্কে এই প্রশংসার বাক্য শোনা গেছে। পড়ানোর জন্য সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে সহায়িকাদের সম্পর্কে আমরা কোনও অভিযোগ শুনিনি। "ওঁরা বসে বসে সময় কাটান না। বাচ্চাদের পড়াতে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন", এ জাতীয় কথা আমরা অনেক জায়গাতেই শুনেছি।

কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমরা দেখেছি আমাদের পরিদর্শনের দিন বা তার আগে কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা আদৌ কিছু শেখান নি।

<u>পাঠদানের গুণগত মান</u>

পুরুলিয়ার এক উত্তরদাতা এক শিক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "আমরা, গ্রামবাসীরা ওনাকে সকাল ১০.৩০ ইশকুলে এসে বেলা ৩.৩০ অবধি থাকতে বাধ্য করি।" "উনি ইশকুলে ঘুমোতেন, বাচ্চাদের দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতেন আর কাগজ পড়তেন। নিজের

কাজ না করে সময় কাটানো কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায়?" প্রশ্ন করতে গিয়ে তাঁর গলায় বিদ্রূপ ফুটে বেরোলো।

মেদিনীপুর জেলার এক পঞ্চায়েত সদস্যর অভিযোগ : "ওঁরা কেবল বাবু বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করেন।" একই অভিমত অন্য আরো অনেক উত্তরদাতার। ১১৮ জন উত্তরদাতার ২৮ জন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

"আপনার ছেলে কেমন পড়ছে?" পুরুলিয়ার এক চাষীকে আমরা জিজ্ঞেস করি। তাঁর উত্তর, "*কেমন আর পইঢ়বে? ঝিঙ্গাকুড়ার ব্যাটা কালিদাস। হামি লিখা পড়হা জানলে উয়াকে শিখাইতাম, ইশকুলে কি লিখা পড়হা হয় হে? যার পইসা আছে সে পঢ়াবেক, পিছনে মাস্টার দিবেক, পেরাইভেট হে পেরাইভেট।*" উত্তরদাতাদের একটা ভালো অনুপাত শিক্ষকদের কাজের ভালোমন্দ নিয়ে হয়, কোনও কথা বলতে চাননি, নতুবা কথা বলতে অপারগ ছিলেন। উত্তরদাতাদের ৪৮ জন শিক্ষকদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় এ রকম ৭৮ জন উত্তরদাতার মাত্র ৭ জন সহায়িকাদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, ৪২ জন দ্ব্যর্থহীনভাবে খুশি, ২৯ জন কিছু বলতে পারেননি।

উত্তর না দেওয়াতে অবাক হবার কিছু নেই। যেহেতু মা-বাবা'দের একটা বড় সংখ্যা শিক্ষকদের কাজ বিচারের জায়গায় নেই। "আমরা সকালে বার হই, সন্ধেয় ফিরি। শিক্ষকরা কেমন কাজ করেন তা দেখার সময় আমরা পাই কখন?" এক খেতমজুর উত্তরদাতা এ কথা জানান।

২.৩.৭ শিক্ষকদের কাজের ভালোমন্দ সম্পর্কে মাতাপিতার অভিমত

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
সন্তুষ্ট	৪৮ (৪০.৬৭)	৪২ (৫৩.৮৪)
অসন্তুষ্ট	২৮ (২৩.৭২)	৭ (৮.৯৭)
জানি না/বলতে পারি না	৪২ (৩৫.৫৯)	২৯ (৩৭.১৭)
মোট উত্তরদাতা	১১৮ (১০০)	৭৮ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েরা কি রকম লেখাপড়া শিখছে এ প্রশ্নের জবাবে ২৮ জন যেখানে স্পষ্টভাবে তাঁদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন, সেখানে ৪২ জন কিছু বলতে পারেননি বা জানেন না। ১১৮ জনের মধ্যে মাত্র ৪৮ জন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় খুশি।

কিছু উত্তরদাতা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার এই হালে দৃশ্যতই বিচলিত, কিন্তু তাঁরা এই দুর্ভাগ্যের জন্য নিয়তিকে দায়ী করেন।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ৭৮ জন উত্তরদাতার ৩৭ জনই তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় খুশি। ১৩ জন অখুশি আর বাকি আরও ২৮ জন কিছু বলতে পারেন না বা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে কিছু জানেন না।

২.৩.৮ শিশুদের লেখাপড়ার উন্নতি

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
সন্তুষ্ট	৪৮ (৪০.৬৭)	৩৭ (৪৭.৪৩)
অসন্তুষ্ট	৩৫ (২৯.৬৬)	১৩ (১৬.৬৬)
জানি না/বলতে পারি না	৩৫ (২৯.৬৬)	২৮ (৩৫.৮৯)
মোট উত্তরদাতা	১১৮ (১০০)	৭৮ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

পড়ানোর গুণমান সম্পর্কে লোকেদের হতাশা এতটাই বেশি যে উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে শিশুদের একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম মানে পৌঁছে দিতে হলে বাড়তি সাহায্য করতে হবে (প্রধানত প্রাইভেট টিউটরের মাধ্যমে)। "প্রাইভেট না দিলে লেখাপড়া হবে না" — সব গ্রামেই আমরা এ কথা বলতে শুনেছি। প্রাইভেট টিউশনের রমরমা এতটাই যে প্রাইভেট টিউশন অর্থে ইংরেজি 'Private' শব্দটি, এখন সাধারণ মানুষের কথ্য শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় সব বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষকরা স্বীকার করেছেন যে শিক্ষার গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। এর কারণ হিসেবে তাঁরা সরকারকে দায়ী করেন পরিকাঠামো বা ক্লাসঘরের অভাবের জন্য, আর মা-বাবা'দের দায়ী করেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে নজর না দেওয়ার জন্য। একজন শিক্ষকের কথায়, "ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পড়ে না। যা পড়ার তা স্কুলে পড়ে"। "আমাদের ১০০ জনকে পড়াতে হয়, এবং আমরা দু'জন মাত্র এই কাজ করি। কী আশা করেন আপনারা? আমাদের কাজটা মেষপালকের কাজ হয়ে গেছে", আর একজন শিক্ষকের মন্তব্য। "একটা ক্লাসঘরে আমাদের চারটে ক্লাস নিতে হয়। পড়ানোর কী গুণমান আশা করেন আপনারা? আমি যখন প্রথম শ্রেণির ছেলেদের পড়াই, অন্যরা কানে তালা-ধরানো শোরগোল করে। কার বাপের সাধ্য পড়ায়?"

শিক্ষাবহির্ভূত কাজে শিক্ষকের জড়িত থাকা

আপনার মতে, "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো কী?" পুরুলিয়ার এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উত্তর দিতে দেরি হল না। "মাস্টাররা পড়ায়নি" — শিক্ষকরা পড়ান না। আমাদের মনোনীত পরিবারগুলি এবং অন্য গ্রামবাসীদের বেশির ভাগেরই এই অভিমত।

বেশির ভাগ উত্তরদাতা যেখানে মনে করেন যে শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতেই বেশি

জড়িয়ে আছেন, অল্প কিছু রাজনীতিক (সিপিআই(এম) সহ) নির্দ্বিধায় বলেন, যে সব শিক্ষকরা রাজনীতিতে সক্রিয় এবং আন্তরিক তাঁরা পড়ানোর ব্যাপারেও সমপরিমাণ আন্তরিক হন। তা সত্ত্বেও তাঁরা স্বীকার করেন যে এ রকম আন্তরিক শিক্ষকের সংখ্যা যৎসামান্য। মিথ্যাচার ব্যাপারটাও কিছু কিছু শিক্ষক-রাজনীতিকদের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে চালু যে তাঁরা একই সঙ্গে একাধিক জায়গা থেকে বেতন নিতেও দ্বিধাবোধ করেন না বলে অভিযোগ। এমন কি একজন বিধায়কের কথাও শোনা গেল যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর বেতন নেন আবার রাজ্য বিধানসভা থেকেও বেতন নেন। "তাঁরা যে দুই জায়গাতেই হাজিরা দেখান তা বার করা কঠিন নয়। হাজিরা খাতাটা একবার মিলিয়ে দেখুন।" এ কথা একজন রাজনৈতিক কর্মীর। "ওরা তো বিধানসভাকে বোকা বানাতে পারে না, তাই নিরীহ শিশুদের ঠকায়", এক আঞ্চলিক সম্পাদকের এই কথা। আমাদের মনোনীত কিছু উত্তরদাতার মতে, শিক্ষকদের কাছে সব চাইতে নিচে জায়গা পায় শিক্ষকতা। তাঁরা প্রথমে তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করেন এবং তরপর অল্প কিছু সময়ের জন্য পড়াতে আসেন।

<u>মাস্টারমশাই থেকে মাস্টার</u>

বীরভূম জেলার বোলপুর সার্কেলের ৪০০ শিক্ষকের এক সমাবেশে, ২০০১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর (শিক্ষক দিবস উপলক্ষে, দিনটি যদিও ৫ই সেপ্টেম্বর পড়ে, কিন্তু কোনও কারণে সেই দিনের স্মরণ সমাবেশ ১৩ই সেপ্টেম্বর করা হয়), এক প্রাথমিক শিক্ষক রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়।[৪১] শিক্ষকদের আক্রমণ করে কিছু রাজনীতিকের দেওয়া বিবৃতির ক্রুদ্ধ প্রতিবাদী এই কবিতা শুনে সমবেত শিক্ষকরা হাততালিতে ফেটে পড়েন। "আমরা আহতবোধ করেছি", শিক্ষকদের মোটামুটি সকলের মনের ভাবটা এ-রকম ছিল। ১৮টি নির্বাচিত গ্রাম ছাড়াও তিনটি জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। বিগত দশক বা তারও বেশি সময় ধরে তাঁরা যে শিক্ষকের মর্যাদা হারিয়েছেন, কমবেশি সব শিক্ষকই এরকম মনে করেন। "মাস্টার মশাই না, আমরা এখন মাস্টার।"

সাধারণভাবে শিক্ষকরা সরকারকে এর জন্য দায়ী করেন।

* ভর্তি বেড়েছে, কিন্তু পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হয়নি।
* ক্লাসঘর যথেষ্ট সংখ্যায় নেই
* শিক্ষকরা বাচ্চাদের খেলাধুলা করানোর বন্দোবস্ত করতে পারে এ-রকম কোনও খেলার মাঠ নেই
* কোনও কোনও ক্ষেত্রে একজন মাত্র শিক্ষককে পুরো বিদ্যালয়ের দেখাশোনা করতে হয়। অথচ এমন কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বহাল আছেন।
* শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। "আদম শুমারির সময় আমরা স্কুলের দেখাশোনা করতে পারিনা। আমরা তখন তথ্য যোগাড়ে ব্যস্ত থাকি।" একই অবস্থা নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা তৈরি করা বা নির্বাচনের ব্যস্ততা নিয়েও।
* কিছু শিক্ষক, রাজনৈতিক দলদের ভোট পাওয়ার জন্য তাঁদের ব্যবহার করা এবং ক্ষমতায় এলে তাঁদের ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনার দোষারোপ করেন।

শিক্ষকের কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নানা কাজের দীর্ঘ তালিকা। বিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কিত দায়িত্বসমূহ। শিক্ষক সংগঠনের সম্মেলন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাজে জড়িত দায়িত্ব, ইত্যাদি তাঁদের সময় নিয়ে নেয় বলে শিক্ষকরা বলেন। ৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেখানে দাবি করলেন যে আমাদের পরিদর্শনের আগের এক মাস তাঁরা কোনো শিক্ষা-বহির্ভূত দায়িত্ব নেননি, সেখানে ১৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বীকার করলেন উক্ত সময়ে শিক্ষা-বহির্ভূত দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা বিদ্যালয়ে ১-৭ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিলেন।

চারজন অনুপস্থিত ছিলেন ১ দিনের জন্য, ৩ জন ২ দিনের জন্য, ২ জন ৬ দিনের জন্য এবং ১ জন ৭ দিনের জন্য। ৮ জন অনুপস্থিত ছিলেন অফিস প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে, ২ জন শিক্ষক সংগঠনের একটি সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে, ৭ জন নির্বাচন-সংক্রান্ত ডিউটিতে ব্যস্ত ছিলেন এবং ১ জন পঞ্চায়েত সম্পর্কিত কাজে (এগুলি সবই নথিবদ্ধ অনুপস্থিতি, আগে নাম সই-এর খাতা দেখে নিয়ে পরে শিক্ষকেরা উত্তর দিয়েছিলেন)।

এ-ধরনের প্রশাসনকে জানানো ছুটি ছাড়াও, কিছু শিক্ষক অন্তত, রাজনৈতিক কাজের জন্য বা ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের কাজেও লিপ্ত হন। উল্লিখিত আঞ্চলিক সম্পাদকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমাদের এক প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয় যিনি ওই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে সকালে তিনি এক ঘন্টার জন্য বিদ্যালয়ে যান, খাতায় সই করেন এবং তারপর রাস্তা মেরামতির একটি কাজের ঠিকা অনুমোদন করতে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে আসেন।

আমাদের পরিদর্শনের দিনগুলিতে আমরা বিদ্যালয়ের ৪৬ জন শিক্ষকের ১৬ জনকে (১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা) অনুপস্থিত দেখি। তাঁদের না আসার কারণ, সহকর্মীদের উত্তর অনুযায়ী, শরীর খারাপ কিংবা ক্যাজুয়াল লিভ নেওয়া।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা

আমাদের সমীক্ষাকৃত বিদ্যালয়গুলির ৩২ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৫ জন স্বীকার করেন যে তাঁদের অন্য একটি উপজীবিকা (কারও ক্ষেত্রে প্রাথমিক) আছে। ১৮ জন চাষবাস করেন, ৫ জন ব্যবসা এবং ২ জনের প্রাইভেট টিউশন। ১৮ জন দলীয় রাজনীতি করেন, বা কিছুকাল করেছেন।

শিক্ষিকা (সংখ্যায় ১৪)দের পড়ানো এবং ঘরের কাজ ছাড়া কোনো কাজ নেই। মা-বাবা'রা মোটামুটিভাবে সবাই শিক্ষিকাদের বেশি পছন্দ করেন।

পঞ্চায়েত এবং শিক্ষক

সমীক্ষাকৃত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মধ্যে ৪ জন পঞ্চায়েতে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত এবং অন্ততপক্ষে ১০ জনের দেখা পেয়েছি যাঁরা কোনও না কোনও সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এক আঞ্চলিক সম্পাদক এবং অন্য কয়েকজন উত্তরদাতা জানালেন যে পঞ্চায়েতে শিক্ষকদের সংখ্যা কমেছে। বামফ্রন্টের এক প্রাক্তন

মন্ত্রী-সহ অন্য কয়েকজন এই মতের বিরোধিতা করেন। "ক'টা লিবেন" (পঞ্চায়েতের শিক্ষক সদস্য ক'জন চান, এই অর্থে)।

আমরা ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারি ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন প্রাথমিক শিক্ষক আছেন।

২.৩.৯ ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	মোট
মোট সদস্য	৭৪ (১০০)	৪১ (১০০)	১২৫ (১০০)
তফসিলী জাতি	১৩ (১৭.৫৭)	১০ (২৪.৩৯)	২৩ (১৮.৪০)
তফসিলী জনজাতি	৬ (৮.১১)	১১ (২৬.৮৩)	১৭ (১৩.৬০)
অন্যান্য	৫৫ (৭৪.৩২)	২০ (৪৮.৭৮)	৮৫ (৬৮.০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

"আপনি যে ট্রেনিং পেয়েছেন তা কি কাজে লাগান?"

"এরকমটা আমরা খুব কমই করতে পারি। আপনি কি সত্যি সত্যিই মনে করেন ওই সব বড় বড় কথা কাজে করে দেখানোর সুযোগ এ সব স্কুলে আছে – যেখানে আমরা ক্লাসঘর, শিক্ষক এবং লেখাপড়ার সরঞ্জামের অভাবে ভুগি? আমাদের কোনও খেলার মাঠ নেই। পড়াবার সাজসরঞ্জাম নেই -- এমন কি ম্যাপ বা চার্ট পর্যন্ত নেই। ওই ট্রেনিং আমরা আমাদের ক্লাসঘরে কী করে নিয়ে যাবো? বড় বড় কথা বলা সোজা কাজে করা কঠিন" — বীরভূমের এক শিক্ষকের এই জবাব।

১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার থেকে এটা পরিষ্কার যে শিক্ষকরা শিক্ষাদানের সাবেকি পদ্ধতিগুলোই পছন্দ করেন বা, মেনে চলেন -- তা তাঁরা ট্রেনিং পান আর না-ই পান।

শিক্ষাদানের পদ্ধতির ছকটা এরকম :

২.৩.১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি : শিক্ষকদের মতামত

ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা এবং পাঠ্যবই পড়ে শোনানো (অন্য পদ্ধতি সহ)	১৮
লিখিত ক্লাসের কাজ বা বাড়ির কাজ	৮
মুখস্ত করা	৭
খেলাধুলা	৭
ভালো জানে এমন ছাত্রকে দিয়ে অন্যদের বোঝানো	৫
ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা এবং বই পড়ে শোনানোই খালি	৪

(সংখ্যাগুলি পরস্পরের সম্পর্কিত হতেও পারে)

শিশুরা যদিও স্বীকার করতে রাজি নয় যে তাঁরা (শিক্ষকরা) তাদের খেলাধুলার বন্দোবস্ত করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ১০৫ জন শিশু আমাদের কথার উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে ১৬ জন বলেছে শিক্ষকরা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন, ৩৬ জন বলেছে শিক্ষকরা পাঠ্যবই থেকে পড়ে শোনান, ৩৫ জন বলেছে শিক্ষকরা ঘরে/বিদ্যালয়ে বসে করার কাজ দেন এবং ৩১ জন বলেছে শিক্ষকরা তাদের পাঠ্যবই থেকে জোরে জোরে পড়তে বলেন।

২.৩.১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর পদ্ধতি : শিশুদের উত্তর

ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার	১৬ (২৯.৬৩)
পাঠ্যবই থেকে পড়া	৩৬ (৬৬.৬৭)
লিখিত কাজ করতে দেওয়া	৩৫ (৬৪.৮১)
শিশুদের বই থেকে জোরে জোরে পড়তে বলা	৩১ (৫৭.৪১)
খেলাধুলা	০
মোট উত্তরদাতা	৫৪

(একটি অন্যটির সঙ্গে অসংযুক্ত নয়। বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যা শতাংশের সূচক)

পাঠ্য বিষয় বোঝা

শিশুদের একটি বড় সংখ্যা জানিয়েছে যে তারা অঙ্ক বুঝতে পারে না। শিক্ষকদের মনে হয় সম্ভবত বাংলা পড়ানোটা অপেক্ষাকৃত সহজ। বিভিন্ন গ্রামে আমাদের পরিদর্শনের দিন বা তার আগে শিশুদের কেবল বাংলা পড়ানো হয়েছে বলে একটা বড় সংখ্যার শিশুরা জানায়।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর শিক্ষাপদ্ধতি

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি কমবেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছকই অনুসরণ করে। একমাত্র পার্থক্য হল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সহায়িকারা শিশু পিছু বেশি সময় দিতে পারেন যেহেতু প্রায় সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রতেই ক্লাস পিছু একজন করে সহায়িকা থাকেন। অন্য পার্থক্য হল এই, সহায়িকারা খেলাধুলার বন্দোবস্ত করেন।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতির ছকটা এরকম ঃ

২.৩.১২ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাদানের পদ্ধতি : শিশুদের অভিমত

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার	৮ (২৪)
পাঠ্যবই পড়ে শোনানো	১৫ (৪৫)
লিখিত কাজ করতে দেওয়া	২০ (৬১)
শিশুদের জোরে জোরে পড়তে বলা	৩৩ (১০০)
খেলাধুলা	২০ (৬১)
মোট উত্তরদাতা	৩৩

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। উত্তরগুলি পরস্পর সম্পর্কিত হতেও পারে)

সময় সারণী — একটি অলংকার মাত্র

মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ের একটি দেয়ালে চতুর্থ শ্রেণির একটি টাইমটেবিল লাগানো। সুন্দর দেখতে। নানারঙে রঙিন। এই একটিমাত্র বিদ্যালয়েই আমরা সময়সারণী দেখতে পেলাম।

পরিদর্শনের দিন আমরা চতুর্থ শ্রেণির ৪টি শিশুর সাক্ষাৎকার নিই। ওরা সবাই বলল সেদিন কেবল ইতিহাস পড়ানো হয়েছে। সেদিনটা সোমবার ছিল। অথচ সারণীতে সোমবার ইতিহাসের ক্লাস ছিল না। (সোমবার বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান এবং ইংরাজি পড়ানোর কথা) "ঠিক আছে, আজ কি পড়লে তার কিছু বলতে পারো?" চারটি শিশুই চুপ করে রইল।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যা পড়ানো হয়

নিচের উত্তর থেকেই বোঝা যায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর শিশুরাও অঙ্ক করতে বিশেষ পছন্দ করেনা। বাংলা আর অঙ্ক ছাড়া আর কিছু এখনও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ানো হয়না। অনেক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই আমরা কেবল দুটো শ্রেণি - প্রথম আর দ্বিতীয় দেখেছি। নীচের সারণীতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষাদানের ছকটা দেখা যাবে।

২.৩.১৩ আমাদের পরিদর্শনের দিন বা তার আগে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যে যে বিষয় পড়ানো হয় : ছাত্রদের অভিমত

বাংলা	২৮ (৮৫)
অঙ্ক	৩ (৯)
কিছু পড়ানো হয়নি	৫ (১৫)
মোট উত্তরদাতা	৩৩

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যা শতাংশের সূচক। একটি উত্তর অন্যটির অসংযুক্ত নয়)

শারীরিক শাস্তি

"*অউটা করি পারলুনি, গরু কাঁহিকার*" — এই সোজা (অঙ্কটা) পারলি না, গরু কোথাকার। বাচ্চার চুলের মুঠি ধরে তিনি শূন্যে তোলেন, পিঠে কয়েকটা কিল মারেন। "*অতবা বুঝলু*" — এবারে বুঝলি?

পড়ানোর 'ব্যস্ত' সময়ে এক গবেষকের আবির্ভাব শিক্ষককে নিঃসন্দেহে খুশি করেনি। "আপনারা শহরের শিক্ষিত লোকরা গ্রামের অবস্থা বুঝতে পারেন না। এই বাচ্চাগুলো কেবল মারধরের ভাষা বোঝে। শিক্ষার অন্য কোনো পদ্ধতি এখানে সফল হতে পারে না।" এ সব বলে তিনি ঠান্ডা হয়ে যান। (মজার কথা সেই গবেষক নিজেও কিন্তু গ্রামে বড় হওয়া, ছোটবেলাতেই সে অঙ্ক কষা থেকে পালাতে শেখে -- পিঠে যত বেত পড়েছে, অঙ্কে ভীতি তার ততই বেড়েছে)।

এ কোনো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। ১৮টি বিদ্যালয়ের সব ক'টিতেই শারীরিক শাস্তি পঠনবিধির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষকরাও স্বীকার করেন যে তাঁরা নানা ধরনের

শাস্তি দেন, শারীরিক শাস্তি-সহ। একজন বিদ্যালয় শিক্ষক বললেন যে, তিনি আজকাল আর শারীরিক শাস্তি দেন না। যেহেতু তা "আজকাল নিষেধ হয়ে গেছে"। শাস্তির ছবিটা এ-রকম :

২.৩.১৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাস্তির নানা ধরন

বকাঝকা	১৫
চড় মারা	৫
রুলার দিয়ে মারা	৪
কান ধরা	৪
হাঁটু মুড়ে বসতে বলা (মেঝেতে)	২
অন্য শিশু দিয়ে শাস্তি দেওয়ানো	১
কোনও শাস্তি না দেওয়া	১

(উত্তরগুলো পরস্পর অসম্পৃক্ত নয়)

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শারীরিক শাস্তি

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার ঘটনা থাকলেও মা-বাবা'রা সবাই মোটামুটি মানেন যে, সহায়িকারা ছেলেমেয়েদের মারধোর করেন না, বরং আদর-যত্নই করেন। "ওদের এই মা'র মতো ব্যবহারের জন্যই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুরা আনন্দে থাকে" — মানুষের মনে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে এই রকম ধারণা। এক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা বললেন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাচ্চারা ছোট, ওদের মারতে হয় না। বড়জোর একটু বকুনিতেই কাজ হয়। কিন্তু কিছু সহায়িকা আছেন, যাঁরা বাচ্চাদের 'বিদ্যালয়ে আনার জন্য' মারধর করেন।

পাঠ্যবই

আমরা একজন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে জিজ্ঞেস করি, "পড়ার বই পড়তে পারো?" সে মাথা নেড়ে বলে, "হ্যাঁ"। কিন্তু আমরা যখন পড়ে দেখাতে বলি সে একটা লাইনও ঠিক পড়তে পারে না। আর একজন বাচ্চা, পাঠ্যবই পড়তে পারে, কিন্তু শব্দের মানে বোঝে না। বহু শিশুর কাছেই অঙ্ক কঠিন লাগে। বহু শিশুর কাছে, ইতিহাস। বহু শিশুর বাংলাও কঠিন লাগে। কী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কী প্রাথমিক বিদ্যালয় — বহু শিশুই এখনও পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবই পায়নি।

পাঠ্যবই সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মতামত সারণীতে দেওয়া হল।

২.৩.১৫ পাঠ্যবই সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মতামত

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
সোজা	৩৪ (৩৮.২০)	১৬ (৩৮.০৯)
সোজা নয়	৩০ (২৯.২১)	৯ (২১.৪২)
কিছু সোজা, কিছু কঠিন	২৫ (২৫.৮৪)	১৭ (৪০.৪৭)
মোট	৮৯	৪২

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যা শতাংশের সূচক)

শিক্ষার মাধ্যম

মেদিনীপুরের এক সাঁওতাল বলেন, "বাচ্চারা ইংরিজি না শিখলে বড় হয়ে চাকরির প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে না"। মজুর হলেও তিনি রোজগার ভাল করেন, কেন না তিনি এক রাজমিস্ত্রীর ফরমাশ খাটেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা।

এই পুরোপুরি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামে অন্য কোনও উত্তরদাতা ইংরেজির কথা উল্লেখ করেননি। একই ছবি বীরভূমেও। সাঁওতাল ও কোঁড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের মা-বাবা'রা শিক্ষার মাধ্যমকে সাঁওতালি করতে হবে বলে জোর দেন। অন্যথায় শিশুরা শিক্ষকদের কথা বা শিক্ষকরা শিশুদের কথা বুঝতে পারে না বলে তাঁরা জানান।

প্রাথমিক শিক্ষক এবং তিনজন সহায়িকাও মা-বাবা'দের এই মতকে সমর্থন করেন। এক প্রধান শিক্ষক বলেন, 'যেহেতু ওরা গুছিয়ে বাংলা বলতে পারে না, তাই আমাদের প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে'। "এটা খুবই কঠিন ব্যাপার, ওরা কিছুই বোঝে না", আর একজন বিদ্যালয় শিক্ষকের অভিমত। সাঁওতাল ও কোঁড়া সম্প্রদায়ের সব শিশুরাই বলে যে শিক্ষকরা ওদের যা বলেন, ওরা তার পুরোটা বোঝে না। 'চেদ কো চঁ অডং বডং লাইয়া:" — শিক্ষক কি সব আবোল তাবোল কথা বলেন।

সাঁওতাল শিশুরা যে সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ে (বীরভূমে-২, মেদিনীপুরে-১) সেখানকার শিক্ষকরা সুনিশ্চিত যে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সাঁওতালি ভাষায় কথা বলা শিক্ষকের দরকার এবং দরকার সাঁওতালি ভাষায় লেখা পাঠ্যবই। "ওদের বাংলা শেখাতে আমাদের অনেক সময় যায়, কিন্তু ওরা সবাই বাড়িতে তো সাঁওতালিতে কথা বলে, তার আমরা কী করতে পারি?" এক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা এই প্রশ্ন করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

"মাস্টার মশাইকে ভাল লাগে?" শিশুরা সম্ভবত এই প্রশ্নের স্পর্শকাতর দিকটা বড়দের থেকে বেশি ভাল বোঝে। ২১ জন ছাত্র - প্রায় বেশির ভাগই উঁচু শ্রেণির থেকে আসা — তারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ১৭ জন কেবল দায়সারাভাবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছে, কিন্তু কেন ভাল লাগে তারা কিছু খুলে বলেনি। ৪ জন নির্দ্বিধায় জানায় যে শিক্ষককে তাদের ভাল লাগে না।

"পাকা চুল বাছা করায় .... মারে," পাকা চুল বাছায়, মারধর করে বলে তাদের ভাল লাগে না।

নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে কথা বলার সময় বহু শিশু অভিযোগ করেছে যে শিক্ষকরা ক্লাসে এসে ঘুমোন, তাদের মারধর করেন, দরকার ছাড়া কথা বলেন না, ইত্যাদি। অন্তত কিছু বিদ্যালয় ঘুরে আমাদের মনে হয়েছে, শিশুদের কাছে শিক্ষকের ভাবমূর্তি অনেকটা সেই 'শোলে' ছায়াছবির 'গব্বর সিং'-এর মতো। "মাস্টার আসলো — পালা, পালা!" ইশকুলের বাইরের মাঠ থেকে এরকম একটা চিৎকার আমরা একবার শুনেছিলাম। যদিও তখন দুপুরের খাবারের সময়, ক্লাস শুরু হয়নি, ওরা মাঠে খেলছিল।

মেদিনীপুরের এক 'জেদি, একগুঁয়ে' বাচ্চাকে তার মা ভয় দেখাবার জন্য বলেন যে তিনি শিক্ষককে বলে দেবেন, কারণ ছেলেটি পুকুর থেকে উঠতে চাইছিল না। "*ও কেবল মাস্টারকে ভয় করে। মাস্টারের মারকে ভয় পায়*" — মা হেসে বলেন।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

শিক্ষক ও ছাত্র'র জাতিগত পরিচয় তাঁদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শিক্ষকরা প্রায়শই নীচু জাতের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার অক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ করেন। বীরভূমের এক শিক্ষক বলেন, সাঁওতাল ছাত্ররা বাস্তবিকই নির্বোধ। "হাজার বার বললেও বুঝবে না", তিনি বলেন। "ওদের মা-বাবা'দের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ নেই। মজুরি করার জন্য ওরা জন্মেছে।"

২.৩.১৬ তফসিলী জাতি/জনজাতি ছাত্র এবং সাধারণ বর্ণের ছাত্রদের বুদ্ধির তুলনামূলক বিচার : শিক্ষকের মানদন্ডে।

বেশি উৎসাহ			বেশি গোবেচারা			প্রায়শই শাস্তি পায়			বেশি বুদ্ধি		
তফসিলী জাতি/ জনজাতি	সাধারণ	তফাত নেই	তফসিলী জাতি/ জনজাতি	সাধারণ	তফাত নেই	তফসিলী জাতি/ জনজাতি	সাধারণ	তফাত নেই	তফসিলী জাতি/ জনজাতি	সাধারণ	তফাত নেই
০	১৩	২	১১	৩	১	১	১১	৩	০	১২	৩

অন্যদিকে মা-বাবা'দের অভিযোগ শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের পড়ান না। ফের, এই একই বিদ্যালয়েই শিক্ষকরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা ছাত্রদের ভাষা এবং ছাত্ররা তাঁদের ভাষা বোঝে না এবং ভাষা এই দু'দলের মধ্যে এক ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়।

কেবল ভাষাই সমস্যা তৈরি করে না। পুরুলিয়ার সেই বিদ্যালয়ের কথা আমরা আগেই বলেছি, যেখানে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের ভাষাই এক, কিন্তু তাদের সম্পর্কের মধ্যে খুবই বৈরিতা আছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তফসিলী জাতি/জনজাতি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কিছু মনগড়া একপেশে ধারণা আছে। এক বর্ণহিন্দু শিক্ষক বারংবার এ কথা বলে চলেন, "মুসলমানরা লেখাপড়াকে গ্রাহ্য করে না"। তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেও তাঁর একই মনোভাব। এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক তফসিলী জাতি, জনজাতি এবং মাহাতো পরিবারের ছেলেমেয়েদের 'ছোটলোক' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা দেখেছি শিশুরা এ ধরনের মন্তব্য সম্পর্কে স্পর্শকাতর এবং তাদের ব্যবহারেও তা বুঝিয়ে দেয়।

তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের সঙ্গে সাধারণ বর্ণের শিশুদের পার্থক্য (শিক্ষকদের চোখে)

শিক্ষকরা মনে করেন অন্য বর্ণের শিশুদের থেকে তফসিলী জাতি জনজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের লেখাপড়ায় উৎসাহ কম, আরও বেশি নির্জীব এবং সাধারণ বর্ণের শিশুদের থেকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন।

শিক্ষক ও শিক্ষিকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদিও আমরা মাত্র ১৪ জন শিক্ষিকা পেয়েছি (মোট শিক্ষকের ৩০.৪৩ শতাংশ) এবং এঁদের মধ্যে ৮ জনেরও বেশিকে যদিও ২টি মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে (বাকি ৬ জনকে যথাসম্ভব সংখ্যক বিদ্যালয়ে সমভাবে পাঠানো হয়েছে)। শিক্ষিকাদের শিশুরা বেশি পছন্দ করে বলে মনে হয়েছে।

"দিদিমণি ভালো", দিদিমণি না মাস্টারমশাই কাদের বেশি পছন্দ, এই প্রশ্নে শিশুদের সাধারণ উত্তরটা এরকমই ছিল। অর্ধেকের বেশি মা-বাবা মনে করেন নারী-পুরুষ পার্থক্যে পড়ানোর গুণমানে পার্থক্য হয়। প্রায় বেশির ভাগই মনে করেন মহিলা শিক্ষকরা শিশুদের বেশি যত্ন করেন।

২.৩.১৭ শিক্ষকের লিঙ্গ কি শিক্ষাদানে কোনো তফাত সৃষ্টি করে?

হ্যাঁ	৮৯ (৪৫)
না	৮৬ (৪৪)
জানিনা	২১ (১১)
মোট	১৯৬ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যা শতাংশের সূচক)

২.৩.১৮ শিক্ষাদানের উপর শিক্ষকদের লিঙ্গের প্রভাব

শিক্ষক বাচ্চাদের ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন	৫ (৫.৬১)
শিক্ষক ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন	১০ (১১.২৩)
শিক্ষিকা বাচ্চাদের ভালো যত্ন নিতে পারেন	৭৪ (৮৩.১৪)
মোট	৮৯ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

পুরুষ শিক্ষকরা সাধারণত মনে করেন যে নিচু শ্রেণির ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মহিলা শিক্ষক থাকা উচিত। কেন না মেয়েদের ধৈর্য বেশি এবং তাঁরা ক্লাসটা সুশৃঙ্খল রাখতে পারেন। তাঁরা এটাও মনে করেন যে উঁচু শ্রেণির বালিকা ছাত্রীরা শিক্ষিকার কাছে তাদের সমস্যার কথা আরও ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে।

শিক্ষক/শিক্ষিকার চোখে বালিকারা ছাত্রী

শিক্ষকরা সাধারণভাবে মনে করেন বালিকারা বালকদের থেকে বেশি নিষ্ঠাশীল

এবং তাদের পড়াশোনায় উৎসাহ বেশি, তাঁরা বেশি নিয়মিতও বটে। এই অভিমতের সঙ্গে মা-বাবা'দের মতামত মেলে।

তবুও, শিক্ষকরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করেন যে বালিকাদের বুদ্ধি বালকদের থেকে কম। একজন শিক্ষক এমন কী বলেও দিলেন যে, "বালিকারা বালকদের সঙ্গে কোনওদিন পেরে উঠবে না। কারণ এটা মস্তিষ্কের ব্যাপার, ছেলেদের মাথায় ঘিলু মেয়েদের থেকে বেশি থাকে।"

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকারা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন। যদিও ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী কথার উত্তর দেয় (শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্ররা খুবই ছোট-প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে) কেউ শিক্ষকদের অপছন্দ করার কথা বলেনি। অনেক বাচ্চারই শিক্ষিকাদের পছন্দ কেন না তাঁরা গল্প বলেন, ওদের সঙ্গে খেলেন। পুরুলিয়ার দুটি গ্রামে অবশ্য শিশুরা সহায়িকাদের পছন্দ করে না। প্রধান কারণ, সহায়িকাদের অনুপস্থিতি। তাঁরা অনিয়মিত – একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে দেখা গেল দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ হয়ে আছে। অন্য গ্রামগুলিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাদের সম্পর্কে সাধারণত ইতিবাচক ধারণাই বর্তমান।

মা-বাবা'রা মনে করেন মেয়েরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয় প্রধানত তিনটি কারণে

১. বেশি পথ যেতে হয় না – শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বাড়ির কাছাকাছি হয়।
২. শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সময় এমন করা হয় যাতে মেয়েরা ঘরের অন্যান্য কাজ করতে পারে।
৩. শিক্ষকেরা সব মহিলা বলে।

মেদিনীপুর জেলার এক পঞ্চায়েত সদস্য জানালেন মাত্র দু'বছর আগেও মেয়েরা (গ্রামের তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসতো না। এখন গ্রামে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং মহিলারাই চালান। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র মেয়েতে ভর্তি। "মাস্টারকে ভয় পেতো, দিদিমণিকে পায় না", তিনি বললেন।

নিজেরা গৃহশিক্ষকতা করেন এরকম শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম পাওয়া গেলেও তাঁদের স্কুলে ঘুমিয়ে পড়া ও বাচ্চাদের অন্য গৃহশিক্ষক (যাঁরা মূলত বেকার যুবক)দের কাছে পড়তে যাওয়া এই দুটি কঠিন বাস্তবতা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে।

২.৩.১৯ পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনামূলক মতামত (১৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা)

নিয়মানুবর্তী				বিবেকপরায়ণ				প্রায়ই শাস্তি পায়				শাস্তি দেয়			
পু	ম	তফাত নেই	উ	পু	ম	তফাত নেই	উ	পু	ম	তফাত নেই	উ	পু	ম	তফাত নেই	উ
১	০	১১	৬	০	২	১১	৫	০	৬	৬	৬	৪	১	৭	৬

প্রাইভেট টিউশন এবং পারিবারিক সহায়তা

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলি থেকে ১৯৬ জন বর্তমানে ভর্তি হওয়া যে শিশুদের কাছ থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে ১১৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৭৮ জন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে।

উৎসাহ আছে			মিনমিনে			প্রায়ই শাস্তি পায়			বুদ্ধি আছে		
বালক	বালিকা	তফাত নেই	বালক	বালিকা	তফাত নেই	বালক	বালিকা	তফাত নেই	বালক	বালিকা	তফাত নেই
৪	১০	৪	০	১৬	২	১৫	০	৩	৮	৩	৭

২.৩.২০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক/বালিকাদের তুলনা (শিক্ষকদের দ্বারা)

মোট ১৯৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৮৯ জন (৪৪.৯৪ শতাংশ) প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নেয় এবং ৯৩ জনকে বাড়িতে সাহায্য করা হয়। বাড়িতে সাহায্য পায় এ রকম ৩৩ জন ছাত্র প্রাইভেট টিউশনও নেয়।

এ ছাড়া তুলনামূলকভাবে সম্পন্ন পরিবারের ৭টি শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি যারা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ে।

যে ৮৯ জন প্রাইভেট টিউশন নেয় তাদের ৬৬ জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ৩৩ জন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের ৫১ শতাংশ এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হওয়াদের ৩৩ শতাংশ প্রাইভেট টিউশন নেয়। বেসরকারি বিদ্যালয়ে এর বিপরীত ছবিটা পাওয়া যায়। সেখানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ২৮ শতাংশ প্রাইভেট টিউশন নেয়।

প্রাইভেট টিউশন এবং শিক্ষার গুণগত মান

"প্রাইভেট না দিলে লেখাপড়া হবে না", এটি একটি সাধারণ বিশ্বাস। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে প্রাইভেট টিউশন ব্যাপারটা এত গেঁথে গেছে যে শিশুপাঠ্য কাহিনিতেও প্রাইভেট নিয়ে মজা করা হয়। একটি গল্পে বলা হচ্ছে স্কুল শিক্ষকরা সকালে দুপুরে প্রাইভেট টিউটোরিয়াল নিচ্ছেন এবং স্কুলে এসে ঘুমোচ্ছেন।[৪৬]

"প্রাইভেট টিউশন ছাড়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে না", ধারণাটা মা-বাবা'দের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ধারণা। সাক্ষাৎকার নেওয়া শিশুরাও এই বিষয়টি জানায়। নানারকম কারণে বহু শিশু আমাদের সঙ্গে কোনও কথা না বললেও ('বাইরের লোক', শহরের লোক বা ভাষা ইত্যাদির কারণে) কিছু বাচ্চা তারা কি শিখেছে তা আমাদের দেখিয়েছে। আমরা পরীক্ষকের চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে ওদের জ্ঞান বিচার করিনি বরং বলেছিলাম ওদের নাম, ক্লাস বা যা ইচ্ছা তা একটা কাগজে লিখতে। কখনও ওদের আমরা সহজ একটা অঙ্ক কষতে বলেছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা ওদের কেবল জিজ্ঞেস করেছি ওদিন ইশকুলে কোন বিষয়ে পড়ানো হয়।

আমরা ৩৪ জন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার নমুনা পেয়েছি (সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং সবাই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে)। এদের মধ্যে ২০ জন প্রাইভেট টিউশন নেয়, ১৪ জন নেয় না। তফাতটা জলের মতো স্বচ্ছ, প্রাইভেট টিউশন নেওয়া ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ১৬ জনই নির্ভুলভাবে নিজের নাম লিখতে পারে, কেউ কেউ আবার তাদের পাঠ্য বাংলা বই থেকে কয়েক লাইন লিখতে পারে। কুড়ি জনের মধ্যে ৪ জন নির্ভুলভাবে লিখতে পারেনি। এর বিপরীতে প্রাইভেট টিউশন না নেওয়া ১৪ জন ছেলেমেয়ের মাত্র ১ জন সঠিকভাবে লিখতে পারে।

সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থান এবং প্রাইভেট টিউশন

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির মধ্যে তফসিলী জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ১১২টি পরিবার ছিল। এর মধ্যে ৯০টি পরিবারেরই প্রধান জীবিকা কৃষি বা অন্য ধরনের মজুরি। সমীক্ষাকৃত খেতমজুর পরিবার গুলির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ (১০৫) এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ।[৪৭]

চাষবাস মুখ্য জীবিকা এরকম ৪৭টি সম্পন্ন পরিবারের ৩৯টিই তাঁদের ছেলেমেয়েদের (৮৩ শতাংশ) প্রাইভেট টিউশন দেন, যেখানে ১১৩ জন মজুরের পরিবারের মধ্যে মাত্র ২৭টি রই (বা ২৪ শতাংশ) সেখানে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার সঙ্গতি আছে।

এটা মোটেই সত্যি নয় যে কৃষি বা অন্যান্য মজুর পরিবার তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন দিতে চান না। বরং এর বিপরীতটাই ঠিক, ওঁদের সবাই মোটামুটি বিশ্বাস করেন যে ছেলেমেয়েরা যাতে আরও ভাল করতে পারে তার জন্য অতিরিক্ত কিছু সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু "সাধ আছে, সাধ্যে কুলায়নি গো", এক খেতমজুরের খেদোক্তি। "খাইতে দি পারিনি, প্রাইভেট দিবা?" খেতে দিতে পারি না, প্রাইভেট টিউশন দেবার কথা ওঠে কী করে?

আর যাঁরা ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন দেন, তাঁদের অনেকের কাছেই তা খুবই কষ্টসাধ্য। প্রাইভেট টিউশনের খরচ, এমন কি তা যদি মাসে ২০ টাকাও হয়, সেটাই মজুরদের কাছে একটা গুরুতর আর্থিক সমস্যার ব্যাপার। "কুড়ি টাকা জোগাড় করা কি সহজ কথা?"

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন কম নেওয়ার কারণ হয় তো শিশুদের এই সামাজিক বিন্যাস। এই শিশুরা বেশির ভাগ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের, যাদের মা-বাবা'রা প্রধানত মজুরি করেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-গামী ছাত্রছাত্রীদের উত্তরদাতা মা-বাবা'দের অধিকাংশই জানান যে ছেলেমেয়েকে প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার মতো পয়সা তাঁদের নেই, তাঁরা বড়ই গরিব।

গৃহশিক্ষক

৮৯টি দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র ৭টিতে গৃহশিক্ষকরা ছাত্ররা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেখানকারই শিক্ষক। ৭টি ক্ষেত্রে শিক্ষকরা অন্য বিদ্যালয়ের। ৭৫ জন গৃহশিক্ষকই গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক।

বাড়িতে সাহায্য

১০৫টি পরিবারের বাচ্চাদের বাড়িতে পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই। ৭৫টি পরিবারের মা-বাবা'রা জানিয়েছেন যে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করতে না পারার কারণ পরিবারে সে রকম যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত কেউ নেই।

আমাদের সমীক্ষাকৃত ২১২টি পরিবারের ১৪টিতেই (৬.৬ শতাংশ) শিক্ষিত কেউ নেই, ২টিতে (০.৯৪ শতাংশ) বিদ্যালয়ে রীতিসম্মতভাবে শিক্ষা না পাওয়া শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, ৮৪টিতে (৩৯.৬২ শতাংশ) পঞ্চম শ্রেণীর নীচে পর্যন্ত পড়া লোক আছেন এবং ২৫টিতে (১১.৭৯ শতাংশ) পঞ্চম শ্রেণি পাস করা পারিবারিক সদস্য আছেন। বাকি ৮৭টি বাড়িতে অষ্টম শ্রেণির বেশি পড়াশোনা করা লোক আছেন। মোটের উপর আধাআধিরও বেশি সংখ্যক পরিবারে যখন প্রথাসম্মত শিক্ষিত লোক নেই তখন ভালো সংখ্যক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাড়িতে কোন সাহায্য পাবে না এটাই তো স্বাভাবিক।

বহু ক্ষেত্রে মা-বাবা'র জীবিকা তাঁদের সন্তানকে বাড়িতে পড়াশুনার কাজে সাহায্য করতে বাধা দেয়। "সারাদিন খাটি কখন আর সময় পাই?" এক খেতমজুরের এই বক্তব্য।

আর একটা চোখে পড়ার মতো ব্যাপার, যে সব ঘরের মায়েরা শিক্ষিত সেখানে ছেলেমেয়েরা তাঁদের সাহায্য পায়। অবশ্য এ ধরণের মায়েরা সংখ্যায় বেশি নন। অন্যদিকে শিক্ষিত বাবাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছেলেমেয়েদের সাহায্য না করে প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, তাসপাশা খেলে সময় কাটাতে। এক মা বলেন, "আমি ঘরের সব কাজ করি। তাও আমাকে বাচ্চাকে সাহায্য করতে হয়। তা না করলে বাচ্চা পেরে উঠবে কি করে?" তিনি আরও বলেন, "বাচ্চার বাবার কোনও ধৈর্য নেই, বাচ্চাটাকে বড় মারে।"

২.৩.২১ গৃহে সাহায্য

সাহায্য করা হয়	৯৩ (৪৭.৪৪)
সাহায্য করা হয় না	১০৩ (৫২.৫৬)
মোট	১৯৬ (১০০)

(প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র মিলিয়ে। বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যা শতাংশের সূচক)

২.৩.২২ হোমওয়ার্কে বাচ্চাকে কে সাহায্য করে

বাবার সাহায্য	৫১ (৫৪.৮৩)
মায়ের সাহায্য	৩১ (৩৩.৩৩)
অন্যদের সাহায্য	১১ (১১.৮২)
মোট	৯৩ (১০০)

২.৩.২৩ বাড়িতে পড়ার কাজে বাচ্চাকে সাহায্য করে

বাবার সাহায্য	৫১ (৫৪.৮৩)
মায়ের সাহায্য	৩১ (৩৩.৩৩)
অন্যদের সাহায্য	১১ (১১.৮২)
মোট	৯৩ (১০০)

২.৪ জবাবদিহি

পরিদর্শন

একজন শিক্ষক জানালেন, "ও দিন চলে গেছে যখন নিয়মিতভাবে পরিদর্শকরা স্কুল ঘুরতে আসতেন। পরিদর্শনের জন্য আমি কতবার আমার ইনস্পেক্টরকে তাড়া লাগিয়েছি। এই নিয়ে তিন বছর কাটল, কোনও পরিদর্শন হল না"। "ইনস্পেকশন এখন নিছক একটা লোক দেখানো অনুষ্ঠান", অন্য একজনের মন্তব্য।

আমাদের সমীক্ষাকৃত ১৮টি বিদ্যালয়ের ১৪টিতে গত বছর সরকারি পরিদর্শন হয়েছে। বাকি চারটি বিদ্যালয়ে উক্ত সময়ে কোনও সরকারি পরিদর্শন হয়নি।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরদাতা ১৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে প্রত্যেকে বললেন যে পরিদর্শন বলতে এখন ছাত্র এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা পরখ করে দেখা বোঝায় মাত্র।

কিছু শিক্ষক/শিক্ষিকা যেখানে পড়ানোর সময় পরিদর্শন করে দেখা বিষয়ে নিরুত্তর থাকতেই পছন্দ করেছিলেন, কিছু শিক্ষক সেখানে জানিয়েছিলেন, ক্লাসে কী পড়ানো হয় সে সম্পর্কে কোনো যাচাই হয় না।

"পড়ানোর গুণমান ঘুরে দেখা? কী গুণমান? তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নাম লিখতে পারে না। এই গুণমানের কথা কী বলছেন?" এক ক্রুদ্ধ, পরিদর্শকের হতাশ মন্তব্য। "আমাদের ভূমিকাটা কী? সব কিছু দল বা পঞ্চায়েত করে। আমরা কেবল মাছি মারা কেরানির মতো খাতা সামলাই", তিনি যোগ করেন।

এক জেলার সার্কেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহির্মূল্যায়নের আগের দিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতির কাছে কিছু ভীত, সন্ত্রস্ত ইনস্পেক্টরকে নিরাপত্তা-ভিক্ষা চাইতে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

এক্ষেত্রেও, এই রিপোর্টে পূর্বে উল্লেখিত, এক প্রাক্তন মন্ত্রীসহ কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে সামগ্রিক ব্যবস্থাটিই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকরাও তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন না। এক পরিদর্শক জানালেন, তাঁরা ভয়ে ভয়ে থাকেন। "ডিউটি করব কি মার খেতে?" ওই ইনস্পেক্টরের প্রশ্ন।

মূল্যায়ন

গত ১৫ বছর ধরে চালু যে নতুন ব্যবস্থা অনুসারে প্রাথমিক স্তরে পাস-ফেল প্রথা উঠে গেছে সেই ব্যবস্থার ফলে বাংলা ভাষায় শব্দ ভান্ডারে আর একটি নতুন শব্দ ঠাঁই পেয়েছে। শব্দটির নাম 'evaluation'। এ শব্দটাতে সব শিশু, শিক্ষক, মা-বাবা'রা এখন অভ্যস্ত। আজকাল শিশুদের আর ষান্মাষিক, বার্ষিক পরীক্ষার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা দিয়ে যেতে হয়না। শিক্ষার নিম্নমানের জন্য অবশ্য ১৮টি বিদ্যালয়ের সব ক'টির শিক্ষকরা এই ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। "বাচ্চা লিখতে বা পড়তে না পারলেও তাকে একই ক্লাসে আটকে রাখা যাবে না", এক শিক্ষকের খেদ। "এখন আমরা 'মূল্যায়ন' করি – 'আন্তর্মূল্যায়ন এবং বহির্মূল্যায়ন'।

বহির্মূল্যায়ন হয় দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে। এটা করেন বাইরের অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। জেলা পরিদর্শনের অফিস থেকে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। উত্তর লিখতে শিশুদের কাগজ দেওয়া হয়। মূল্যায়ন ওইখানেই হয়ে যায়।

আন্তর্মূল্যায়ন বছরে ৬ বার হওয়ার কথা। ১৮ জন উত্তরদাতা শিক্ষকের সব ক'জনেই স্বীকার করেন ৬ বার মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অধিকাংশ শিক্ষক/শিক্ষিকা যে যার নিজের বিদ্যালয়ে পূর্ববর্তী বছরে তিনবার মূল্যায়নের কাজটি করেছেন।

সাধারণভাবে শিক্ষক এবং মা-বাবা – উভয়পক্ষই মনে করেন যে মূল্যায়নের কোনও মানে হয়না। যেহেতু তার উপর শিশুদের পরবর্তী ক্লাসে ওঠা নির্ভর করে না।

জনসাধারণের অংশগ্রহণ

গ্রাম শিক্ষা সমিতি (ভি.ই.সি.) কাকে বলে? বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (ডিপিইপি)র অফিসে ঝোলা একটি বাংলা পোস্টার অনুযায়ী তা ঃ

* প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গঠিত
* বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের গ্রাম/ওয়ার্ডভিত্তিক এক প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ
* ১৫/২০ জন মনোনীত সদস্যের একটি কমিটি
* যে কমিটির শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার কথা।

গ্রাম শিক্ষা সমিতির অন্তত পাঁচটি পোস্টার আছে যাতে ভি.ই.সি.গুলির উদ্দেশ্য, এর সদস্যদের দায়িত্ব, তথ্য সরবরাহ, তদারকি ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভি.ই.সি.গুলির মূলত শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার, বিদ্যালয় এবং সাধারণ মানুষের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলার এবং শিক্ষানুগ পরিবেশ, ইত্যাদি গড়ে তোলার কথা।

পোস্টারগুলো সুন্দর, নানা বাহারি রঙের অক্ষরে ছাপা। যদিও এই রঙ তার সব উজ্জ্বলতাটুকু নিয়ে গ্রামে পৌঁছোয় বলে মনে হয়না।

"গ্রাম শিক্ষা সমিতি? ওটা রাজনৈতিক সংস্থা", এক প্রাথমিক শিক্ষকের এই অভিমত। "আমাকে সদস্যের বাড়ি যেতে হয়, সইসাবুদ জোগাড় করতে। মিটিং-এ কদাচিত কোরাম

মেলে, লোকই আসেনা ওই সব মিটিংয়ে'', শিক্ষক বলে চললেন।

সব রাজনৈতিক দলই ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। আমরা (কংগ্রেস(ই) এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই আমরা তুলছি''। পুরুলিয়া জেলার এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এ কথা বললেন। তিনি ওই এলাকায় ভি.ই.সি. গঠন করার ব্যাপারে কথা বলছিলেন (তার কাজ এখনও শুরু হয়নি। ট্রেনিং চলছে)। ওই ভি.ই.সি.তে ১৯ জন সদস্য আছেন— যার ১৩ জনই উচ্চবর্ণ এবং কংগ্রেস (ই) সমর্থক। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এক ব্যক্তিও আছেন যিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান এবং উক্ত ভি.ই.সি.র সম্পাদক ও সভাপতি যুগপৎ এই দুয়েরই দায়িত্ব নিয়েছেন। ''আমি প্রধান শিক্ষক, তাই আমিই সম্পাদক। এবং আমি পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। সেই সুবাদে আমি তার সভাপতি'', সেই শিক্ষকের সাফ জবাব। ''এই একই গ্রামের এক মনোনীত সদস্য এই এলাকার বাসিন্দা নন। তিনি কোলকাতায় থাকেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ইঞ্জিনিয়ার সুতরাং তাঁকে তো কমিটিতে রাখতেই হয়'', বললেন সেই সম্পাদক-সভাপতি-প্রধান শিক্ষিকা-পঞ্চায়েত সদস্য-গৃহবধূ। অবিশ্বাস্য হলেও, এই মহিলাই এলাকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ওই ভি.ই.সি.র ইঞ্জিনিয়ার সদস্য একজন উচ্চবর্ণ-উচ্চবিত্ত এবং ভি.ই.সি.তে অন্তর্ভুক্তির খবর তাঁর এখনও জানতে বাকি।

আমাদের ১৮টি সমীক্ষাকৃত গ্রামের ১২টিতে ভি.ই.সি. গঠিত হয়েছে। বীরভূম এবং পুরুলিয়ার দশটি গ্রামে, ৬টি বীরভূমে আর ৪টি পুরুলিয়ার। এই কমিটিগুলোকে গ্রাম শিক্ষা সমিতি বলা হয়। মেদিনীপুরের দুটি গ্রামে এ ধরনের সমিতি গঠিত হয়েছে, কাজকর্ম ভি.ই.সি.র মতো হলেও সেগুলিকে নিয়ামক কমিটি বলা হয়।

রাজীবের কাহিনী

এক ক্লাসে আটকে না রাখার নীতি শিশুদের হাইস্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে বলে সব শিক্ষক এবং বহু মা-বাবা'ই মনে করেন। আজকাল সব হাইস্কুলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বাচ্চাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি করা হয়। এই পরীক্ষাগুলিতে বিশাল সংখ্যক শিশু বাছাইয়ে বাদ পড়ে যায়।

সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরুলিয়ার লৌলাড়া গ্রামের এগারো বছরের ছেলে রাজীব সরদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া চালিয়ে গিয়েছিল। ওর দিদিমা ছাগল পুষে রোজগার করেন এবং রাজীবকে পেনসিল, স্লেট এ সব কিনে দেন। দিদিমা চাইতেন রাজীব আরও পড়ুক। যাতে ওর শিক্ষাদীক্ষার সহায়তায় রুজিরোজগার করতে পারে। রাজীবেরও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ আছে।

রাজীব পড়তে চায়। ওর দিদিমাও চায়। ওর মামার-ও এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। তবু রাজীব হাইস্কুলে ভর্তি হতে পারল না। ভর্তির পরীক্ষাতে ফেল করে গেল।

''এ রকম বহু রাজীব আছে'', লৌলাড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানালেন। ''প্রাইমারি লেভেলে কাউকেই আটকানো হয় না। খারাপ করা সত্ত্বেও আমরা ছেলেমেয়েদের উঁচু ক্লাসে তুলে দিতে বাধ্য হই।''

''রাজীব খারাপ করল কেন?''

''বাড়িতে ভাল দেখাশোনা হত না। কোনও গৃহশিক্ষকের কাছেও যেত না। গরিব ঘর

থেকে আসা ছেলে।"
"এর মানে কি হাইস্কুলে যারা ভর্তি হতে চায় তাদের স্কুলের বাইরের সাহায্য লাগবেই?"
"হ্যাঁ, তা ঠিক।"
"তা হলে তো তাদের পয়সা থাকতে হয়?"
এ কথাটার জবাব মেলেনি।

মেদিনীপুরের ৪টি গ্রামে এবং পুরুলিয়ার দুটি গ্রামে কোনও ভি.ই.সি গঠিত হয়নি। পুরুলিয়ায় ভি.ই.সি. গঠনের কাজ চলছে। মেদিনীপুরের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছে ভি.ই.সি. ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবুও, কিছু এলাকায়, যেমন দাশপুর ব্লকে আমরা দেখেছি যে নিয়ামক কমিটি আছে।

১২টি ভি.ই.সি.র মধ্যে ৪টির (পুরুলিয়ায়) কাজ শুরু হতে এখনও বাকি। বাকি ৮টির মধ্যে বীরভূমের ৩টি ভি.ই.সি.র এবং মেদিনীপুরের দুটি নিয়ামক কমিটির সদস্যদের সাক্ষাৎকার আমরা নিতে পেরেছি। বহু সদস্য জানেনই না যে তাঁদের নাম কমিটিতে আছে। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকরা আমাদের ভি.ই.সি. সদস্যদের নাম বলতে পারেননি।

ভি.ই.সি./নিয়ামক কমিটির সদস্যদের করা আমাদের প্রশ্ন থেকে এইসব জবাব পাওয়া গেছে :

১. বিদ্যালয় কমিটি থাকা সত্ত্বেও ভি.ই.সি. গঠিত হল কেন?

শিশুদের সমস্যা দেখার জন্য	৪
শিক্ষকদের সমস্যা দেখার জন্য	৩
বিদ্যালয়গুলির কাজের তদারকির জন্য	৫
পরিকাঠামোর দেখাশোনা করতে	৪
শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত রাখতে	৩

(উত্তরগুলি একটি অপরটি থেকে অসম্পৃক্ত নয়)

২. ভি.ই.সি/নিয়ামক কমিটির বৈঠকের আলোচ্য বিষয়তালিকা কী?

অর্থ সম্পর্কিত	৩
পরিকাঠামো	৩
ভর্তি, স্কুলছুট, অনুপস্থিতি	৫
মা-বাবা'দের উৎসাহ দান	৩
শিশুদের সমস্যা	২
শিক্ষকদের সমস্যা	৩

(উত্তরগুলি একটি অপরটি থেকে অসম্পৃক্ত নয়)

৩. ভি.ই.সি. কি শিশুদের শিক্ষাদানে মা-বাবাকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে?

হ্যাঁ	০
না	৩
জানি না	২
ভি.ই.সি.র প্রভাবগুলি :	
কোনও প্রভাব নেই	৫

মা-বাবার অংশগ্রহণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেখভাল বা প্রশাসনে মা-বাবা'র অংশগ্রহণের গুরুত্বের মূল্যায়ন করতে আমরা আমাদের ১৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে প্রশ্ন করে জেনেছি, যে তাঁরা বিশেষ করে ভর্তি বাড়াতে এবং অনুপস্থিতিও, বিদ্যালয় পরিত্যাগ কমাতে মা-বাবা'দের কাছে গেছেন। এই সব ক্ষেত্রে কত শতাংশ মাতা-পিতাকে সহযোগিতা করতে দেখেছেন বলে প্রশ্ন করলে এরকম উত্তর মিলেছে :

* ১ জন বলেছেন কোন মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন না
* ৪ জন বলেছেন মাত্র ১০ শতাংশ মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন
* ৪ জন বলেছেন মাত্র ১০-২০ শতাংশ মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন
* ৪ জন বলেছেন মাত্র ২০-৩০ শতাংশ মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন
* ৩ জন বলেছেন মাত্র ৩০-৫০ শতাংশ মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন
* ২ জন বলেছেন ৫০ শতাংশের উপর মাতা-পিতা সহযোগিতা করেন

অন্যদিকে সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাই বলেছেন যে মা-বাবারা কেবল শিশুদের পড়তে পাঠিয়েই নয়, শিক্ষাকেন্দ্রের গৃহনির্মাণে বা কেন্দ্রের কাজ ও অন্যান্য ব্যাপারের জন্য ঘর দেবার প্রস্তাব দিয়ে খুবই সাহায্য করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকরা যেখানে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি বা নিম্ন মানের লেখাপড়ার জন্য মা-বাবা'দের দোষী করেছেন ("ওঁরা যত্ন নেন না, স্কুলে পাঠান না, শিশুদের দিয়ে অন্য কাজ করান, বাড়িতে লেখাপড়ায় সাহায্য করেন না"), অন্যদিকে মা-বাবা'দের অনেকেই নিম্ন মানের শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রতি দোষারোপ করেছেন। এক্ষেত্রেও অনেক উত্তরদাতা মাতা-পিতাই অভিযোগ করেছেন যে, অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকের ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি।

শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে কি না জানতে চাইলে উত্তরদাতা ১০৮ জন মাতা-পিতার ৬৩ জন বলেছেন কোনও বৈঠকই হয়নি এবং ৪২ জন বলেছেন বৈঠক হয়েছে। ১৩ জন মাতা-পিতা বলেছেন বৈঠক হয়েছে কি না তাঁরা জানেন না।

ওঁরা বৈঠকে যোগ দেন কি না জানতে চাওয়া হলে ৪২ জন উত্তরদাতার অর্ধেক (যাঁরা বৈঠকের কথা জানেন) বলেছেন যে তাঁরা বৈঠকে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে যাওয়ার সমসয় পাননি, আবার কেউ কেউ বলেছেন এই সব বৈঠকে কোন ফল দেয় না বলে এতে তাঁদের আগ্রহ নেই। "মিটিংগুলোতে বড় বড় কথা হয়।" এক উত্তরদাতা বিদ্রূপ করে বলেন, "মিটিং শেষ হয়ে গেলে সব কথা হাওয়ায় উড়ে যায়।"

২.৪.১ অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

	বৈঠক সম্পর্কে অবহিত	বৈঠকে উপস্থিতি
হ্যাঁ	৪২	২১
না	৬৩	—
জানি না	১৩	—
	১১৮	২১

২.৪.২ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক

	বৈঠক সম্পর্কে অবহিত	বৈঠকে উপস্থিতি
হ্যাঁ	৪৭	৩৭
না	১৬	—
জানি না	১৫	—
মোট	৭৮	৩৭

বীরভূম এবং মেদিনীপুরের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কাজ করতে গিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে যে এই জেলাগুলির শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবক-সহায়িকাদের সম্পর্ক নিম্নলিখিত কারণে অনেক ভাল।

১. শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গ্রামের ভিতরে অবস্থিত। কোন কোনও ক্ষেত্রে কারও বাড়িতে বসে।

২. মায়েরা সহায়িকাদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় মিশতে পারেন।

৩. মা-বাবা'দের নিয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির কমিটি আছে। তার বৈঠকের আলোচ্য বিষয়াবলীর মধ্যে সহায়িকাদের বেতন প্রদানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি নতুন হয়েছে এবং এই কেন্দ্র সম্পর্কে সহায়িকা ও মাতা-পিতাদের উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েনি।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির প্রতি অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় অনেক বেশি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের মধ্যে অতটা দেখতে পাওয়া যায় না। নিজ নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিতে সাহায্য করতে পারেন কি না এ প্রশ্নের জবাবে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৭৩.৫৩ শতাংশ (৬৮ জনের মধ্যে ৫০ জন) মাতা-পিতা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেন। নিচের সারণীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাতা-পিতাদের

১১৮ জন এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মাতা-পিতাদের ৬৮ জনের উত্তর দেওয়া হল। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মাতা-পিতাদের ১০ জন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি।

২.৪.৩ বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মা-বাবা'রা কি সাহায্য করতে পারেন?

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
হ্যাঁ	৭৩ (৬১.৮৭)	৫০ (৭৩.৫৩)
না	১৯ (১৬.১০)	১০ (১৪.৭১)
জানি না	২৬ (২২.০৩)	৮ (১১.৭৬)
মোট উত্তরদাতা	১১৮ (১০০)	৬৪ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

মা-বাবারা কী ধরনের সাহায্য করতে পারেন, এ প্রশ্নের জবাবে শিশুদের মা-বাবারা সবাই বলেছেন যে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠিয়ে এবং তাদের পড়াশুনার তদারকি করে তাঁরা বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়াতে পারেন। যাই হোক, বীরভূম ও মেদিনীপুরের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মা-বাবারা নিছক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে নয়, শ্রম ও আর্থিক সহযোগিতায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ ও দেখাশোনার কাজ করতে দেখা গিয়েছে।

২.৪.৪ সাহায্য করতে মাতা-পিতার সদিচ্ছা

সাহায্য করবার সদিচ্ছা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিশুদের উপস্থিতি	৩২	৪৬
বিদ্যালয় প্রশাসনের তদারকি	২৪	৩৭
গৃহনির্মাণের কাজ	১৬	৫১

২.৫ অঙ্গনওয়াড়ি : সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৮টি সমীক্ষাকৃত গ্রামের ১২টিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দেখা গেছে। কিছু কিছু গ্রামে কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই, কিছু গ্রামে আছে একাধিক। বীরভূমের গড়গড়িয়াতে দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং পুরুলিয়ার হেটজারগোতে তিনটি অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্র আছে।

কিছু উত্তরদাতা কখনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কথা শোনেনেই নি। ২১২ জন উত্তরদাতার ১৪.৬০ শতাংশ (৩১ জন) বলেছেন তাঁদের অঙ্গনওয়াড়িদের সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। ৫৮.৪৯ শতাংশ (১২৩ জন) যাঁরা নিজেদের গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁদের ২৬.৮৮ শতাংশ দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামে কোনো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই।

২.৫.১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল উত্তরদাতা

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে	১২৪ (৫৮.৪৯)
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই	৫৭ (২৬.৮৮)
জানি না	৩১ (১৪.৬০)
মোট	২১২ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

এটা বিস্ময়কর যে যদিও ১২৪ জন উত্তরদাতা অঙ্গনওয়াড়ি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, মাত্র ৩২ জন (২৫.০৮ শতাংশ) তাঁদের ছেলেমেয়েদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়তে পাঠান। এঁদের মধ্যে ৪০ জন (৩২.২৫ শতাংশ) বলেছেন অঙ্গনওয়াড়িতে পাঠানোর বয়সী সন্তান তাঁদের নেই এবং বাকিরা বলেছেন যে যেহেতু ওখানে বিলি করা খাবারের পরিমাণ ও মানের কোনওটাই সন্তোষজনক নয়, তাই তাঁরা অঙ্গনওয়াড়িতে ছেলেমেয়েকে পাঠানোটা কাজের কাজ বলে মনে করেন না।

"*এতটুকু আটা গুলা দেয়, ওতে ছেল্যাদের কী হবে?*" বীরভূমের এক উত্তরদাতার পাল্টা প্রশ্ন।

কিছু কিছু উত্তরদাতা অঙ্গনওয়াড়িতে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চান না, যেমন পুরুলিয়ার ঘাগরজোড়ি এবং বীরভূমের গড়গড়িয়াতে। এই কেন্দ্রগুলি 'অস্পৃশ্য' মহিলারা চালান, এবং 'ছোটলোকদের বাড়ির' ছেলেমেয়েরা অঙ্গনওয়াড়িতে পড়তে আসে। সম্পন্ন বাড়ির লোকরা তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের অঙ্গনওয়াড়িতে পড়তে পাঠান না, যেহেতু তাঁদের 'ঘরে খাবারের অভাব নাই'।

এর বিপরীত ছবিটা মিলবে জনজাতি অধ্যুষিত ছাতিনা গ্রামে। সেখানে বিদ্যালয়ে যাওয়া বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুকে পরিবার থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি। কেন না তাতে অঙ্গনওয়াড়ি থেকে তবু যা দু-এক মুঠো খাবার মেলে তা আর মিলবে না।

মেদিনীপুরের একটি গ্রামের (যেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় একই চত্বরে অবস্থিত) উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যে কেবল অল্প ও অত্যন্ত খারাপ খাবার দেন তাই নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পড়ানো, খেলাধুলার বন্দোবস্তও করেন না। যাই হোক, ওই গ্রামের বিদ্যালয় শিক্ষক স্বীকার করেন যে অঙ্গনওয়াড়িতে কিছু সুবিধা আছে। বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স না হওয়া শিশুদের (মা-বাবা'রা যাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পাঠান) অঙ্গনওয়াড়িতে জায়গা মেলে।

এটা যেমন সুবিধের দিক, অসুবিধের দিক হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জায়গার অভাব। "তবু অঙ্গনওয়াড়িদের জন্য একটা ঘর ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে" এবং "অঙ্গনওয়াড়ির বাচ্চাগুলো বড় চেঁচায়, স্কুলের কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।"

অঙ্গনওয়াড়ির কাজের ভালমন্দ

বহু উত্তরদাতা অঙ্গনওয়াড়ির কাজকর্মে খুশি নন, কেউ কেউ এগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন করেন ("ওরা নিজেরাই মূর্খ, বাচ্চাদের কী পড়াবে?" বা, "নিজেরা খিচুড়ি রাঁধে, নিজেরা খায়")। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। হেট জারগো গ্রামের এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অভিযোগ, তাঁদের ৩ কেজি করে চাল আর ৭৫০ গ্রাম করে ডাল বরাদ্দ করা হয় (শিশুর সংখ্যা ১৫০-র কম নয়)। "এভাবে কি কিছু করা সম্ভব? একটা পথ বাতলাতে পারেন?"

২.৫.২ অঙ্গনওয়াড়ির কাজকর্ম

ভাল	১৩ (৪০.৬৩)
খারাপ	১১ (৩৪.৪৭)
জানি না	৮ (২৫.০০)
মোট উত্তরদাতা	৩২ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

আমরা বিভিন্ন গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। চারটি গ্রাম বাদ দিলে বাকিগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আমাদে সাগ্রহে সাহায্য করেছেন – ওঁরা আমাদের শিশুদের পরিবারের তালিকা দিয়েছেন, কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সাথে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। ১২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দুটিতে আমরা কর্মীদের কিছু কিছু অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ – মূলত খেলাধুলা করানো – দেখেছি। অন্য দশটি গ্রামের কর্মীরা জানিয়েছেন তাঁদের প্রধান কাজ রান্নাবান্না করা এবং খাবার বিলি বন্দোবস্ত করা এবং হিসেব নথিভুক্ত রাখা।

অনেক কর্মী অভিযোগ করেন যে, মা-বাবা'রা অঙ্গনওয়াড়িতে শিশুদের পাঠান না। দুটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হাজিরা নিয়ে অভিযোগ শুনেছি। "আমরা মাত্র ২ জন, আমাদের ১৫০টি বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হয়", একজন কর্মী নালিশ জানান।

এক গ্রামে আমরা দুই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে প্রকাশ্যে হাতাহাতি করতে দেখি। একে অন্যের দিকে গালিগালাজের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন, "তুঁই চুরি কইরেঁছিস্, তুঁই চোর বঠি"।

২.৬ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর মধ্যে কী আদৌ তুলনা সম্ভব? রাজ্যে ৫২,৩৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। বাড়ি (যতই খারাপ অবস্থা হোক না কেন), যোগ্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক (সংখ্যায় যতই কম হোন না কেন), অন্যান্য পরিকাঠামো এবং সব থেকে বড় কথা, একটি দীর্ঘ ইতিহাস সমেত। অন্যদিকে গোটা রাজ্যের মধ্যে মোট ১১,০০০ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কেবল গৃহহীন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকহীন নয় - - বেশির ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অভিজ্ঞতাও খুব বেশি হলে মাত্র তিন বছর।

যে ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আমরা ঘুরেছি তার বহু সহায়িকাই জানেন না যে তাঁদের প্রশাসনের দায়িত্ব কোন বিভাগের হাতে। কেউ কেউ জানেন না, তাঁরা কোথা থেকে মাইনে পান। কিছু সহায়িকা মনে করেন যে তাঁদের অতি সত্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হবে (শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হবে এবং তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমান বেতন পাবেন)। অনেক মা-বাবা'র ধারণা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বোধহয় বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স না হওয়া বাচ্চাদের জন্য তৈরি এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মধ্যে কোনও তফাত নেই।

কোনো কোনো অভিভাবক এবং হেট জারগো গ্রামের আর এক অভিভাবক মনে করেন যে "সহায়িকারা তাঁদের বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ খাবার খেয়ে ফেলছে।" এই অভিযোগ সম্পর্কে সহায়িকারা অসহায়ভাবে অবহিত -- গত দু বছর ধরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালিয়েও তাঁরা এখনও মাইনে পাননি। "খাবার তো দূরের কথা, আমাদের কোনও স্কুলবাড়ি নেই, এমন কী ব্ল্যাকবোর্ডও নেই।" এক সহায়িকা হতাশার সঙ্গে জানান।

কিছু মা-বাবা'র ধারণা স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রশ্রয়ে সহায়িকা শুকনো খাদ্যের 'রেশন' নিয়ে কিছু একটা 'দু-নম্বরি' করছেন। "ইশকুলে চাল দিবে, ইথায় দিবেকনি ক্যানে?"

এত সব ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও, পুরুলিয়ার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ এবং বীরভূমের একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়া আমাদের সমীক্ষাকৃত সব ক'টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রই মাতা-পিতাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

যখন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গ্রামের ভিতরে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়াটা কষ্টকর, তখন শিশুরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই যায়। যাই হোক যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেশি দূরে নয়, তার সাথে অন্য শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তুলনা চলে না। এই সব গ্রামের বিশেষ করে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, মূলত উৎসাহবর্ধক প্রকল্পের জন্য।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর প্রতি আকর্ষণ কেবলমাত্র কম দূরত্বের জন্য নয়। কিছু গ্রামের উত্তরদাতা -- কেউ কেউ অত্যন্ত গরিব -- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত উৎসাহবর্ধক প্রকল্পগুলি না পেয়েও খুশি। যেহেতু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার মান "অনেক ভাল"।

গুণমানের দিক থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যে ভাল করছে এ কথা কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকও স্বীকার করেন। উত্তরদাতাদের অভিমত গুণমানের পার্থক্যের তিনটি প্রধান কারণ হল :

(১) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে অল্প ছেলেমেয়ে, অল্প ক্লাস (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্লাস-১ ও ২) এবং প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকার সংখ্যা ২ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়পড়তা ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫০:১, যেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ওই অনুপাত ২৪:১। পরিদৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তি হয় গড়ে ১২৮ জন। সংখ্যাটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৫৩।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরি পাকা, যেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাদের চাকরির নবীকরণ যেহেতু কৃতিত্ব-নির্ভর তাই তাঁরা সারাক্ষণ চাকরি হারানোর ভয়ে থাকেন। গ্রামবাসী দ্বারা গঠিত একটি কমিটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজের ভালমন্দ খতিয়ে দেখে এবং এই কমিটি মারফত সহায়িকাদের মাইনে হয়।

(৩) সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিই মহিলা-চালিত এবং উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশের মতে ওঁরা পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় শিশুদের বেশি যত্ন নেন। "ওঁরা মায়ের মতো"। শিশুরা ওঁদের ভয় করে না বরং বেশি কাছে যায় বলে বহু উত্তরদাতা জানান।

পরিকাঠামোর দিক থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয়। তাদের যে কেবল নিজেদের বাড়ি নেই তাই নয়, পাঠ্যপুস্তক বন্টনের সময়েও তাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আর কোনও উৎসাহবর্ধক প্রকল্প চালু নেই। সহায়িকাদের বেতন বড়ই কম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের পাঠক্রম এক হওয়া সত্ত্বেও। সহায়িকারা বেতন পান মাসে মাত্র ১০০০ টাকা। বিদ্যালয় শিক্ষক/ শিক্ষিকারা এর পাঁচগুণ বা আরও বেশি মাইনে পান। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বেতন অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়। সব সহায়িকাই বলেছেন, পাঁচ-ছ মাস অন্তর তাঁরা মাইনে পান (বেতন যেহেতু চেক-এ দেওয়া হয়, ব্যাঙ্ক তাই সংগ্রহ মূল্য বাবদ ৬০ টাকা কেটে নেয়)।

কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা এই মাইনেতেই খুশি -- তাঁরা নিজেদের গৃহবধু মনে করেন, মাইনেটা তাঁদের কাছে 'বোনাস'। অন্যরা (বিশেষ করে যাঁরা দু বছরের বেশি কাজ করছেন তাঁরা) এই বেতনে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। "আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে ভাল পড়াতে পারি", এক সহায়িকা রাগের সঙ্গে বলেন। "যদি আমাদের শিশুদের জন্য ঠিকঠাক বসার জায়গা আর বই পাওয়া যায়, আর আমরা সহায়িকারা আরও ভাল মাইনে পাই।" (নিচে দেওয়া তথ্য থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের একটা তুলনামূলক ছবি ফুটে উঠবে)।

শিক্ষকদের কার্য নিষ্পাদন

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মাতা-পিতাদের মধ্যে ৫৩.৮৪ শতাংশ যেখানে শিক্ষকদের কাজে সন্তুষ্ট, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা মাত্র ৪০.৬৭ শতাংশ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট মাতা-পিতাদের সংখ্যাও অনেক কম।

জবাবদিহি

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার মাত্রাটা যথেষ্ট বেশি। অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক সম্পর্কে অবহিত ও উপস্থিত অভিভাবকের সংখ্যা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। হয়তো এটি একটি প্রধান কারণ যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়ার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উচ্চবর্গদের সঙ্গে নিম্নবর্গদের একটি তফাত গড়ে রেখেছে, যার ফলে অনেকে এখানে আসতে সংকোচ বোধ করেন। "নঁড়ে দো সানাম আবো হড়" – এখানে সবাই নিজের লোক। মেদিনীপুরের সোতের-ডাঙ্গা গ্রামের এক উত্তরদাতার এমনই প্রতিক্রিয়া। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বৈঠকে মহিলারাও উপস্থিত থাকেন।

৭৭ শতাংশ মাতাপিতা জানান যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উন্নতিবিধানে তাঁরা অনেক কিছু করতে পারেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৬২ শতাংশ। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মাতাপিতা বলেছেন যে তাঁদের বাচ্চাদের উপস্থিতি তাঁরা বাড়াতে পারেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের বেশির ভাগ মাতাপিতা কিন্তু এতেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উন্নতিবিধানে টাকা-পয়সা ও শ্রম দান করেছেন।

যাই হোক শিশুদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় আর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তেমন কোনও পার্থক্য দেখা যায়নি। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা এই খারাপ উপস্থিতির জন্য খারাপ পরিকাঠামোকেই দায়ী করেন। "এই দ্যাখো গোহাল ঘর, কত বড় বড় ধড়া (গর্ত), বাচ্চাগুলা বসবে (বৃষ্টির দিনে) কুথা?" বীরভূমের ছাতিনা গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা পার্বতী কোঁড়া ক্লাসঘর দেখিয়ে অভিযোগ করেন। সমস্ত সহায়িকারা এই অভিযোগ করেন, "মা-বাবা ছেলেমেয়েদের এখানে পাঠান না, কেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কাদায় বসে পড়া করতে হয়।"

মা-বাবার ধারণা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার উন্নতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। গৃহশিক্ষকতা বা বাড়িতে সাহায্য পাওয়ার দিক থেকেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তফাত আছে। প্রাইভেট টিউশন নেওয়া ছেলেমেয়েদের প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা। একইভাবে, ঘরে লেখাপড়ায় সহায়তাও মেলে প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। এর প্রধান কারণ হল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জনতাত্ত্বিক গঠন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বর্ণের, শ্রেণির। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তফসিলী জাতি/জনজাতির এবং খেতমজুর পরিবার থেকে আসা শিশু। তাদের প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার ক্ষমতা নেই (দারিদ্র্যের জন্য) এবং বাড়িতেও সাহায্য পায় না (তাদের পরিবারের সাধারণভাবে শিক্ষার হার কম)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং রাজনীতি

প্রাথমিক বিদ্যালয়-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে সাধারণভাবে সবাই সরব। আমাদের উত্তরদাতারা, যেমন মনে করেন, রাজনীতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান-এর অবনতির জন্য বড় ভূমিকা নিয়েছে; শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকেও রাজনীতির বাইরে রাখা যায়নি। ঘুরে দেখা ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৭টিতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে স্থানীয় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। দৃষ্টান্ত, বীরভূমের একটি গ্রামের কাছাকাছি তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার ৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৫টি এমন সব গ্রামে অবস্থিত যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে (একটি ক্ষেত্রে তো আমরা তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছি)। এক্ষেত্রেও একই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এরকম একটি গ্রামে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রও আছে, আমাদের সমীক্ষার আগের দু-মাস ধরে সেটি বন্ধ ছিল (বক্স নং ১০ দ্রষ্টব্য)। শোনা গেছে ওখানকার সহায়িকারা শুধু জেলার প্রভাবশালী এক নেতার গ্রামের বাসিন্দাই

নন, তাঁর আত্মীয়াও বটে।

সিপিআই(এম) এর এক আঞ্চলিক সম্পাদকের কথা মানলে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা ইতিমধ্যেই স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন অথবা শিগগিরই পড়বেন। পঞ্চায়েতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কারণে মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে এবং এঁদের অনেকে এমন জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়দের আদেশ অমান্য করা যায়। সহায়িকারা এইসব মেয়েদের মতামত সংগঠিত করতে সাহায্য করবেন।

ভি.ই.সি.-গুলির মতোই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেও রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা সমপরিমাণে সক্রিয় হয়েছে। পুরুলিয়ার এক পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য স্বীকার করলেন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি "নিজেদের লোক দিয়ে কমিটি গঠন করবেই"। পুরুলিয়ায় আমরা এ-রকম একটি কমিটি দেখেছি।

শিক্ষা, রাজনীতি ও ক্ষমতা

পুরোপুরি শবর জাতির লোকেদের গ্রাম কুলটাড়ে খুব কম লোককেই পাওয়া গেছে যাঁদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার মতো ন্যূনতম অভিজ্ঞতা রয়েছে। টোলাটিতে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্র একজন। তিনি অন্যদের জন্য চিঠিপত্র লিখে দেন ও পড়ে দেন। তিনিই স্থানীয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কমিটির সভাপতি।

একজন শিক্ষিত সাঁওতাল এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি শুরু করেন এবং পরে তাঁকে বলা হয় যে সরকারী নিয়মানুযায়ী দিদিমণিরাই এটি চালানোর জন্য নিযুক্ত হবেন। এইভাবে অন্য একটি গ্রাম থেকে দু'জন সহায়িকাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সহায়িকাদের গ্রামটিতেই একজন ক্ষমতাশীল নেতার বসতবাড়ি এবং সহায়িকাদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্বন্ধ রয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানালেন যে দু'জন সহায়িকাই অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে কেন্দ্রটিতে আসেন। এছাড়া তাঁরা আরো বলেন যে, আমাদের পরিদর্শনের দু'মাস আগে থেকেই সহায়িকারা কেন্দ্রে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমরা যখন গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছিলাম তখন একজন সহায়িকা মাথায় একটি ঝুড়ি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এলেন। কুলটাড়ের কাছে তিনি তাঁর ধান জমিতে বীজতলা ওঠাচ্ছিলেন। তিনি জানালেন যেহেতু সেটা চাষের সময় তাই তাঁরা ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছেন (সমস্ত সমীক্ষাকৃত জেলাতেই এবং সম্ভবত সারা রাজ্যেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্জিকা মেনে চলে) এই সময়ে অন্য কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে চাষের ছুটি চলছিল না। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী দু'মাস ধরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ছিল বলে জানা গেলেও সহায়িকারা দাবি করলেন যে পরিদর্শনের মাত্র ১৫ দিন আগে থেকেই ছুটি ঘোষণা করেছেন। খেপে থাকা গ্রামবাসীরা তাঁর মুখের উপরই বললেন, "মিছা কথা বইলছে হে"।

আমরা স্কুলের উপস্থিতি খাতা দেখতে চাইলে সহায়িকাটি বললেন যে সেটি তাঁরা নিজের বাড়িতে রেখেছেন কারণ, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সেটি রাখার মতো কোন নিরাপদ জায়গা নেই।

আমরা যখন তাঁর সঙ্গে তাঁদের গ্রামে গেলাম সেখানে অন্য একজন সহায়িকা একটি মিটিং-এর প্রস্তাব সম্বলিত কাগজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। এটি ছিল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের

মিটিং-এর প্রস্তাব যাতে তিনি কমিটির সদস্যদের এবং এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের সই সংগ্রহ করছিলেন।

প্রকৃত কোনও মিটিং হয়নি। কিন্তু অর্থ সাহায্য পেতে গেলে কাগজপত্র তৈরি রাখা দরকার (কুলটাঁড়ের ভদ্রলোক আমাদের জানান যে সহায়িকারা মাঝে মাঝে তাদের কাছে কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে যান)।

দু'জন সহায়িকাই জানালেন যে তাঁরা এক বছরের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রটি চালিয়ে আসা সত্ত্বেও মাইনে হিসেবে একটি পয়সাও পাননি। একজন সহায়িকা বললেন তাঁরা এই কারণে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন (যদিও কুলটাঁড় গ্রামে বলেছিলেন তাঁদের চায়ের ছুটি চলছে)। আরো বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। উপস্থিতি খাতাতে দু'জন সহায়িকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি নথিভুক্ত করা আছে দেখা গেল। এমন কি আমাদের পরিদর্শনের দিনটির (১০.৭.২০০১) জন্যও উপস্থিতির হিসেব পাওয়া গেল! উপস্থিতি দেখানো হয়েছিল শতকরা ৯০ শতাংশ! আমাদের দেখা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে অত্যন্ত খারাপভাবে চলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র একমাত্র এইটি। অন্য কয়েকটি দুর্বলতা সম্পন্ন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র দেখতে পাওয়া গেলেও এদের মতো কোনওটাই তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এলাকার প্রাথমিক স্কুলটিও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটির থেকে অন্যরকম নয়। এর নিজস্ব কোনও বাড়ি নেই। এতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ২১, যার মধ্যে পরিদর্শনের দিন উপস্থিত ছিল মাত্র ৪ জন। এখানকার শিক্ষক একজন মাহাতো এবং ছাত্র-ছাত্রী খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়ের।

পর্ব : ৩

৩.১ রাজ্য ও জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান

৩.১.১ একনজরে পশ্চিমবঙ্গ

মোট জনসংখ্যা (২০০১)	৮,০২,২১,১৭১
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯০৪ জন (১৯৯১-এ ৭৬৬ জন)
নারী/পুরুষ অনুপাত	৯৩৪ (১৯৯১-এ ৯১৭)
জনসংখ্যার দশকিয়া বৃদ্ধি (১৯৯১-২০০১)	১৭.৮৪ শতাংশ
জনসংখ্যার দশকিয়া বৃদ্ধি (১৯৮১-১৯৯১)	২৪.৭৩ শতাংশ
০-৬ বছর বয়সসীমার জনসংখ্যা	১,১১,৩২,৮২৪ (১৫.৪২ শতাংশ)
নিরক্ষরদের সংখ্যা	২,১২,৬৬,৫৯০
নিরক্ষর সংখ্যার দশকিয়া হ্রাস	২৬,৩৯,৬৮১
জাতীয় স্তরে নিরক্ষরতা হ্রাসে শতাংশ অবদান	৮.২৬ শতাংশ
জাতীয় স্তরে নিরক্ষরতা হ্রাসে শতাংশ অবদানে যে সব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আগে	অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬.৭৯), উত্তরপ্রদেশ (১৪.০৯), মহারাষ্ট্র (১২.৪৮), রাজস্থান (১১.৪৬), মধ্যপ্রদেশ (১১.৪৩), তামিলনাড়ু (১০.৬৬),
পুরুষ নিরক্ষরতার সংখ্যা	৮০,৩১,৭৯২
জাতীয় স্তরে পুরুষদের নিরক্ষরতা হ্রাসে শতাংশ অবদান	৭.০৩ শতাংশ
জাতীয় স্তরে পুরুষদের নিরক্ষরতা হ্রাসে শতাংশ অবদানে যে সব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আগে	উত্তরপ্রদেশ (১৯.৪৬), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩.৫৯), মধ্যপ্রদেশ (১২.৪২), রাজস্থান (১১.৩৭), তামিলনাড়ু (৭.০৯),
নারী নিরক্ষরদের সংখ্যা	১,৩২,৩৪,৭৯৮
জাতীয় স্তরে নারী নিরক্ষরদের হ্রাসের শতাংশ অবদান	১০.৭৭ শতাংশ
জাতীয় স্তরে নারী নিরক্ষরদের হ্রাসের শতাংশ অবদানে যে সব রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আগে	অন্ধ্রপ্রদেশ (২৩.৩২), মহারাষ্ট্র (১৯.১৪) তামিলনাড়ু (১৭.৯৩), মধ্যপ্রদেশ (১১.৫৩)
৩৫টি ভারতীয় রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান	১৮

৩৫টি ভারতীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুরুষদের সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান	১৯
৩৫টি ভারতীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নারীদের সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান	১৯

(সূত্র : প্রভিশনাল পপুলেশন টোটালস্, পেপার ১, অফ ২০০১, সেনসাস অব ইন্ডিয়া, ২০০১)

৩.১.২ এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ (সাক্ষরতার অবস্থা) [১৯৯১]

১৫-৩৫ বছর বয়সসীমায় নিরক্ষরদের শতাংশ	৩১ শতাংশ
তফসিলী জাতি জনসংখ্যায় সাক্ষরতার অবস্থা	৪২.২১ শতাংশ
তফসিলী জনজাতি জনসংখ্যায় সাক্ষরতার অবস্থা	২৭.৭৮ শতাংশ

(সূত্র : সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯১)

৩.১.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক গঠন

গ্রামের সংখ্যা	৩৭,৭৩৩
লোকালয়ের সংখ্যা	৯৬,৫১১
সমাজ উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা	৩৪১
নগর এলাকার সংখ্যা	৩৮২
তফসিলী জাতি প্রধান জেলার সংখ্যা	৭
তফসিলী জনজাতি প্রধান জেলার সংখ্যা	৩
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা (৩০.৯.২০০০ পর্যন্ত)	৫২,৩৮৫

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.৪ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০০ পর্যন্ত ইস্কুলে ভর্তির হিসাব (লাখে)

মোট ভর্তি	বালক	বালিকা	তফসিলী জাতি		তফসিলী জনজাতি	
			বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
৮৪.৯৪	৪৩.৯৩	৪১.০১	১২.৫৫	১১.৩৭	২.৬৯	২.২৮

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.৫ লোকালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব

এক কিলোমিটারের ভিতরে	৮৪,৬৩৬
১-২ কিলোমিটারের ভিতরে	৯,৯৪০
২ কিলোমিটার ছাড়িয়ে	১,৯৩৫

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.৬ বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা

কোনও ক্লাসঘর নেই	১,৩৮৪
একটি মাত্র ক্লাসঘর	১২,০৫৪
দুটি ক্লাসঘর	১,২৮৫
তিনটি ক্লাসঘর	৬,১৩৫
চারটি ক্লাসঘর	৬,৭৫৯
চারটির বেশি ক্লাসঘর	৬,৮৯৫
মোট	৩৪,৫১২*

* সূত্র ঃ (সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) টীকা : সারণী ৪-এ দেওয়া মোট বিদ্যালয় সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যা মেলে না। মনে হয় সারণীতে ছাপার বা সারণীবদ্ধ করার সময় কোনও ভুল হয়েছে।

৩.১.৭ ভর্তির হার (১৯৯৭-৯৮)

মোট ভর্তির হার	৮৫.৬ শতাংশ
নেট ভর্তির হার	৪০.২ শতাংশ
নেট উপস্থিতি	৬৬ শতাংশ

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.৮ স্কুলছুটের হার (১৯৯৭-৯৮)

বালক	৩৫.৮ শতাংশ
বালিকা	৪১.৩ শতাংশ
মোট	৩৮.৪ শতাংশ

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.৯ ভর্তির ধার্য লক্ষ্য (ক্লাস ১-৪)

২০০২-০৩	৮৯.০০ শতাংশ
২০০৩-০৪	৯১.২৫ শতাংশ
২০০৪-০৫	৯৩.২৫ শতাংশ
২০০৫ - ০৬	৯৫.২৫ শতাংশ
২০০৬ - ০৭	৯৮.০০ শতাংশ

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.১০ ১০ম যোজনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধার্য লক্ষ্য

বছর	নতুন বিদ্যালয়	অতিরিক্ত ভর্তি যা এর মধ্যে পড়বে	নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন	অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক	প্রতি গ্রেডের জন্য একজন শিক্ষক হিসাবে বাড়তি শিক্ষক
২০০২-০৩	২,০০০	২ লাখ	৮০০	৭,৫০০	৫,২০০
২০০৩-০৪	১,২০০	১.২ লাখ	৪,৮০০	৪,৫০০	৫,২০০
২০০৪-০৫	১,০০০	১ লাখ	৪,০০০	৩,৭৫০	৫,২০০
২০০৫-০৬	১,০০০	১ লাখ	৪,০০০	৩,৭৫০	৫,২০০
২০০৬-০৭	৪০০	০.৪০ লাখ	১,৬০০	১,৫০০	৫,২০০

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.১১ শিক্ষকদের সংখ্যা

পুরুষ	নারী	মোট
১,১৮,০৩৫	৩৮,২২০	১,৫৬,২৫৫

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

* তিন সমীক্ষা-জেলার নির্বাচিত পরিসংখ্যান

৩.১.১২ জনসংখ্যা-বিষয়ক

জেলা	বর্গ কিমি ভৌগোলিক আয়তন	জনসংখ্যা ২০০১			জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১–২০০১	জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০০১	নারী পুরুষ আনু-পাতিক হিসাব (২০০১)	তফসিলী জাতি জনসংখ্যা শতাংশ হিসাব (২০০১)	তফসিলী জনজাতি জনসংখ্যা শতাংশ হিসাব (২০০১)
		মোট	পুরুষ	নারী					
বীরভূম	৪৫৪৫	৩০১২৫৪৬	১৫৪৫৭৬৫	১৪৬৬৭৮১	১৭.৮৮	৬৬৩	৯৪৯	৩১	১০
মেদিনীপুর	১৪০৮১	৯৬৩৮৪৭৩	৪৯২৯০০০	৪৭০৯৪৭৩	১৫.৬৮	৬৮৫	৯৫৫	–	–
পুরুলিয়া	৬২৫৯	২৫৩৫২৩৩	১২৯৮০৭৯	১২৩৭১৫৪	১৩.৯৬	৪০৫	৯৫৩	১৯	১৯
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮৭৫২	৮০২২১১৭১	৪১৪৮৭৬৯৪	৩৮৭৩৩৪৭৭	১৭.৮৪	৯০১	৯৩৪	–	–

৩.১.১৩ সাক্ষরতা

জেলা	২০০১ সালে সাক্ষরতায় স্থান (বন্ধনীতে রইল ১৯৯১ হার (১৯৯১-২০০১) এর পরিসংখ্যান	সাক্ষরদের সংখ্যা			সাক্ষরতার হার (২০০১)	সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার (১৯৯১-০১)
		মোট	পুরুষ	নারী		
বীরভূম	১৪ (১১)	১৫৭৪৯১৫	৯৩২১৬৭	৬৪২৭৪৮	৬২.১৬	১৩.৬
মেদিনীপুর	৫ (২)	৬২২৭২৯৪	৩৬১০৩২৯	২৬১৬৯৬৫	৭৫.১৭	৫.৮৫
পুরুলিয়া	১৫ (১৫)	১১৯৯৩৫৭	৮১২৫৬৮	৩৮৬৭৮৯	৫৬.১৪	১১.৮
পশ্চিমবঙ্গ		৪৭৮২১৭৫৭	২৭৭৮৪৭৫০	২০০৩৭০০৭	৬৯.২২	১১.৫২

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.১৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভর্তি

জেলা	প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট ভর্তি			বিদ্যালয় পিছু গড়ে ভর্তি	তফসিলী জাতির শিশুদের ভর্তি			আদিবাসী শিশুদের ভর্তি		
		বালক	বালিকা	মোট		পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
বীরভূম	২৩৩৪	১৮৪৩৭৭	১৭৩১৭০	৩৫৭৫৪৭	১৫৩.১৯	৬৩৩৭৭	৫৮০১৮	১২১৩৯৫	১৪২১৮	১১৬৬১	২৫৮৭৯
মেদিনীপুর	৯৬২২	৪৮৮৪৬৬	৪৬২০৬৯	৯৫০৫৩৫	৯৮.৭৯	--	--	--	--	--	--
পুরুলিয়া	২৯২৪	১৪৬৬৬৪	১২০৫২৫	২৬৭১৮৯	৯১.৩৭	৩১৮৬৬	২৪৪৭৪	৫৬৩৪০	৩১৫৭৮	২৪৩৭৯	৫৫৯৫৭

(সূত্র : ডি.আই (প্রাথমিক নিদ্যালয়). অফিস, মেদিনীপুর; ডি.আই.এস.ই., বীরভূম ও পুরুলিয়া; ডি.পি.ই.পি., ২০০c-০১)

৩.১.১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা

জেলা	প্রাথমিক শিক্ষকদের সংখ্যা			তফসিলী জাতির প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা			তফসিলী জনজাতির প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা			ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক	শতাংশ সংখ্যা
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট			
বীরভূম	৬৫২৬	১১৪৯	৭৬৭০	১২১৩	১৪০	১৩৫৩	৩১০	৫২	৩৬২	৪৬.২২	৩.২৮	১৪.৯৮
মেদিনীপুর	--	--	২২২৮৬	--	--	--	--	--	--	৪২.৬৫	২.৩১	১৯.০০
পুরুলিয়া	৫৬২৭	৫৬৪	১৯১	--	--	৭০৯	--	--	৬৮৬	৪০.১৫	২.১১	১০.০২

সূত্র : ডি.আই. (প্রাথমিক বিদ্যালয়) অফিস, মেদিনীপুর; ডি.আই.এস.ই., বীরভূম ও পুরুলিয়া; ডি.পি.ই.পি. ২০০০-০১

৩.১.১৬ বিদ্যালয় ভবন ক্লাসঘর

জেলা	বিদ্যালয় ভবন যেখানে কোন ক্লাসঘর নেই	১টি ক্লাসঘর	২টি ক্লাসঘর	৩টি ক্লাসঘর	৪টি ক্লাসঘর
বীরভূম	১৪৮	৫০৩	৮৬০	৪৪০	২৭৮
মেদিনীপুর	—	—	—	—	—
পুরুলিয়া	৫৫	—	—	—	—

সূত্র : ডি.আই.এস.ই., বীরভূম ও পুরুলিয়া, ২০০০-০১

৩.১.১৭ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি

জলা	এস.এস.কে সংখ্যা	শিশুদের সংখ্যা			তফসিলী জাতির শিশু সংখ্যা			তফসিলী জনজাতির শিশু সংখ্যা			সহায়িকা
		পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	
বীরভূম	৭৫৬	৭০৯৯	৬৫০৯	১৩৬০৮	২১৭৮	১৯৯৬	৪১৭৪	৪৯৩	৪৫২	৯৪৫	৭৫৬
মেদিনীপুর	র ১৪৫০	-	-	৬৩৪০৩	-	-	-	-	-	-	৩০২৬
পুরুলিয়	৯৭	১৮২২	১৬৭০	৩৪৯২	৩৫৩	৩২২	৬৭৫	৩৫১	৩২০	৬৭১	১১৫

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩.১.১৮ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ও সহায়িকা

জেলা	ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিকার অনুপাত	প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা
বীরভূম	১৮:১	১৮	১.০০
মেদিনীপুর	২১:১	৪৩:৭২	২.০৮
পুরুলিয়া	৩০:১	৩৬	১.১৮

(সূত্র : অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-০১, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ও জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক, মেদিনীপুর)

৩.২ গ্রামের রূপরেখা

১. গ্রাম - সূচপুর, ব্লক - নানুর, জেলা - বীরভূম

বোলপুর-নানুর রোডে খুজুটিপাড়া বাসস্টপ থেকে দুই কিলোমিটার দূরে এ গ্রামটির অবস্থান। মেঠো রাস্তা দিয়ে সড়কের সঙ্গে যুক্ত, বাই সাইকেলই যাতায়াতের প্রধান যান। রিকশা ভ্যানও আছে। গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম বসতিপূর্ণ এবং বিশাল সংখ্যক পরিবার (১৬২টির মধ্যে ১৫০টি) খেতমজুরি ও অন্যান্য ধরনের মজুরি করে জীবন যাপন করেন। গ্রামে দুটি ছোট মুদির দোকান আছে। গ্রামটি খুজুটিপাড়া-নির্ভর। ওখানেই ডাকঘর, পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাইস্কুল আর কলেজ। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, যদিও খরচ বইতে না পারার কারণে খুব কম লোকেই বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ নিতে পেরেছেন। গ্রামে একটি পাবলিক টেলিফোনও আছে।

গ্রামের একপ্রান্তে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যেটি গ্রামটির খুব কাছাকাছি অন্য একটি মৌজায় অবস্থিত। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে কিছু শিশু যায়, কিছু যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রায় সব মা-বাবা'ই ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন নিতে পাঠান। কোনও উত্তরদাতাই স্বপ্নেও ভাবেন না যে তাঁদের ঘরের সন্তান শিক্ষাদীক্ষা পাবার পর সরকারি কাজ করবে। তবু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা তাঁদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

২০০০ সালের আগস্ট মাসে গ্রামে এক জমি-সংঘর্ষের পরিণতিতে বহিরাগত ১১ জনের হত্যাকান্ডের পরে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটনাটি গ্রামের লোকের কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ। "এই ঘটনার জেরে কম করে ৫০ জন লোকের চার্জশিট হয়েছে এবং আদালতে এখনও মামলা চলছে। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের লেখাপড়া শিখতে হবে", এক খেতমজুর জানান।

"গরিবদের বিলোনোর জমি-পাট্টা আমরা এখনও পাইনি। জমির মালিকরা কোলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে এসেছেন। সামনে একটা বড় লড়াই। শিক্ষা ছাড়া আমরা কি লড়তে পারব?"

প্রাথমিক বিদ্যালয়টির প্রধান সমস্যা শিক্ষক সংখ্যার ঘাটতি — একথা শিক্ষক ও পিতামাতা উভয়পক্ষই জানালেন। বিদ্যালয়ে ৩০০ জন ছাত্রকে মাত্র তিনজন শিক্ষক পড়ান।

পরিকাঠামো প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র - এ দুয়েরই গুরুতর সমস্যা। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের এখনো পর্যন্ত নিজস্ব একটা বাড়ি নেই। ওই হত্যাকান্ডের পর থেকে পুলিশ কর্মীরা স্কুল বিল্ডিংটি জুড়ে বসে আছেন।

"আমরা গাছতলায় পড়াই", বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন।

গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালান দুইজন সহায়িকা। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে মানুষের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ বলেন, "শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কাজ করবে যদি সেটিকে মিড-ডে-মিল প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ানো হয় ভাল, কিন্তু কিছু মা-বাবা উৎসাহবর্ধক প্রকল্পগুলি পাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান।

২. গ্রাম - মুইতিন, ব্লক - নানুর, জেলা - বীরভূম

সদর নানুর থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে, বীরভূমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই গ্রামটি। গ্রামটি ব্লক সদরের কাছে হলেও যাওয়া সোজা নয় -- ৪ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়।

গ্রামের জনবসতির ছকটা সরলরেখার মত। বড় রাস্তার পাশাপাশি লম্বালম্বি চারটি পাড়া অবস্থিত -- ডোমপাড়া, ঘোষপাড়া, মোড়লপাড়া এবং হাজরাপাড়া।

গ্রামে নানা জাতীর মানুষরা বসবাস করেন, ব্রাহ্মণ, সদগোপ, গোয়ালা, হাড়ি, ডোম, নাপিত, শুঁড়ি, বাগদি আর কোটাল। অবশ্য, গ্রামে প্রধানত বাস করেন উল্লেখিত প্রথম চার জাতির লোক।

ধান হল প্রধান ফসল। দো-ফসলা জমি। কুয়ো, টিউবওয়েলের জলই একমাত্র ভরসা। রবি শস্যেরও গ্রামের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান আছে। সরষে, গম, আলু ইত্যাদি হল গুরুত্বপূর্ণ রবিশস্য। গোয়ালা জাতের প্রধান রুজি সাবেকি দুধ বিক্রি। ব্রাহ্মণ, সদগোপের মধ্যে অল্প কয়েকজন সরকারি চাকরিও করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম মুইতিন-মশরা প্রাইমারি স্কুল। মুইতিন আর মশরা গ্রামের সীমায়, পূর্ব দিকে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। প্রাথমিক বিদ্যালয় আর অঙ্গনওয়াড়ি একই চত্বরে চলে। দুই গ্রামের বাচ্চারাই পড়তে আসে। স্কুলবাড়িতে দুটো ক্লাসঘর, তিনজন শিক্ষক। স্কুলের কোনও পাঁচিলও নেই, বাথরুমও নেই। বাড়িটার মেরামতি দরকার। এলাকায় লেখাপড়ার আর কোনও জায়গা নেই। স্থানীয় বেকার যুবকরা বাচ্চাদের টিউশন দেন। তাঁদের পারিশ্রমিক মাসে ন্যূনতম পঞ্চাশ টাকা।

বিদ্যালয় যদিও খোলা ছিল, তবু ডোম পাড়ার বাচ্চারা পুকুরে মাছ ধরছিল। কেউ কেউ বা গরু-ছাগল চরাচ্ছিল, আম বাগানে খেলে বেড়াচ্ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে বাচ্চারা কাছাকাছি তিন কিলোমিটার দূরে উচকরণের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

৩. গ্রাম - ইসলামপুর-ছোটলাইন পাড়া, ব্লক - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম

গ্রামটির চিহ্ন হল একটা ন্যারোগেজ লাইন (গ্রামটির নাম থেকেই সেটা বোঝা যায়)। পূর্ব রেলের বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ সেকশনের আহ্মদপুর স্টেশন ছাড়িয়ে এক কিলোমিটার দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামে ৫০০ ঘরের বাস।

গ্রামটি মুসলিম বসতিপূর্ণ, কিন্তু সূচপুরের মতো নয়। এখানে কিছু ঘর তফসিলী জাতি, বর্ণ হিন্দু এবং তফসিলী জনজাতিরও বসবাস আছে। মুসলমানরা হিন্দুপল্লীগুলিকে 'বাঙালিপাড়া' বলেন, আর বিপরীত দিকে তাঁদের পল্লীগুলোকে অন্যরা মুসলিম পাড়া বলেন। এখানকার মুসলমানরা সূচপুরের থেকে আলাদা, এঁরা বিহারের লোক। কেউ কেউ মুর্শিদাবাদ এবং অন্য কিছু জায়গা থেকে এসে এখানে নয়া বসতি গড়েছেন। ছোটখাটো ব্যবসা, ফিরিওয়ালাগিরি, বিড়ি পাকানো এবং অন্যান্য মজুরির কাজ করে দিন গুজরান করেন। এঁরা সম্পূর্ণ ভূমিহীন।

তফসিলী জাতির বাসিন্দারা খেতমজুর, কারো কারো অল্প দুয়েক বিঘে জমিও আছে। মূলত খেত মজুর হলেও অন্য ধরনের কাজও যেমন, ঝাড়ুদারি, ধোয়ামোছা, ঝুড়ি তৈরি, বিড়ি বানানো, মুচির কাজও করেন। বর্ণহিন্দুরা কৃষক এবং চাকরিজীবি।

গ্রামের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ভিতর তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমরা প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের (ইসলামপুর প্রাইমারি স্কুল) প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিই। তাঁর অধীনে তিনজন – দু'জন মহিলা এবং একজন পুরুষ-শিক্ষক আছেন। স্কুলের দুটো পাকাঘর, একটা বাথরুম এবং পানীয় জলের জন্য একটা হাত-চলা পাম্প আছে। লাগোয়া একটা ছোট মাঠ আছে। তাও ছেলেমেয়েদের হাজিরা ভাল নয় বলে এক শিক্ষক জানান। তিনি বাবা-মাকে দোষ দেন। আর বাবা-মা'রা ভাল না পড়ানোর জন্য দোষ দেন শিক্ষকদের। "আমি কোত্থেকে প্রাইভেট টিউশনের টাকা পাবো? আমরা সবাই খুব গরিব লোক", বাবু মিঞা বলেন। শিক্ষকরা অনিয়মিত আসেন, যান। পড়ানোর দিকে যত্ন নেননা।

গ্রামের কাছাকাছি তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। জানা গেছে, স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা এই কেন্দ্র অনুমোদন করিয়েছেন যাতে তাঁর স্ত্রী চাকরি পান। এ অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সূচপুরের মতো এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি ভাল কাজ করে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সহায়িকারা নিয়মানুবর্তী নন, ভালভাবে পড়ানও না।

৪. গ্রাম - গড়গড়িয়া, ব্লক - সাঁইথিয়া, জেলা - বীরভূম

সিউড়ি-বোলপুর প্রধান সড়কের ধারে এই গ্রাম। ডাকঘর, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রেশন, মুদি আর ওষুধের দোকান সবই এই গ্রামের ভিতরে।

গ্রামে ৩০৬ ঘরের বসতি। ব্রাহ্মণ, সদগোপ, কুমোর, বানিয়া, বৈষ্ণব, কৈবর্ত, ডোম, বায়েন, মাল (শেষ তিন গোষ্ঠী তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের) মিলিয়ে গ্রামটির চেহারা পাঁচমিশালি। মুসলমান আছেন মাত্র তিন ঘর।

গ্রামে চাষী, খেতমজুর, ব্যাপারী ছোট ব্যবসাদার, চাকুরীজীবি, ধীবর, ঝুড়িওয়ালা, চর্মকার সব রকমের জীবিকার মানুষজনই রয়েছেন।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুইটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি বায়েনপাড়ায়। উচ্চ ও মধ্য বর্ণের হিন্দুরা সেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠান না। "ডোম বায়েনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসতে হবে" বলে কিছু উঁচু জাতের অভিভাবক ছেলেমেয়েদের গ্রামের বাইরে আরও ভাল বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠালেও, একজন ডোমের পক্ষে সন্তানকে প্রাথমিক স্তরের উপরে লেখাপড়া শেখানো অলীক স্বপ্ন মাত্র। এমন কী প্রাথমিক স্তর অবধি সন্তানের লেখাপড়া হওয়া সুনিশ্চিত করতে পারেন না অনেকেই। তফসিলী জাতির মধ্যেও বর্ণ হিন্দুদের সামাজিক ও আর্থিক বিভেদের মনোভাবটা প্রতিফলিত। কৈবর্তের কাছে ডোম অচ্ছুৎ। শিক্ষার তারতম্যেও এই বিভেদ প্রতিফলিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট তিনজন শিক্ষক আছেন। দুইজন পুরুষ, একজন নারী। স্কুলবাড়িটা ভাল। তিনটে ক্লাসঘর আছে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কোনো নিজস্ব বাড়ি নেই। বায়েন পাড়ার এক গৃহস্থের বাড়ির বারান্দায় বসে। সহায়িকাদের বেতন আসে অনিয়মিত। যাই হোক, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ভালই কাজ করে এবং বহু বাবা-মা'ই তাঁদের কাজে খুশি। বাবা-মা'রা বিশেষ করে বর্ণহিন্দু এবং ব্রাহ্মণ ঘরের বাবা-মায়েরা জানান, গ্রামে বহু শিক্ষক মানুষ আছেন। তাঁরা বিদ্যালয় যাতে ভালভাবে কাজ করে সেদিকে নজর রাখেন। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ভাল কাজ করে।

৫. গ্রাম - ছাতিনা, ব্লক - রাজনগর, জেলা - বীরভূম

সিউড়ি-রাজনগর সড়কের থেকে ২.৫ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামখানি। বাস স্টপ পদমপুর। গ্রামটিতে ৬২টি পরিবারের বাস। বাসিন্দারা সাঁওতাল এবং কোঁড়া। অধিকাংশই গরীব এবং আদিবাসী। এঁরা পাশের দিকুদের গ্রামে আর রাজনগর বাজারে জনমজুরি খাটা লোক। কিন্তু একঘর সম্পন্ন সাঁওতাল আছেন। ৭০ বিঘের মতো জমির মালিক তাঁরা। সে বাড়ির ছেলেপুলেরা গ্রামের বাইরে পড়ে।

এ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বাধা অভাব। উত্তরদাতারা বলেন, "এমন কী স্লেট-পেনসিল কেনার পয়সাও আমাদের নেই"।

গ্রামে কোনো ডাকঘর বা রেশনের দোকান বা অন্য কোনও দোকান নেই। কয়েকটা টিউবওয়েল আছে। গরমকালে শুকিয়ে যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছাতিনা থেকে সিকি কিলোমিটার দূরে গুলালগাছিতে। যদিও ছাতিনার নামেই বিদ্যালয়ের নাম। স্কুলটি একটি পাকা বাড়িতে বসে। দুটো ক্লাসঘর। বাথরুম বা খেলার মাঠ নেই। গরমকাল ছাড়া পানীয় জলের সমস্যা নেই। একটা টিউবওয়েলের জল খাওয়া হয়। কিন্তু গরমকালে সেটা প্রায়শই শুকিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের চারটি ক্লাস চালান দুজন (পুরুষ) শিক্ষক।

ছাত্রদের মধ্যে আছে বর্ণহিন্দু, মুসলিম, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি ঘরের ছেলেমেয়েরা। শিক্ষকদের ধারণা শেষোক্ত তিন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই স্কুলে বেশি কামাই করে এবং স্কুল ছাড়েও বেশি।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বসে এক গ্রামবাসীর বাড়ির বারান্দায়। পঞ্চায়েত সমিতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চলছে। কিন্তু দুই সহায়িকা এখনও মাইনে পাননি। তা ছাড়া খাতা পেনসিল কাগজপত্র, স্লেট কালি কলম, কেনবার জন্য কোনও অর্থ আসেনি তাঁদের কাছে।

"নিজেরা খরচা করেছি" — সহায়িকা ও গ্রামবাসিনী পার্বতী কোঁড়া নিজের পয়সা খরচ করে পড়াবার সরঞ্জাম কেনার কথা শোনালেন।

গ্রামের ওই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্যই ভৌগোলিক এবং সামাজিক দূরত্ব পার করে গ্রামের কচিকাঁচারা বুনিয়াদি শিক্ষা নিতে পারছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের কাছে শুধুমাত্র দূরের পথই ছিল না, সামাজিক ভাবে দূরত্বের ব্যবধানও ছিল তাতে। প্রাথমিক বিদ্যালয় উঁচু জাত-প্রধান এবং শিক্ষকরাও উঁচু জাতের লোক। নিচু জাতের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁরা খারাপ ব্যবহার করেন বলে অনেকে অভিযোগ জানান। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তিরিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার প্রধান কারণ এটাই। প্রায় সব ঘর থেকেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের নাম লেখানো চলছে। শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে এমনটা ঘটেনি।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দুই সহায়িকা কোঁড়া আর সাঁওতালদের ভাষা জানেন না। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেহেতু বাংলা বোঝে না, এটা তাই একটা বড় সমস্যা।

৬. গ্রাম - ডেমুরতলা, ব্লক - রাজনগর, জেলা - বীরভূম

সিউড়ি-রাজনগর সড়ক ধরে কড়িধ্যা। সেখান থেকে এক ঘন্টার হাঁটা পথ পেরিয়ে গ্রামখানি। কাঁচা রাস্তার দুপাশে এক-ফসলা জমি, পতিত জমি আর জঙ্গল। ডেমুরতলা

তুলনায় নতুন বসতি। পাশের এক গ্রাম থেকে লোকজন এখানে চলে এসেছেন।

ছোট গ্রাম, সব মিলিয়ে ৩২ ঘর লোক। এক ঘরই যাদব আছে — বর্ণ হিন্দু। বাকি ৩১ ঘর সাঁওতাল।

গ্রামে অল্প কিছু লোকেরই দেখা মিলল। পুরুষরা সব মজুরির কাজে বেরিয়ে গেছেন। স্ত্রীলোক এবং কিছু ছোট ছেলেপুলে জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ পাতা কুড়োতে, দাঁতন ভাঙতে গেছেন। গ্রামটিতে আমরা দু'বার গিয়েও আমাদের সব নির্বাচিত উত্তরদাতাদের দেখ পেলাম না। ১২টার বদলে ১০টা প্রশ্নমালা ভর্তি করতে পারলাম। গ্রামের কোনো ডাকঘর, রেশন বা মুদির দোকান নেই। যাই হোক, গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা এক সাঁওতাল রমণী, গ্রাম সমীক্ষার সময় আমাদের সাহায্য করেন।

ডেমুরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম থেকে হাঁটা-পথে বড়জোর ৪-৫ মিনিট দূরে ভালুকা গ্রাম। বিদ্যালয়ে মোট তিনজন শিক্ষক — দুইজন পুরুষ ও একজন নারী। সাঁওতালদের ছেলেমেয়েদের সুবিধের জন্য স্কুল বসে সকালে। এই ছোট ছেলেমেয়েগুলো গরু-ছাগল চরায়, কেউ কেউ গোবর কুড়োয় কেউ বা আবার ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে। প্রধান শিক্ষক বললেন, দিনের বেলা স্কুল বসলে হাজিরা আরও কমবে, বাড়বে স্কুলছুটের মাত্রা।

স্কুলে কেবল দুটো ক্লাসঘর। একটা অন্ধকার, খড়ের চাল, আর একটা ছোট পাকাবাড়ি। খেলার মাঠ নেই, বাথরুম বা পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।

পড়াশোনার প্রধান বাধা, ভাষা। ছাত্র এবং শিক্ষকরা একে অন্যের ভাষা বোঝেনা বলে প্রধান শিক্ষক জানালেন। তবু রক্ষা, একজন সাঁওতাল শিক্ষিকা আছেন যিনি বাকি দুই শিক্ষক আর ছাত্রদের মধ্যে ব্যবধান কমাতে পারেন। গ্রামে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর ডেমুরতলার বাচ্চারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়েছে, জানা গেল। প্রধান কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ভাল পড়ান না। "পারমিট মাস্টারকু মোজতে বাং পড়াওআঃ, উনকু দ বেগার পাড়াওকাতে হঁ বেতন এগ্রামঃগেয়া" — স্থায়ী চাকরির স্কুল শিক্ষকরা তাদের কাজকে পাত্তা দেন না। না পড়ালেও তাঁদের মাইনে মেলে।

* শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দিদিমণিরা বাড়ি বয়ে এসে বাচ্চা নিয়ে যান কেন্দ্রে। "মোজতে বাং পাঢ়াও লেনখান উনকুআঃ চাকরি বায় তাঁহেনআঃ" — ওদের তো চাকরি হারানোর ভয় আছে।

* বাচ্চারাও দিদিমণিদের (শিক্ষকদের থেকে) পছন্দ করে। উত্তরদাতারা বলেন, দিদিমণিরা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেন, পড়ান ভাল।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র একটা দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরের মধ্যে বসে। ঘরটি নতুন হয়েছে। ইঁটের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে। ভালো ঘরের অভাব পড়ানোর পথে প্রধান সমস্যা বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন। এতগুলো বাচ্চাকে বসতে দেওয়ার মতো জায়গা ওতে নেই। বাচ্চাদের উঠোনে বসে পড়াশুনো করতে হয়।

৭. গ্রাম - সোতেরডাঙ্গা, ব্লক - মেদিনীপুর সদর, জেলা - মেদিনীপুর

মেদিনীপুর সদর ব্লকে সোতেরডাঙ্গা একটি বিচ্ছিন্ন পল্লী। সদর থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সাঁওতাল গ্রামটি। হাঁটা পথে আধঘন্টা গেলে বাস স্টপ। তলকুই বাস স্টপটি গ্রামটির সাথে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে যুক্ত। দুটো পাড়া নিয়ে

এই পল্লী। মোট ৯০ ঘরের বাস। প্রধান জীবিকা চাষবাস। বেশির ভাগ খেত মজুর, অল্প কয়েকজনের সামান্য কিছু জোত-জমি আছে। কেউ কেউ বা ভাগচাষী। জমির মালিকরা আশপাশের গ্রামের, যাঁরা মেদিনীপুর শহরেও থাকেন। এক ফসলা জমি - - বছরের বেশিরভাগ সময়েই খেতমজুরদের তাই কোনও কাজ থাকে না। কাছাকাছি মেদিনীপুর শহরে মজদুররা রোজ সাইকেলেই যাতায়াত করেন।

আগে সবচেয়ে কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (তলকুই আর বামুনডাঙ্গা) যেতে গেলে বাচ্চাদের আধ ঘন্টা পথ হাঁটতে হত। পথে খাল পড়ত, পড়ত ছোট নদী। বর্ষার সময় তার জল ছাপিয়ে উঠত কাঁধ বরাবর। সম্প্রতি খালের উপর দিয়ে সাঁকো তৈরি হয়েছে।

১৯৯৯ সালে সোতেরডাঙ্গায় একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে যেখানে মাত্র ৮-১০ জন ছেলেমেয়ে দূরগম্য ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হত, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সেখানে ভর্তি হয়েছে ৬০ জনের মতো ছেলেমেয়ে। আশেপাশের পল্লী থেকেও শিশুরা এখানে ভর্তি হতে আসে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগে বাবা-মা ও তাঁদের শিশুরা অত্যন্ত উৎসাহিত। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরির জন্য জমি দেন এক সাঁওতাল। গোটা এলাকার লোক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর বাড়ি তৈরি করতে বিনি পয়সায় খেটেছেন এবং গৃহনির্মাণের মালমশলা নিজেরা যুগিয়েছেন। তবুও তাঁরা বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত একটা ভবন বানাতে পারেননি। বৃষ্টির সময় বইপত্র নিয়েই বাচ্চাদের ভিজে মেঝেতে বসতে হয়।

শিশুদের লেখাপড়া শেখান তিনজন সহায়িকা। প্রথমে দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তৃতীয় জন বছর খানেক ধরে আছেন। কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য বাবা-মা'দের কাছে শিক্ষিকাদের সুনাম আছে।

৮. গ্রাম - ধেড়ুয়া, ব্লক - মেদিনীপুর সদর, জেলা - মেদিনীপুর

মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরের পথ। তবু ধেড়ুয়া পৌঁছতে নব্বই মিনিট সময় লেগে যায়। মেদিনীপুর থেকে ধেড়ুয়া যাওয়ার পথে বাস বহুবার দাঁড়ায়। যে এলাকাটা আমরা ঠিক করেছিলাম, তাতে একটা গোটা গ্রাম এবং আরেকটি গ্রামের কিছুটা অংশ পড়ে। আমরা শিরিষডাঙ্গা পুরোটা আর ধেড়ুয়ার অংশবিশেষ নির্বাচন করেছিলাম। শিরিষডাঙ্গা ধেড়ুয়ার কাছেই এবং ধেড়ুয়া-২ গ্রাম সংসদের আওতায় পড়ে। মেদিনীপুর সদর আর ঝাড়গ্রাম মহকুমার সীমান্তে কাঁসাই নদীর ধারে এই এলাকাটি অবস্থিত।

ধেড়ুয়া গ্রামে ৩৮০ ঘর লোকের বাস। তিনটি পাড়া। শিরিষডাঙ্গায় থাকে ৭০টি পরিবার। শিরিষডাঙ্গা সম্পূর্ণভাবে তফসিলী জাতি সম্প্রদায় (বাউরি আর ডোম)দের বসতি। ধেড়ুয়ায় ৪০ শতাংশ তফসিলী জাতি এবং ৬০ শতাংশ ওবিসি (অন্যান্য অনুন্নত জাতি) এবং সাধারণ বর্ণের হিন্দুরা থাকেন। ১০ শতাংশ উৎকলি ব্রাহ্মণ। বছর ২০-২৫ আগে এখানকার সমাজ ও অর্থনীতি এঁরাই চালাতেন। বামফ্রন্ট শাসনভার গ্রহণ করার পর এঁদের জমির মালিকানা ছেড়ে দিতে হয় এবং এঁদের হাত থেকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও কিছুটা চলে যায়।

পঞ্চায়েতের সংরক্ষণ নীতির জন্য সংসদের একটি আসনে বসেন একজন তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের লোক। গ্রামের শ্রমশক্তির বেশিরভাগই তফসিলী জাতি সম্প্রদায় থেকে আসে। এঁরা প্রধানত খেতমজুর — এঁদের রুজিরোজগারের প্রধান এলাকা পূর্ব মেদিনীপুরে — মরসুমি মজদুরিই (নামাল খাটা) এখনও রোজগারের প্রধান অবলম্বন। সাধারণ বর্ণের

হিন্দুরা চাষবাসের ভাল জমিগুলোর মালিক। কিছু তফসিলী জাতি ঘরের লোক গ্রীষ্মে ভাগচাষ করেন। "এটা এক ধরনের যজমানির জন্ম দিয়েছে এবং এর কৃতজ্ঞতার ঋণে জড়িয়ে যাওয়ায় জনগণকে বর্ণহিন্দু প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বাস্তবিক লড়াইয়ে শামিল করা আমাদের দলের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে", মন্তব্য করলেন এক সংসদ সদস্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এলাকার প্রাচীনতম বিদ্যালয়ের একটি। চার শ্রেণির জন্য চারটি ক্লাসঘর আছে — আমাদের সমীক্ষা এলাকার মধ্যে যা অস্বাভাবিক রকম ভাল। গ্রামের অনেকে বলেছেন বছর পাঁচেক আগে ৩০ বছর চাকরির শেষে স্কুলের হেডমাস্টার অবসর নেওয়ার পর থেকেই এখানকার লেখাপড়ার মান নিচে নেমে গেছে।

তবে, আমাদের স্কুল পরিদর্শনের ১৫ দিন আগে নতুন প্রধান শিক্ষক কাজে যোগ দিয়েছেন। বলা হয়, তিনি পড়ানোর কাজটাকে নিপুণ করে তোলার চেষ্টা করছেন। মানুষজন শিক্ষকদের সম্পর্কে ক্রুদ্ধ এবং মনে করেন এঁদের কাজে কোনও নিষ্ঠা নেই। তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের অভিযোগ, তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের উপেক্ষা করা হয় এবং উঁচু জাতের বাচ্চাদের দিকেই কেবল মনোযোগ দেওয়া হয়। স্কুলের বৈঠকে তাঁদের ডাকাও হয় না।

এলাকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি একটি ছোট ঘরে বসে। দরমার দেওয়াল। খড়ের চাল। কুড়ি জন ছেলেমেয়ে বসতে পারে। ভর্তি শিশুদের সংখ্যা ৬২ এবং আমাদের পরিদর্শনের দিন উপস্থিতি ছিল ৫০ জন। বহু বাচ্চা বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

মানুষজন তাঁদের বাচ্চাকে সোৎসাহে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে চান। "ওদের তো অন্ধ থাকলে চলবে না, অল্প একটু বিদ্যেতেই অনেক কিছু পালটে যায়" বলে জানালেন খেতমজুর ধানু চালক। ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের কারণে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া কঠিন ছিল।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সব শিশুই তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের। "বামুনরা কি এখানে ছ্যানা পাঠাবে?" এক গ্রামবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই মন্তব্যটি করেন।

ধেড়ুয়ার কিছু কিছু তফসিলী জাতি ঘরের লোকের জমি আছে। তাঁরা বাচ্চাদের জন্য টিউশনের বন্দোবস্ত করেন। লোকের মনে ধারণা যে প্রাইভেট টিউশন ছাড়া লেখাপড়া শেখা যায় না এবং যাঁদের পয়সা আছে তাঁরাই প্রাইভেট টিউশনের বন্দোবস্ত করতে পারেন। তফসিলী জাতির লোকদের আরও ধারণা, বিয়ে না হওয়া অবধি মেয়েরা পড়বে। তাঁদের শিক্ষার গুণমান নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মেয়েরা তো ঘরের কাজ করতেই জন্মেছে। তাই করুক, ছেলেরা পড়া তৈরি করুক প্রাইভেট টিউটরের কাছে। এই প্রথা শুধু তফসিলী জাতির মধ্যেই নয়, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও চালু আছে।

৯. গ্রাম - গোপীনাথপুর-টিকায়তপুর, ব্লক - গোপীবল্লভপুর-১, জেলা - মেদিনীপুর

গোপীনাথপুর গ্রামটি, যে রাস্তাটি গোপীবল্লভপুরের সাথে নয়াগ্রামকে যুক্ত করেছে, সেই বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। টিকায়েতপুর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত এই গ্রামটি টিকায়েতপুর গ্রাম সংসদ এলাকার আওতায় পড়ে। গোপীবল্লভপুর-১ ব্লক অফিস থেকে এক কিলোমিটর দূরে ছাতিনাসোলে এই অঞ্চলটি অবস্থিত। গোপীবল্লভপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এটি একটি গঞ্জ এলাকা (ব্লকের নাম গোপীবল্লভপুরের নামে, জায়গাটা যদিও ছাতিনাসোলে)। আমাদের সমীক্ষার কাজের জন্য আমরা টিকায়েতপুর ও

গোপীনাথপুরকে এলাকা হিসেবে মনোনীত করেছিলাম। ওখানে ১৬২ ঘরের বাস — গোপীনাথপুরে ৭০ ঘর আর টিকায়েতপুরে ৯০। মোট আনুমানিক জনসংখ্যা ৯০০। গোপীনাথপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের। বেশির ভাগ জেলে (ধীবর) সম্প্রদায়, কিছু কিছু মাল আছেন। কিছু আছেন ওবিসি সম্প্রদায়ের।

টিকায়েতপুরে একটি একক অনুন্নত জাতি গোপ (গোয়ালা)দের বাস।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি টিকায়েতপুরে, গোপীনাথপুর থেকে এক কিলোমিটারও কম দূরত্বে। বিভিন্ন পাড়া থেকে শিশুদের যেতে হয় রাস্তার ওপারে হয় টিকায়েতপুরে নয় বড় রাস্তার ওপারে সোনাহারা গ্রামে। শি: শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হওয়ার পর থেকে, ছেলেমেয়েরা আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। কেবল কিছু চতুর্থ শ্রেণির ছেলেমেয়ে যায় বলে এক গ্রামবাসী জানালেন।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালান দুইজন সহায়িকা। বাড়িটি টিনের চালের। কোনও দেয়াল নেই। সর্বসাকুল্যে ৩০-৩৫ জন শিশু বসতে পারে -- ভর্তির সংখ্যা তার দ্বিগুণ। ওই একখানি ঘরেই সব ক্লাস। কোনও আড়াল নেই।

অভিভাবকরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বাচ্চাদের পাঠাতে পেরে অত্যন্ত খুশি। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ মিলেছে। সহায়িকারা একই গ্রামের। তাঁদের যদিও অনিয়মিত আর কম বেতন নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানান সহায়িকারা নিয়মিত আসেন এবং পড়ানও ভাল।

'এটা আমাদের ব্লকের সবচেয়ে সেরা বাড়িওয়ালা প্রাইমারি স্কুল', এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক জানান। "দূরের কিছু জায়গায় যদি আপনারা ঘোরেন দেখতে পাবেন স্কুলবাড়ি বলতে গেলে নেই-ই"। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ৪ খানি ঘর -- এক স্কুলের অফিস, আর একটা অঙ্গনওয়াড়িদের জন্য সংরক্ষিত। অন্য দুই ঘরে চারটি ক্লাস হয়। শিক্ষকরা যেমন শিক্ষকের অভাব আর বাবা-মা'র নজরের অভাব নিয়ে অভিযোগ করেন, বাবা-মা'রাও তেমনি শিক্ষকদের নিম্নমানের পড়ানো নিয়ে অভিযোগ করেন। এক দম্পতি অভিযোগ করেন যে শিক্ষক তাঁদের ছেলের লেখাপড়ায় যত্ন নেয় না। অনেক বেশি যত্ন নেয় বাবু-বাড়ির ছেলেমেয়েদের। 'গরিবদের কে দেখবে?' তফসিলী জনজাতির এক মজুর ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা জানালেন।

১০. গ্রাম - তলপানিজা, ব্লক - গোপীবল্লভপুর-১, জেলা - মেদিনীপুর

তলপানিজা গ্রামটি (তলসাই, ডিঙ্গাঘর আর তলপানিজা - এই তিনটি 'টোলা' নিয়ে গ্রামখানি) গোপীবল্লভপুর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এবং ব্লক সদর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

গ্রামে গাড়ি-ঘোড়া যায়না। তলপানিজা গ্রামে আমরা সাইকেল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম এবং ধানক্ষেতের কাদাভরা ঢাল দিয়ে হেঁটে বরোমানিয়ায় পৌঁছলাম। গ্রামটিতে তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের বাস -- কৈবর্ত, মাল আর দন্ডছত্র মাঝিদের গ্রাম। এক ঘর কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ।

প্রায় সকলেই সারাবছর খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল। অল্পই জমি আছে। বেশির ভাগ জমিই খাস জমি, ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী গরিব মানুষের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হয়েছিল।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হওয়ার আগে শিশুদের ২ কিলোমিটার দূরের তলপানিজা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে হত।

গ্রামের যাঁর সঙ্গেই আমরা কথা বলেছি তিনিই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজে খুশি। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর বাড়ি বানাতে গ্রামবাসী বিনা পয়সায় খেটেছেন। বাড়ি মানে আসলে একটা মাটির বাড়ি। দশ ফুট বাই দশ ফুট। ৩০ জন শিশুর টেনেটুনে জায়গা হয়। কিন্তু বাস্তবিক হাজিরা অনেক বেশি -- এর দেড়গুণ।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তালাচাবি দেওয়া যায়না। প্রতি ভোরে বাচ্চারা নিজেরাই কেশব নায়েকের বাড়ি থেকে একটা টেবিল আর খান তিনেক চেয়ার টেনে নিয়ে আসে দিদিমণিদের জন্য। স্কুল শেষ হওয়ার পরে ফেরত দিয়ে আসে। "বৃষ্টিবাদলের দিনে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে", বলেন এক সহায়িকা। অন্য ঋতুতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নেওয়া যায়। এখন কেন্দ্রে তিনজন সহায়িকা। ২০০১ সাল থেকে চতুর্থ শ্রেণি চালু হওয়ায় আর একটি পদের অনুমোদন হয়েছে।

সহায়িকারা দূরের গ্রামের লোক, কিন্তু এলাকার মানুষ তাঁদের উপর বেশ খুশি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি আধা-শেষ হওয়া পাকা ঘর আছে। কিছু বাচ্চা ওখানে মেঝেতে চট বিছিয়ে বসেছিল।

পুরোনো স্কুলবাড়ি মাটির। টালির ছাদ। দেয়ালগুলো যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিছু বাচ্চা অন্ধকার ঘরের ভিতরে বসেছিল। "কী করা যাবে? ওদের তো কোথাও বসতে দিতে হবে। এখন বর্ষাকাল। নতুন বাড়ির কাজ শেষ হয়নি এখনও", জানালেন প্রধান শিক্ষক।

তিনি বলেন বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিশু তফসিলী জাতি, জনজাতি সম্প্রদায় থেকে এসেছে। "ওরা বড় গরিব, জানেন? ওদের বাবা-মা কাজে বেরোলে, ওরা ঘরের কাজ করে -- গরু ছাগল চরায়, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে। ধান রোয়ার আর ফসল কাটার মরসুমে স্কুলের হাজিরা অনেক কমে যায়"।

১১. গ্রাম - বৈকুণ্ঠপুর, ব্লক - দাশপুর, জেলা - মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের মেদিনীপুর-ঘাটাল সড়কের ধারে এই গ্রামটি অবস্থিত। এলোমেলো জনবসতি। প্রধানত দুলে, বাগদি, মাহিষ্য এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকের বাস। মোট জনসংখ্যা ১৫০০। কিছু মুসলমান ও সাঁওতালও আছেন। গ্রামের জনবসতি এমন ছড়ানো-ছিটানো যে আশপাশের গ্রাম থেকে এই গ্রামকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল।

মূল জীবিকা কৃষি। জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ খেতমজুর -- তাঁরা বাইরের গ্রামেও খাটতে যান। স্থানীয় হিমঘরে, ইঁটভাটাতেও খাটতে যান। জমি দো-ফসলা, কখনও সখনও তে-ফসলাও। ধান, পাট ও নানা ধরনের সবজির চাষই এলাকায় গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে সবজির চাষ। পরিবারের রুজিরোজগারের অনেকটাই আসে এই চাষ থেকে। খেতমজুরি ছাড়াও কেউ কেউ রাস্তার পাশের দোকানে খেটে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিছু লোক সরকারি চাকরিও করেন।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং একটি বৃদ্ধাশ্রম আছে যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুরাও ঠাঁই পায়। নিমোর্ক মঠ বলে একটি সংগঠন বৃদ্ধাশ্রমটি চালান। কেবল ব্রাহ্মণরাই এতে জায়গা পান। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিই একটি প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিছু আসে গ্রাম থেকে, বাকিরা আশেপাশের এলাকা

থেকে। বিদ্যালয়ে আসতে ছেলেমেয়েদের আধ-ঘন্টা হাঁটতে হয়।

কাছের গ্রাম চাঁদপুর থেকে এক সময় ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। চাঁদপুরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হওয়ার পর বাচ্চারা বৈকুন্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। যে বাড়িতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বসে, স্থানীয় কিছু যুবক তা তৈরি করেছিলেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার জন্য। তাঁরা আশা করেছিলেন সে বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন পাবে এবং তাঁদেরও চাকরি হবে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলে অনুমোদন হল একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের। তিন শিক্ষিকা নিযুক্ত হলেন।

অন্য এলাকার বাচ্চারাও পড়তে আসে। অনেককেই আসতে হয় আল পেরিয়ে কাদা মাখামাখি হয়ে পথ হেঁটে।

শিক্ষাদান এবং সমাজসেবার জন্য বৈকুন্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুনাম আছে। চারটি শ্রেণির ছেলেমেয়েকে তিনজন শিক্ষক পড়ান। জায়গা যথেষ্ট না থাকলেও, সব কিছু চালানো হয় সুনিয়মে। আমরা যতগুলি স্কুল দেখেছি তার মধ্যে এটি অন্যতম। পড়ানোর সাজ সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবও পালিত হয়।

প্রধান শিক্ষক স্থানীয় দুই মহিলাকে দিয়ে প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুদের পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। স্কুল ছুটির পর তাদের পড়ানো হয়। শিশু পিছু মাসে পাঁচ টাকা লাগে বাড়ির লোকের। এর ফলে বাচ্চাদের বর্ণ পরিচয় আরও তাড়াতাড়ি হয়।

১২. গ্রাম - বেলিয়াঘাটা, ব্লক - দাসপুর, জেলা - মেদিনীপুর

এখানে ৪০০ ঘর ও চারটি পল্লী। সব মিলিয়ে আনুমানিক ২২০০ লোক থাকেন। জেলা সদর থেকে বাসে বেলিয়াঘাটা ৬০ কিলোমিটার পথ। সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগে পৌঁছাতে। সব চেয়ে কাছে রেলস্টেশন পাঁশকুড়া, গ্রাম থেকে আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এই গ্রামের ৩৫০ ঘরই মাহিষ্য। এর পরে তেলিরা - ৪০ ঘর আছেন। বাকি ১০ ঘরের ৫ ঘর রয়েছে সাঁওতাল - প্রচণ্ড গরিব। বাকি ৫ ঘরে আছেন সম্পন্ন ব্রাহ্মণরা।

গ্রামের বাইরে দিয়ে চলে যায় ঘাঁটাল-পাশকুড়া সড়ক। সব চেয়ে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য চারটে টিউবওয়েল আছে। আর দুটি ব্যক্তিগত মালিকানায়। শতকরা ৭০ শতাংশের বাড়িতেই বিদ্যুৎ আছে। স্থানীয় ডাকঘর ৫ কিলোমিটার দূরে। গ্রামের অত্যন্ত কাছে একটি রেশনের দোকান আছে।

গ্রামের লোকের প্রধান জীবিকা কৃষি। বেলিয়াঘাটায় প্রায় ৩০০ খেতমজুরের বাস। অনেক কিশোর ১৩/১৪ বছর বয়সে মুম্বাই, দিল্লি চলে যায় স্যাকরার কাজে। গ্রামের বাসিন্দাদের খুব একটা কিছু জমি-জমা নেই। কেউ কেউ ড্রাইভারি করেন, কেউ ধূপকাঠি তৈরির মজুর হিসাবে কাজ করেন। বহু লোক ঘাটাল, পাঁশকুড়ায় সবজি বিক্রি করেন।

গ্রামে ঢোকার মুখেই নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পুরোনো একটা লম্বা দালান ঘর। লোহালক্কড়, সিমেন্টের বস্তা ঢিপ করা। কারণ, পুরণো ইস্কুল ঘরের পাশে তিন কামরা বিশিষ্ট একটি নতুন বাড়ি তৈরির কাজ চলছিল।

বৈদ্যপুরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে। জানা গেছে আগে বাচ্চারা পড়তে আসতো বেলিয়াঘাটা প্রাইমারি স্কুলে। এখন অনেকেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যায়। শিবতলার প্রাইমারি স্কুল থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হাঁটা পথে ১৫-২০ মিনিট। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দরমার দেয়াল,

টিনের চাল। তিনজন সহায়িকা নিযুক্ত। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই বৈদ্যপুরের বাসিন্দা। কিছু ছাত্র আসে বেলিয়াঘাটা, গোপীনাথপুর আর গোপালপুর থেকে। অল্প কিছু মুসলমান, তফসিলী জাতির ঘরের ছেলেমেয়েও পড়তে আসে। বেশির ভাগ বাচ্চাই মাহিষ্যদের ঘরের।

১৩. গ্রাম - ভাদসা, ব্লক - পুরুলিয়া-১, জেলা - পুরুলিয়া

জেলা সদর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে পুরুলিয়া-১ ব্লকে ভাদসা গ্রাম। তিনটে টোলা অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত। ১৬১টি ঘর। মোট ১,০৪৮ জন লোক বাস করেন গ্রামে।

গ্রামবাসীরা মাহাতো, গোস্বামী, তেলি, ময়রা, চিত্রকর ও ডোম জাতির। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মাহাতোরা এলাকার মধ্যে ক্ষমতাসম্পন্ন।

বাস স্টপ ৫০০ মিটারের মধ্যে। গ্রামে ডাকঘর আছে, বিদ্যুৎও আছে। জানা গেছে, খুব গরীব বলে গ্রামবাসীরা আগে শিক্ষা-সচেতন ছিলেন না। বাবা-মা'রা জনমজুরি খাটতে গেলে ছেলেমেয়েরা (স্কুলের বয়ঃপ্রাপ্ত) বাড়ির ছোটদের আর গৃহপালিত পশুদের দেখাশোনা করে।

প্রাথমিক স্কুলের দুটো আলাদা বাড়ি -- একটি পুরোনো, একটি নতুন। পুরোনোটা বড় কিন্তু ভেঙেচুরে যাওয়ায় পরিত্যক্ত। নতুনটার দুটো ক্লাসঘরে চারটি ক্লাস বসে। প্রাইমারি স্কুলের লাগোয়াই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আর অঙ্গনওয়াড়ি। এ ছাড়াও একটা ক্রেশ আছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের লাগোয়া পুরুলিয়ার 'কল্যাণ' নামের এক অ-সরকারি সংগঠন (এন.জি.ও.) ক্রেশটি চালায়।

৬ বছরের কমবয়সী অল্প কিছু বাচ্চা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যায়। "বাচ্চারা প্রাইমারি স্কুলে চাল পায়, কেন ওরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাবে?" এই ছিল এক গ্রামবাসীর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া। তাঁর মতে ও গ্রামে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে রাজনৈতিক কারণে।

১৪. গ্রাম - ঘাগরজোড়ি, ব্লক - পুরুলিয়া-১, জেলা - পুরুলিয়া

পুরুলিয়া-১ ব্লকে ঘাগরজোড়ি গ্রামটি অবস্থিত। পুরুলিয়া শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে -- ১৫ কিলোমিটার বাসে, সেখান থেকে 'আশ্রম' বাসস্টপে নেমে ৭ কিলোমিটার হেঁটে বা রিকসায়।

গ্রামবাসীদের ৮৫ শতাংশ খেতমজুর। ৭০০ ঘর মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ৩৭০০। গ্রামের ৬টা পাড়া -- বিভিন্ন বর্ণ সম্প্রদায়ের লোক থাকেন। সমাজ চরিত্র মিশ্র প্রকৃতির। মাহাতো, ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, মুসলমান, ডোম, সহিস, তেলি, রাজওয়ার, ভাট, কামার, নাপিত, আর গোস্বামী জাতির পাঁচমিশেলি গ্রাম। মাহাতোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ব্রাহ্মণরাই আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন।

শিশু শিক্ষা কমিটির নয় সদস্যের পাঁচজনই ব্রাহ্মণ। ভিইসি-র চিত্রটাও একই রকম। এক ব্রাহ্মণ একই সঙ্গে সেখানকার সম্পাদক এবং সভাপতি বলে জানালেন।

ব্রাহ্মণ পাড়ার এক গোয়ালঘরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি চলে। দুই সহায়িকাই ব্রাহ্মণ। তাঁদের নিজেদের গ্রামেরই 'ছোটলোক'রা কোথায় থাকে সে খবর রাখাটা তাঁদের মর্যাদায় বাধে। নীচু জাতের প্রতি এই ঘৃণা অত্যন্ত প্রকাশ্যেই এক সহায়িকা জানালেন। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য "সবাই ব্রাহ্মণের বাচ্চা নয়, প্রচুর ছোটলোক আছে।"

গ্রামে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমরা যেটাতে ঘুরতে গিয়েছিলাম, তার সুন্দর নতুন একটি দোতলা পাকাবাড়ি আছে। একতলায় দুটি ঘরে চারটি শ্রেণি পড়ে। দোতলায় দিনে গ্রামের যুবকরা প্রাইভেট টিউশন দেন। রাতে সেটা থাকবার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাকা স্কুলবাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে ছোট একটা বদ্ধ ঘরে বসে তফসিলী জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ঘরটাকে বলা হয় হরিজন স্কুল।

১৫. গ্রাম - লৌলাড়া, ব্লক - পুঞ্চা, জেলা - পুরুলিয়া

জেলা সদর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরের পথ। পাকা রাস্তা থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। ২০০ ঘর মিলিয়ে গ্রামের বাসিন্দা ১২০০ জন। চারটি পাড়ায় বিভক্ত।

গ্রামের মাত্র ৩৮ ঘর উচ্চবর্ণের বাস হলেও তাঁদের হাতেই সব ক্ষমতা। বেশির ভাগ ঘরই বাউরি (১০০), সহিস (৫০) এবং ভুঁইয়াদের। পঞ্চায়েত সভাপতি স্বয়ং ব্রাহ্মণ এবং গোটা বাউরি সমাজের উপর তাঁর ভালই কৃতিত্ব, যদিও বাউরিদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই কড়া ভাষায় ব্রাহ্মণদের মনোভাবের সমালোচনা করেন।

গ্রামটা, বলতে গেলে, বড় রাস্তার উপরেই। প্রাইমারি স্কুল, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেয়েদের স্কুল, হাইস্কুল, সবই এই গ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে।

গ্রামের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। নব্বুই ভাগ লোকই খেত মজুর। বাকি দশ ভাগের হাতে চাষবাসের জমির মালিকানা। তাঁরা প্রধানত উচ্চবর্ণ। মজুরদের গ্রামে কিছু কাজ মেলে এবং প্রায় প্রতি ঘর থেকেই ফসলের চার ঋতুতে লোকে বর্ধমানে খাটতে যান। প্রাইমারি স্কুল যেহেতু গ্রাম থেকে এক কিলোমিটার দূরে - বড় রাস্তার উপরে, তাই বাবা-মা'রা বাচ্চাদের সেখানে পাঠাতে ভয় পান। স্কুলটা হাইস্কুল আর কলেজেরই বিশাল চত্বরে অবস্থিত। গ্রামের এক যুবকদের কাছ থেকে জানা গেল, ২০ বছর আগে শিক্ষায় লৌলাড়া এ জেলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এখন শিক্ষণ এবং শিক্ষকতার মান শোচনীয় জায়গায় নেমে এসেছে।

শিশুদের মধ্যে উচ্চবর্গদের ৭০ শতাংশ বেসরকারি স্কুলে পড়ে। এখানে শিশু পিছু বছরে ২৫০০ টাকা লাগে। এক অভিভাবক জানালেন যে সরকারি স্কুলের উপর তাঁর ভরসা নেই। কারণ শিক্ষাদানের নিম্নমান, ইংরিজি শিক্ষর অভাব, শিক্ষকের কম সংখ্যা, শিক্ষকদের কর্মবিমুখতা, ইত্যাদি।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়িটা যথেষ্ট ভালো, যদিও ওটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য তৈরী হয়নি। নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত পঞ্চায়েতের কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার যোগ্য টাকা দিয়ে বাড়িটি তৈরি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুরা বয়স সীমার ছাড় অনেক বেশি পায় -- ৫ থেকে ১৬ বছরের বালক-বালিকারা এখানে ভর্তি হতে পারে।

তফসিলী জাতি, জনজাতি পরিবারের ছেলেদের থেকে মেয়েরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয় বেশি। ছেলেরা রোজগারের ধান্দা করে, গরুটা ছাগলটা চরায়। বালিকারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম (কিছু ক্ষেত্রে অন্য বাড়িতে ঝি-গিরি করে) করার পর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে আসে। এটাই একমাত্র শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে পঞ্চায়েত গত বছর

খানেকের মধ্যে দু'বার চাল বিতরণ করেছে। যাই হোক, কোনও সহায়িকাই কোনও বেতন বা কোনও থোক টাকা পাননি।

১৬. গ্রাম - কুলটাঁড়, ব্লক - পুঞ্চা, জেলা - পুরুলিয়া

দামোদরপুর নামে একটি বড় গ্রামের দুটি পাড়া। প্রধান গ্রাম ছাড়াও তার দুটি পাড়া, কুলটাঁড় এবং খুদিটাঁড়। গ্রামের প্রধান অংশে বর্ণহিন্দুদের বাস। আর কুলটাঁড় খুদিটাঁড়ে বাস করেন খেড়িয়া শবরেরা। খুদিটাঁড় দামোদরপুরের এক কিলোমিটার ছাড়িয়ে — প্রধান সড়ক মানবাজার-পুরুলিয়া রোডে। কুলটাঁড় খুদিটাঁড়ের দু কিলোমিটার পূর্বদিকে। পুঞ্চা ব্লক থেকে ১৫ এবং জেলা সদর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে। দামোদরপুরে একটি ডাকঘর আছে। উচ্চ বিদ্যালয় ন-পাড়াতে, এলাকা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পুঞ্চাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে।

খুদিটাঁড় বড় রাস্তার উপরে। একটি কাঁচা রাস্তা কুলটাঁড় ও ন-পাড়াকে যুক্ত করেছে। এই পল্লীর খুদিটাঁড় বা দামোদরপুরের সঙ্গে সরাসরি যোগ হয় এমন কোনও রাস্তা নেই। খুদিটাঁড়ে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্লাস হয়। ভর্তির হাল খুবই খারাপ — মাত্র ২১ জন ছাত্র। আমাদের স্কুল পরিদর্শনের দিন মাত্র ৪ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। একজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। প্রবল জাতিভেদের বিদ্বেষ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছে।

কুলটাঁড়ে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হয়েছে — জেলার ৬টি গ্রামের মধ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে এটিই যথাযথ। এলাকার দু-তিন জন মানুষ কেবল লিখতে পড়তে জানেন।

প্রাইমারি স্কুলে যেতে কুলটাঁড়ের শিশুদের দু কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। খুদিটাঁড়ের শিশুরা দুইটি কারণে প্রাইমারি স্কুলে যায় না। শিক্ষকেরা সবাই উঁচু জাতের, এবং দ্বিতীয়ত, (এটা দুই পল্লীতেই আছে) অকল্পনীয় দারিদ্র।

কৃষ্ণ শবর এবং অনিল শবরের কথায় এলাকার সব খেড়িয়া শবরই দিনে একবেলা খেতে পান। "সাঁঝে খা'লে সকালে নাই ভাত", সন্ধেয় খেলে সকালে হাঁড়ি চড়ে না। বাটি ভর্তি নুন চা খেয়ে নিই, বাচ্চারা তো খিদে সইতে পারে না, ওরা জন্তুজানোয়ার মেরে আনে।"

এলাকায় তেমন কাজ নেই। তাছাড়া শবররা খাদ্য সংগ্রহকারী জাত, অন্তত কিছুটা। "এখন সে বনও নেই" অনিল একটা ন্যাড়া টিলা দেখিয়ে বলেন, "আমরা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব।" চাযের মরসুমে মানুষজন মাঠের কাজে বর্ধমান চলে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খুদিটাঁড়ে। সমিতির কমিউনিটি হলে একটি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে। কেন্দ্রটি সকালে এক ঘন্টা খোলা থাকে এবং জানা গেছে শিশুরা এখানে লেখাপড়া শিখতে আসছে।

১৭. গ্রাম - হেট-জারগো, ব্লক - ঝালদা, জেলা - পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকে হেট জারগো গ্রাম। ঝালদা থেকে প্রথমে বাসে

কুড়ি মিনিট, তারপর দশ মিনিটের হাঁটা পথ। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পাহাড় ঘেরা।

এলাকাটি খুব বড় এবং ৮০০ অধিবাসী পরিবার দুটো মৌজায় বিভক্ত। গ্রামে ব্রাহ্মণ, শুঁড়ি, বৈষ্ণব, তাম্বুলি, কর্মকার, ডোম, সহিস, মাহাতো, তেলি এবং স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতির বাস।

জেলার দুই বড় রাজনৈতিক নেতার বাসস্থান হওয়ার সুবাদে জায়গাটা বিখ্যাত। প্রয়াত সাংসদ চিত্তরঞ্জন মাহাতো, ও রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো (তিনি চা খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন) এখানকার বাসিন্দা। চাষবাস, খেতমজুরির মাধ্যমে এখানকার লোকেরা রুজিরোজগার করেন। খেতমজুরির কাজ করতে তারা বাইরেও যান। কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করেও দিন গুজরান করেন।

এলাকার এক প্রান্তে একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে। তিনটে ক্লাসঘর। হেডমাস্টার মশাই জানালেন, স্কুলের জানলা দরজা চুরি হয়ে গিয়েছে। স্কুলের দু'জন শিক্ষক — দু'জনই পুরুষ। বড় রাস্তা আর স্কুলের যোগাযোগ হয় দু'ফুট চওড়া একটা কাদাটে রাস্তা দিয়ে। স্কুল বাড়িটা সবুজ ধান ক্ষেতের ভিতরে জেগে ওঠা দ্বীপের মতো দেখায়। ক্লাসঘর ভর্তি ব্যাঙ। মাঝে মাঝে ক্লাসঘরে সাপখোপও ঢুকে পড়ে।

স্কুল থেকে দু'মিনিট দূরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্লাস হয়। লোকেদের কাছে বাড়িটার নাম 'সমিতির ঘর'। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের একজন সহায়িকা। শুরুর দিনই দু'জন সহায়িকা নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন পরবর্তিকালে ছেড়ে দিয়েছেন। শুরুর পর থেকে সহায়িকারা কোনও বেতন পাননি।

বড় রাস্তার অন্য শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকার সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হয়, তখন তিনি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর একটু দূরে অপেক্ষা করছিলেন কারণ কিছু বাচ্চাকে কেন্দ্রে খোঁজ নিতে পাঠানো হয়েছিল ওদিন ওখানে ক্লাস নেওয়া সম্ভব কি না জানতে। ছেলেরা ফিরে এসে দিদিমণিকে জানালো যে ওই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মেঝে জলে ডুবে গেছে। বাড়িটি বর্ষার জল আটকাতে পারে না।

এলাকায় একটি আনন্দমার্গী স্কুল আছে। সম্পন্ন পরিবারের লোকেরাই কেবল ছেলেমেয়েদের সেই স্কুলে পাঠায়। মাসে স্কুল খরচ ৩০ টাকা। এ ছাড়া ছাত্রদের ইউনিফর্ম কিনতে হয়। এলাকায় তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে।

১৭. গ্রাম - কলমা, ব্লক - ঝালদা-১, জেলা - পুরুলিয়া

ঝালদা শহর থেকে গ্রামটি ১৫ কিলোমিটার দূরে। বাসস্টপ থেকে প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটতে হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস আর হাইস্কুল ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এই গ্রামটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহাতো, ভগত, সাহি, শুঁড়ি এবং কর্মকার জাতির লোকেদের বসবাস। দেশওয়ালি মাঝি এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কিছু লোক আছেন। পুরুলিয়ায় আমাদের দেখা বহু গ্রামের মতোই এ গ্রামও এক ফসলা এবং নীচু জাতের লোকেদের জীবিকা হচ্ছে মজদুরি। বর্ণহিন্দু এবং

কিছু তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের (শুঁড়ি)৪৪ লোকেরা চাষবাস ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য করেন।

এই গ্রামে একটি কৃষি সমবায় আছে। চালান সাঁওতালরা। এঁরা জঙ্গল থেকে বড় একটি জমি উদ্ধার করে সেখানে যৌথ খামার শুরু করেছেন।

এখানে 'একজন শিক্ষক' চালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। "ভাবতে পারেন আমি কী করে সামাল দিই?" একটা ভাঙা তেপায়া চেয়ারে বসে অসহায় শিক্ষক বলেন -- চার নম্বর পায়াটিতে ইট গুজে ঠেকা দেওয়া আছে। স্কুল বাড়ির দুটি ঘর -- উপস্থিত জনা কুড়ি বাচ্চা চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে। কেউ কেউ ভুট্টা পোড়া বা আতা সেদ্ধ খাচ্ছে।

স্কুলের নাম কলমা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কলমা গার্লস প্রাইমারি স্কুল। যাই হোক ছেলেদের ওখানে ভর্তি হতে মানা নেই এবং ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ শতাংশই ছেলে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রাইমারি স্কুল থেকে মিনিট খানেকের পথ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেও কিন্তু কম করে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। বেশির ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের ঘরের ছেলেদের পড়াশোনার জায়গা, সেখানে কিন্তু এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলেমেয়েই বর্ণহিন্দু পরিবারের। এঁরা ছেলেমেয়েদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান, "আরও ভাল শিক্ষাদীক্ষার জন্য", যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি "খারাপ ভাবে চলে।"

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩.৩.১ উত্তরদাতাদের নারী-পুরুষ ভাগ

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
পুরুষ	৩০	৪৩	৫০	১২৩
নারী	৪০	২৭	২২	৮৯
মোট	৭০	৭০	৭২	২১২

৩.৩.২ উত্তরদাতাদের বয়স

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
২১-৩৫	৪৬	৪৩	৩৫	১২৫
৩৬-৫০	১৮	২২	২৯	৬৯
৫০ এর উর্ধ্বে	৬	৫	৭	১৮
মোট	৭০	৭০	৭২	২২১

৩.৩.৩ উত্তরদাতাদের শিক্ষার হার

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
নিরক্ষর	৩৩	২০	৩৫	৮৮
সাক্ষর	৮	৪	৪	১৬
পঞ্চম শ্রেণির নিচে	১০	২১	৯	৪০
অষ্টম শ্রেণি	৮	১৯	১০	৩৭
নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি	৯	৬	৭	২২
উচ্চমাধ্যমিক	০	০	৪	৪
বিএ/বিএসসি	২	০	২	৪
এমএ/এমএসসি	০	০	১	১
মোট	৭০	৭০	৭২	২১২

৩.৩.৪ সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির সদস্য সংখ্যা

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
পুরুষ	৯৮	১০৩	১১৬	৩১৭
নারী	১০১	১০৩	১১৪	৩১৮
পুরুষ শিশু	৯৬	১০৮	১০৯	৩১৩
নারী শিশু	১১৮	১১৯	১১৭	৩৫৪
মোট	৪১৩	৪৩৩	৪৫৬	১৩০২

৩.৩.৫ পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা

বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
৫.৯০	৬.১৯	৬.৩৩	৬.১৪

৩.৩.৬ সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
নিরক্ষর	৬	২	৬	১৪
সাক্ষর	২	০	০	২
পঞ্চম শ্রেণির নিচে	২৯	২৩	৩২	৮৪
পঞ্চম শ্রেণি	২	২৩	০	২৫
অষ্টম শ্রেণি	১৭	১৩	১১	৪১
নবম-দশম শ্রেণি	৮	৫	৯	২২
উচ্চমাধ্যমিক	৩	২	৫	১০
বিএ/বিএসসি	৩	২	৮	১৩
এমএ/এমএসসি	০	১	১	২

৩.৩.৭ জমির মালিকানা

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
ভূমিহীন	২৯	২৮	৩৩	৯০
২.৫ একরের কম	২৯	৩৮	৩১	৯৮
মালিকানা ৭.৫ একরের বেশি মালিকানা	১২	৪	৮	২৪
মোট	৭০	৭০	৭২	২১২

৩.৩.৮ ঘরগুলির জাতি অনুযায়ী ভাগ

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
তফসিলী জাতি	১৪	৩৪	১৪	৬২
তফসিলী জনজাতি	২৫	১৮	১৭	৬০
অন্যান্য	৩১	১৮	৪১	৯০
মোট	৭০	৭০	৭২	২১২

৩.৩.৯ পরিবারগুলির জাতি ও পেশা অনুযায়ী ভাগ

	বীরভূম				মেদিনীপুর				পুরুলিয়া			
	মোট	তফসিলী জাতি	তফসিলী জনজাতি	অন্যান্য	মোট	তফসিলী জাতি	তফসিলী জনজাতি	অন্যান্য	মোট	তফসিলী জাতি	তফসিলী জনজাতি	অন্যান্য
চাষবাস	১৮	১	৪	১৩	১৫	৫	২	৮	১৪	১	৩	১০
অস্থায়ী কৃষি মজুর	৩৩	৯	১৯	৫	৪০	২৩	১২	৫	৩২	১০	১০	১২
অস্থায়ী অ-কৃষি মজুর	৪	৩	১	০	২	১	০	১	২	০	২	০
ব্যাপারী	৭	০	০	৭	-				৩	০	০	৩
ব্যবসা	১	০	০	১	-				৫	০	০	৫
চাকরি	২	০	০	২	৩	১	০	২	৭	১	০	৬
পশুপালন	১	০	০	১	-				-	--	--	--
অন্যান্য মজুর	--	--	--	--	--	--	--	--	১	০	০	১
প্রাইভেট টিউশন	১	০	০	১	--	--	--	--	--	--	--	--
মাছ ধরা	১	১	০	০	১	১	০	০	১	১	০	০
স্ব-নিযুক্তি	১	০	১	০	৯/৫	৩	৪	২	৭/৩	১	২	৪
অস্থায়ী চাকরি	১	০	--	১	--	--	--	--	--	--	--	--
মোট	৭০	১৪	২৫	৩১	৭০	৩৪	১৮	১৮	৭২	১৪	১৭	৪১

৩.৩.১০ মনোনীত পরিবারগুলির সম্পদ – মালিকানা

	বীরভূম	মেদিনীপুর	পুরুলিয়া	মোট
মোষ	৬	০	০	৬
ছাগল	১৭	১৩	৪	৩৪
গরু/ষাঁড়	৩৭	৪৩	৩৫	১১৫
সাইকেল	৪৩	৫৪	৪২	১৩৯
রেডিও	১৭	২০	৬	৪৩

টীকা ও সন্দর্ভ

টীকা

১. দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন, জঁ্যা দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন: ১৯৯৫; রোগালি বি., হ্যারিস-হোয়াইট বি. ও বোস এস্., ২০০০।

২. জয়ন্ত কুমার বাণ্ঠিয়া, রেজিস্ট্রার জেনারেল এন্ড সেনসাস কমিশনার, ইন্ডিয়া, প্রভিশনাল পপুলেশন টোটালস, সেনসাস অব ইন্ডিয়া, ২০০১, পেপার-১ অব ২০০১।

৩. তদেব।

৪. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯১।

৫. তদেব।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জুলাই, ২০০১।

৯. তদেব।

১০. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উপ সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৩০ আগষ্ট, ২০০১।

১১. টাকা মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন বা কোন অনুদান হিসেবে দেওয়া হয় কি না, বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ নেই,

১২. দশটি জেলা হল : বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, সূত্র - অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০০০-২০০১, স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১৩. তদেব।

১৪. ৭ই জুন, ২০০১ এর টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার কোলকাতা সংস্করণে প্রকাশিত বিমলা রামচন্দ্রনের নিবন্ধ দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখুন।

১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ, ২০০১।

১৬. তদেব।

১৭. উত্তর প্রদেশের একই পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য কিংডম অ্যান্ড মুজাম্মিল (২০০১)।

১৮. পুরুলিয়ার হেট জারগো গ্রামে তাঁর বাড়িতে ১২ জুলাই, ২০০১ এ গবেষকদের সাক্ষাৎকার।

১৯. ১১ জুলাই, ২০০১ এ ঝালদা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে তাঁর দফতরে সাক্ষাৎকার।

২০. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ২৪ জুন, ২০০১ সালে মেদিনীপুরে একটি ব্লক সদরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২১. মেদিনীপুরে ২২ জুন, ২০০১-এ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেওয়া সাক্ষাৎকার। শিক্ষক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন।

২২. ২৩ মে, ২০০১-এ সমীক্ষাকৃত জেলাগুলির একটির প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৩. অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০০০-২০০১, স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ ও ২৫ মে, ২০০১।

২৫. পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (প্রোব)।

২৬. অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০০০-২০০১, স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২৭. ডি.আই.এস.ই. রিপোর্ট, ২০০০-২০০১, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, বীরভূম।

২৮. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের দেওয়া পরিসংখ্যান হল ৬৬৯ শিক্ষক সহ ৭৬২টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। এই ৭৬২টির কেবল ৩২২টি চালু আছে। এই পরিসংখ্যান ঠিক হলে বিদ্যালয় পিছু ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮.৩৩। পরিসংখ্যান নিয়ে আমাদের সমস্যা আছে, যেহেতু অফিসার তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যানকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না।

২৯. যেহেতু অর্থপ্রদানকারী সংগঠন ইউনিসেফ নিজেরা নিজেদের মতো করে সমীক্ষা করার আগে অন্য কেউ সমীক্ষা করুক বলে চাননা জানা গেছে, তাই দফতর কোনও তথ্য দিতে রাজি ছিল না (১৬ মে, ২০০১, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর-এর উপসচিব ৩০ আগষ্ট, ২০০১-এ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ইউনিসেফ কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের সরঞ্জাম (টিএলএম) বাবদ অর্থ প্রদান করবে। অন্য খরচ রাজ্য সরকারের। পূর্বোক্ত অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে আমরা দুই ডিপিইপি জেলা বীরভূম ও পুরুলিয়ার শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করি। মেদিনীপুরে জেলা পরিকল্পনা অফিস থেকে আমরা ছাপানো একটি পাতা পাই। এতে ছাত্রদের সামাজিক/জাতিগত বিভাজনের চেহারাটা পাওয়া যায় না।

৩০. অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০০০-২০০১, স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩১. তদেব।

৩২. তদেব।

৩৩. তদেব।

৩৪. তদেব।

৩৫. তদেব।

৩৬. নির্বাচিত শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (ডিপিইপি), পুরুলিয়া, ২০০০-২০০১।

৩৭. শ্রী কল্যাণ গাঙ্গুলীর দেওয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং সহায়িকাদের পরিসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭২ ও ৭৯। যেহেতু জেলা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান স্বীকৃত পরিসংখ্যান ছিল না, তাই আমরা বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত পরিসংখ্যানই বেছে নিয়েছি।

৩৮. ১০ জুলাই, ২০০১ গবেষকদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন।

৩৯ দ্য ডেলিভারি অফ প্রাইমারি এডুকেশন, প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস অফ প্রতীচী ভবন, নভেম্বর, ২০০১।

৪০. পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন (প্রোব), সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স (নয়া দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯) - এর সহযোগিতায় (প্রোব-দল কর্তৃক) প্রস্তুত। সাধারণে 'দ্য প্রোব রিপোর্ট' বলে পরিচিত।

৪১. নিত্যা রাও, 'এডুকেশন : কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ানটিটি সামারি', এডুকেশন ক্যাম্পেন, সেপ্টেম্বর ২০০১-০২, এপ্রিল ২০০০ - এপ্রিল ২০০১ এ সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরামের রিপোর্ট।

৪২. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে গ্রামের ভিতর প্রাইমারি স্কুল আছে সে রকম কিছু গ্রাম -- যেমন, বীরভূমের ইসলামপুর বা পুরুলিয়ার ঘাগরজোড়ি বা ভাদসাতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কোনও সাড়া জাগাতে পারেনি। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাঁচা চালের বরাদ্দ এবং বিনামূল্যে ইউনিফর্ম (সমস্ত তফসিলী জাতি/জনজাতি ঘরের মেয়েদের) এবং অন্যান্য জাতির ২৫ শতাংশ মেয়েদের বিতরণ করা হয় তাই শিশু এবং তাদের মাতা-পিতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ই বেছে নেন। কিন্তু আমরা এমন তিনটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র দেখেছি যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভালই ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়। এ রকম একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে পুরুলিয়ার হেট জারগো গ্রামে। সেখানকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে তফসিলী জাতি ঘরের ছেলেমেয়েদের দ্বারা পূর্ণ। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। প্রধান কারণ জাতের বিভেদ বা বিদ্বেষ। পুরুলিয়ার কলমায় আবার বর্ণহিন্দুরাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বদলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান "আশানুরূপ নয়"। বীরভূমের গড়গড়িয়া গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি হেট জারগোর মতো -- জাতে উঁচু ঘরের মা-বাবা'রা তাঁদের বাচ্চাদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান না, যেহেতু ডোম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বসতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডোম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ বড়ই কম, যেহেতু বিশাল সংখ্যাগুরু বাবুদের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তারা নিষ্প্রভ সংখ্যালঘু।

৪৩. পরিসংখ্যান ১৯৯৩-৯৪-এর। সূত্র: মঞ্জু নরুলা এবং শ্রীলেখা মজুমদার, এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (নয়া দিল্লি, বিকাশ, ২০০১)।

৪৪. পুরুলিয়ায় অস্পৃশ্যতাবোধ যতটা দেখা গিয়েছে, মেদিনীপুরে তা ততটা তীব্র নয়। যেমন, গোপীবল্লভপুরে ব্লকের দুটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই তফসিলী জাতি/জনজাতি ঘরের বাচ্চারা পড়ে, কিন্তু সহায়িকারা অন্য জাতির। কিন্তু তবুও এতে কোনও সমস্যা হয় না। এর অনেকানেক কারণের একটি হল সাধারণভাবে ব্লকে দীর্ঘকাল ধরে (১৯৬৯-এ শুরু হয়ে এখনও চলছে) চলা ভূমিসংস্কার আন্দোলন-এর মাধ্যমে ব্লকের একটা সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে।

৪৫. "কেমন আছেন মাস্টাররা" (প্রহসন ধর্মী কবিতা), মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, সহ শিক্ষক, কুঞ্জবিহারী জুনিয়ার প্রাইমারি স্কুল, বোলপুর।

৪৬. অবনী সাহা, 'কুম্ভকর্ণ ও তালের বড়া', হিমানীশ গোস্বামী সম্পাদিত 'সব গল্পই মজার' (কোলকাতা, ১৯৯৮)।

৪৭. মাহাতো – একটি আধা জনজাতি সম্প্রদায়, কিন্তু তফসিলী জাতি ও জনজাতি-র আওতায় পড়েননা। খেতমজুরদের মধ্যে যাঁরা তফসিলী জাতি বা জনজাতির মধ্যে পড়েন না তাঁদের একটা বিরাট অংশ আসেন এই মাহাতো সম্প্রদায় থেকে। পুরুলিয়াতে পাওয়া এইরকম খেতমজুরদের ১২টির মধ্যে ১০টি পরিবারই এই বর্গের লোক।

৪৮. শুঁড়ি – যে কোনো হিন্দু বর্ণের মতো শুঁড়িদেরও একটি বৃত্তিগত মূল আছে। শুঁড়িরা নৃতাত্বিক ব্যাখ্যায় মদ্য ব্যবসায়ী এবং মদ্য প্রস্তুতকারক। পরে তাঁরা অন্যান্য ছোট ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের তফসিলী জাতিভুক্ত করা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী ঝাড়খন্ডে এঁরা অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণি (ওবিসি)র অন্তর্গত। ঝাড়খণ্ড এবং ঝাড়খন্ডের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী বহু স্থানে শুঁড়িদের বড় ধরণের শোষক সম্প্রদায় হিসাবে দেখা হয়। যদিও তাঁরা তফসিলী জাতি, তবু সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরে একজন ডোমের সঙ্গে একজন শুঁড়ির পার্থক্য বর্ণহিন্দু গোয়ালা বা সদগোপের সঙ্গে পার্থক্যের মতোই।

সন্দর্ভ

১. দ্রেজ জঁ ও অমর্ত্য সেন (১৯৯৭) ঃ ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট : সিলেক্টেড রিজওনাল পার্সপেকটিভস্, ক্ল্যারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড।

২. পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন (প্রোব) (১৯৯৯) : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লি।

৩. রোগ্যালি বেন, বারবারা হ্যারিস্-হোয়াইট ও সুগত বোস (সম্পাদিত) (১৯৯৯) : সোনার বাংলা? অ্যাগ্রারিয়ান চেঞ্জেস ইন রুরাল বেঙ্গল : সেজ, দিল্লি।

৪. কিংডন, গীতা গান্ধী ও মহম্মদ মুজাম্মিল ঃ আ পলিটিক্যাল ইকনমি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া : দ্য কেস অফ ইউ পি-I (২০০১) : ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লি, ভল্যুম XXXVI, নং ৩২, ৭ আগস্ট, ২০০১।

৫. কিংডন, গীতা গান্ধী ও মহম্মদ মুজাম্মিল : আ পলিটিক্যাল ইকনমি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া : দ্য কেস অফ ইউ পি-II (২০০১) : ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লি, ভল্যুম XXXVI, নং ৩৩, ১৮ আগস্ট, ২০০১।

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ৭ জুলাই, ২০০১।

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ২৫ মার্চ, ২০০১।

৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ২৫ মার্চ, ২০০১।

৯. দ্য হিন্দুস্তান টাইমস্, পাটনা, ১৩ মে, ২০০১

১০. দ্য টেলিগ্রাফ, কোলকাতা, ২০ জুন, ২০০১।

১১. দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ৭ জুন, ২০০১।

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ৩ জুলাই, ২০০১।

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ২৪ জুলাই, ২০০১।

১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ১৪ জুলাই, ২০০১।

১৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ১০ জুলাই, ২০০১।

১৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০০১।

১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০০১।

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ১ আগস্ট, ২০০১।

১৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, কোলকাতা, ৭ আগস্ট, ২০০১।

২০. অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০০০-২০০১, ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল।

২১. ডি.আই.এস.ই. রিপোর্ট, ডি.পি.ই.পি., বীরভূম, ২০০০-২০০১।

২২. ডি.আই.এস.ই. রিপোর্ট, ডি.পি.ই.পি., পুরুলিয়া, ২০০০-২০০১।

২৩. প্রভিশনাল পপুলেশন টোটালস্, সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ২০০১।
২৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা : অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০০১।
২৫. দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ৭ নভেম্বর, ২০০১।
২৬. দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ৩০ নভেম্বর, ২০০১।

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির বাইরে যাঁদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা

১.	অসিকার রহমান	বাইতাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২.	হারাধন ঘোষ	ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩.	গদাধর দাস	গড়গড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	লখন চন্দ্র মণ্ডল	ভালুকা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	বিনয় দাম	ছাতিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	সোনা রথ	তলকুই প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	নিত্যানন্দ রায়	ধেড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	অবিনাশ পাত্র	তলপানিজা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯.	অধীনচন্দ্র বারিক	টিকায়েতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১০.	গঙ্গারাম মণ্ডল	বেলিয়াঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়
১১.	গোপাল পাত্র	বৈকুণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২.	ছবি মাহাতো	ভাদসা প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৩.	বিভা মুখোপাধ্যায়	ঘাগরজোড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৪.	চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	লৌলাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৫.	অনাদি চরণ মাহাতো	খুদিটাঁড় প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬.	ভোলানাথ মাঝি	কলমা প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	অবনী চরণ চৌধুরী	হেট-জারগো প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা

১.	ফিরদৌসি বেগম	সূচপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২.	সুমিত্রা ঘোষ	সূচপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩.	মীনা বেগম	ইসলামপুর ছোটলাইন পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৪.	ব্রজরাণী সাধু	ইসলামপুর ছোটলাইন পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৫.	শান্তিলতা নায়েক মণ্ডল	গড়গড়িয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৬.	পুতুল ব্যানার্জি	গড়গড়িয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৭.	প্রণতি মণ্ডল	ডেমুরতলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৮.	পার্বতী কোঁড়া	ডেমুরতলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৯.	ইরা দুয়া মন্ডল	সোতেরডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১০.	অনুরূপা রায় ঘোষ	সোতেরডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১১.	সবিতা পাত্র সামন্ত	সোতেরডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১২.	রেখা সিংহ	সোতেরডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

১৩. বনলতা মিশ্র — খেড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৪. সুষমা বালা পাল — খেড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৫. চম্পারাণি সাউ — বরোমানিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৬. অজয়রাণী ভুঁইয়া — বরোমানিয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৭. ভবানী দে সাউ — গোপীনাথপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৮. প্রণতি মণ্ডল গিরি — গোপীনাথপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
১৯. মীরা মন্ডল — বৈদ্যপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২০. প্রীতিকণা চক্রবর্তী — বৈদ্যপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২১. চিন্ময়ী সেনগুপ্ত — বৈদ্যপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২২. আভা দে — চাঁদপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৩. কৃষ্ণা নাগ — চাঁদপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৪. অনীতা আরি — চাঁদপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৫. জানকী সহিস — ভাদসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৬. সুগন্ধী মাহাতো — ভাদসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৭. পুতুল চট্টোরাজ — ঘাগরজোড়ি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৮. আশিসকণা মুখার্জি — ঘাগরজোড়ি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
২৯. মায়া ব্যানার্জি — লৌলাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩০. মমতা চ্যাটার্জি — লৌলাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩১. মালতি মাহাতো — কুলটাঁড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩২. মল্লিকা মাহাতো — কুলটাঁড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩৩. শ্রীমতী গোস্বামী — কলমা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
৩৪. বাণী চ্যাটার্জি — হেট জারগো শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

অন্যান্য

১. সত্যরঞ্জন মাহাতো — প্রাক্তন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২. বজরঙ্গী মাহাতো — সভাপতি, ঝালদা-১ পঞ্চায়েত সমিতি
৩. শচীন চ্যাটার্জি — সভাপতি, পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতি
৪. পদ্মাবতী মাহাতো — সভাপতি, পুরুলিয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি
৫. সি.পি.আই.(এম)-এর একটি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক
৬. গৌতম ঘোষ — সভাপতি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, বীরভূম
৭. অতনু চ্যাটার্জি — ডিপিআরডিও, বীরভূম
৮. সুকুমার পাল — বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), নানুর
৯. শ্যামসুন্দর দত্ত — প্রধান শিক্ষক, নিজুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর
১০. স্টিফেন মারাণ্ডি — প্রধান শিক্ষক, কুরুলমতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর
১১. বংশগোপাল চৌধুরী — রিসোর্স টিচার, ডিপিইপি, রাজনগর
১২. কাশী খান — প্রধান, খেড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
১৩. একজন খেতমজুর — খেড়ুয়া
১৪. দীপা দাস — সভাপতি, মেদিনীপুর সদর পঞ্চায়েত সমিতি

১৫. জেলা পরিকল্পনা অফিসার	মেদিনীপুর
১৬. জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক)	মেদিনীপুর
১৭. গোরাচাঁদ দাস	সভাপতি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, মেদিনীপুর
১৮. শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ	জেলাপরিষদ, মেদিনীপুর
১৯. সুবল মারাণ্ডি	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-ইন-চার্জ, গোপীবল্লভপুর-১
২০. রমেশ বিশাল	সচিব, গোপীবল্লভপুর গ্রামপঞ্চায়েত
২১. বিডিও	পুঞ্চা, পুরুলিয়া
২২. চিত্ত দৈবজ্ঞ	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-ইন-চার্জ, ঝালদা-১
২৩. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার	পুরুলিয়া
২৪. কল্যাণ গাঙ্গুলি	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-ইন-চার্জ, জেলাপরিষদ, পুরুলিয়া
২৫. রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর	ডি.পি.ই.পি., বীরভূম
২৬. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ	কুঞ্জবিহারী জুনিয়র প্রাইমারি স্কুল, বোলপুর
২৭. ডি. কে. চক্রবর্তী	উপসচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পর্ব : ৪

সম্পূরক সমীক্ষা

কোলকাতায় ১০ নভেম্বর, ২০০১-এ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানের রিপোর্টটি পেশ করেন। এর পরে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাদান সংক্রান্ত কর্মনীতি[১] নির্ধারনের প্রশ্নে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আমাদের কাছে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীসহ বহু মানুষ যেখানে সাধারণভাবে আমাদের অনুসন্ধানের সঙ্গে একমত হয়েছেন, নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ সম্পর্কে সেখানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিশেষ করে (ক) বিদ্যালয়-ভিত্তিক অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলির গঠন ও তাঁদের হাতে অর্থ মঞ্জুর করার ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার প্রশ্নে এবং (খ) দুপুরের খাবার সম্পর্কে। ওই সময়েই রাজ্য সরকারের প্রাইভেট টিউশন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে (মূলত সংবাদপত্রে) এবং সমস্ত রাজ্যের ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রান্না করা দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক চলছিল।[২]

এ কথা মাথায় রেখে আমরা আবার পুনরুসন্ধান শুরু করি। আমাদের এই রিপোর্টে যে ১৮টি গ্রামের আমরা সমীক্ষা করি সেগুলো আবার ঘুরে দেখি। প্রথমবার যে উত্তরদাতারা আমাদের সমীক্ষাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন তাঁদের মতামত নিতে আবার যাই। প্রাথমিক অনুসন্ধানের একটা বাংলা অনুবাদ করে সমীক্ষার গ্রামগুলিতে বিতরণ করা হয় এবং নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নাবলী নিয়ে সেই একই উত্তরদাতাদের কাছে যাওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০০২ সালে ওই ১৮টি গ্রামে আমরা আবার যাই। প্রধান সমীক্ষায় ২১২ জন উত্তরদাতা ছিলেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে তাঁদের সকলের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ উত্তরদাতারা যেহেতু খেতমজুরি করেন তাই তাঁদের অনেকেই মরসুমি কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন - বা অন্য কোনও দূরের গ্রামে, কাজের খোঁজে। মনোনীত ১৮টি গ্রাম থেকে ১৭৪ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ১০৫ জন (৬০ শতাংশ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের এবং ৬৯ জন (৪০ শতাংশ)৩ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগামী শিশুদের অভিভাবক। নির্বাচিত পরিবারগুলি ছাড়াও গবেষকরা অন্য লোকদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে আলাপ আলোচনা করেন।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

নির্বাচিত গ্রামগুলি ফিরে দেখা আমাদের রিপোর্টের ফলকেই জোরদার করে। সব গ্রামেই গবেষকরা প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিচালনা সম্পর্কে অভিযোগ শোনেন; শিক্ষকদের অনুপস্থিতি আর ছাত্রদের কম হাজিরা; শিক্ষার মান; শ্রেণি এবং জাতের চূড়ান্ত ভেদাভেদ; কম শিক্ষক সংখ্যা এবং অ-পর্যাপ্ত পরিকাঠামো; দুর্বল পরিদর্শন ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

শিক্ষার নিচু মানের জন্য অভিভাবকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে প্রাইভেট টিউশন ছাড়া তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা সম্ভব নয়। ''মাস্টাররা পড়ায় আর কান থাকে বাসের দিকে, এমন কি পড়ানোর সময়ও'', একজন উত্তরদাতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন।

কিছু শিক্ষকদের জাতপাত আর শ্রেণি বিভেদের মনোভাবের ফলে ''নীচু'' জাতের

ছাত্রদের বাবা-মা'য়েরা গভীর যন্ত্রণাদায়ক বঞ্চনায় ভোগেন। এক মায়ের কাছে এক মর্মস্পর্শী গল্প শোনা যায় – কীভাবে তাঁর মেয়ে উঁচু জাতের বাচ্চাদের কাছে মার খায়, এবং যখন সে শিক্ষকদের কাছে এর বিহিত চাইতে যায়, তখন তাঁকে কীভাবে বার করে দেওয়া হয়।

দুপুরের খাবার সম্পর্কে একই অভিযোগ শোনা যায়, যা আমরা আগেও শুনেছি। এক প্রধান অভিযোগ করেন, নিচুমানের খাবারের অনিয়মিত জোগান, খাবার নিয়ে দুর্নীতির। এক পিতা বিদ্রূপ করে বলেন যে সাধারণতঃ ধান ভাঙার সময় ওজন কমে, কিন্তু এখানে (অর্থাৎ চাল বিতরণের সময়ে) চালের ওজনও কমে যায়।

আমাদের মূল অনুসন্ধানের সময় আমরা দেখেছিলাম যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রাথমিক স্কুলের চেয়ে ভালভাবে পরিচালিত। আমরা ফিরে গিয়ে আবার দেখলাম যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া বাচ্চাদের মা-বাবা'রা তাই-ই মনে করেন। কোন কোন গ্রামে আমরা দেখি যে মা-বাবা'রা তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করেছেন। তাঁরা চান তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা — শুকনো চাল নয়।

তবে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যে সবই ভাল তা নয়। মূল রিপোর্টে আমরা যা বলেছি, যে সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অবস্থান আর সহায়িকার নির্বাচন স্থানীয় প্রয়োজন আর মনোনয়নে অগ্রাধিকারের কথা মনে রাখেনি সেগুলির অবস্থা শোচনীয়।

পুরুলিয়ার এক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা মনোনীত হয়েছেন উঁচু জাতের থেকে আর ছাত্ররা সব নিচু জাতের। সেখানে সহায়িকা আর ছাত্রদের মধ্যে থাকে একটা লাঠি। সহায়িকারা তাঁদের জাতের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য ওই লাঠি দিয়ে ছাত্র পড়ান যাতে 'নীচু' জাতের ছাত্রদের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি না হয়ে যায়। আর এক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা নিয়োগ হয়েছে কোনও এক রাজনৈতিক দলের নির্দেশ অনুযায়ী। সেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

কোনও কোনও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের বাবা-মা'য়েরা সহায়িকা মনোনয়ন সম্পর্কে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যেখানে কেবল জনজাতির বাচ্চারাই পড়ে, সেখানে পঞ্চায়েত সহায়িকা মনোনীত করা হয়েছে উঁচু জাতের থেকে। যদিও স্থানীয় লোকেরা চেয়েছিলেন জনজাতি সম্প্রদায়ের সহায়িকা, যাতে শিক্ষক আর ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়।

আগে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজের সময়সীমা ঠিক করতো শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কমিটি বা গ্রামের স্থানীয় লোকেরা। কিন্তু সম্প্রতি মেদিনীপুরের এক বিডিও অফিস থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সময়সীমা বদল করা হয় প্রাইমারি স্কুলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য - সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত। (আগে ছিল সকাল ৬.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত)। বাবা-মায়েদের অভিযোগ, এর জন্য হাজিরা কমে গেছে। কারণ বাচ্চারা দিনের বেলায় সংসারের কাজকর্ম করে (গরু চরানো, ছোট ভাই-বোনদের দেখভাল করা, ইত্যাদি)। কোনো কোনও সহায়িকা অভিযোগ করেছেন যে বাচ্চারা এই সময় বদলের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারছে না। দুপুরের প্রচণ্ড তাপে বাচ্চারা পড়ায় মন দিতে পারে না। ওদের ভীষণ খিদেও পায় (অনেক ঘরে জলখাবার রান্না হয় বেলার দিকে, খালি পেটে স্কুলে আসা বাচ্চারা পড়ায় মন দিতে পারে না) আর দুপুরের পর, সহায়িকারা খুব অল্পই সময় পান বাচ্চাদের পড়ানোর, কেন না বাচ্চাদের আগেভাগে ছেড়ে দিতে হয়। সহায়িকারা মনে করেন, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা চালু হলে সুফল মিলবে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সাফল্যের চাবিকাঠি, স্থানীয় সম্পদকে অল্প খরচে সঠিক কাজে লাগানোয়। যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তা হলে কিন্তু উপরের কু-দৃষ্টান্তগুলিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগকে বানচাল করে দেওয়ার বিধ্বংসী শক্তি থেকেই যাবে।

পরিকাঠামো, উৎসাহদান পরিকল্পনা, যোগ্য শিক্ষক ইত্যাদির ব্যাপারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের তুলনাই চলে না। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগামী শিশুদের পিতা-মাতারা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামোর দুর্বলতা এবং উৎসাহদান প্রকল্পের অভাবের কথা তুলে বারবার অভিযোগ করেছেন। এই বৈষম্য সত্ত্বেও আমাদের পরিদৃষ্ট শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভাল কাজ করতেই দেখা গেছে। প্রধানত সেটা মানুষের উদ্দীপনা এবং অংশগ্রহণের জন্য। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কৃতিত্বের গতি অব্যাহত রাখার পথে এক ভীতিকর বাধা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক খবরদারি।

কর্মপন্থা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলির অনুদান মঞ্জুর বা তার পুনর্মূল্যায়নের ক্ষমতা

আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানের রিপোর্ট মুক্তি পাবার অনতিবিলম্বে আমরা স্কুল-ভিত্তিক অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলি সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ সম্পর্কে নানা অভিমত পেয়ে থাকি। আমাদের সুপারিশ ছিল এ ধরনের কমিটিগুলিকে বৈধ ক্ষমতাধারী করে তোলা। যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রশাসনে অধিক সংখ্যক জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

আমাদের সুপারিশ সম্পর্কে জন-প্রতিক্রিয়াগুলি শ্রেণি বিভাজনের ভিত্তি উদ্ভূত। প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রকাশিত হওয়ার পরদিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ আমাদের একজনের একটি ছোট দলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দলে ছিলেন মেদিনীপুর জেলার দুই ধীবর এবং কোলকাতার দুই ব্যাঙ্ক কর্মচারী, যাঁদের প্রথমোক্তরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই বিশেষ সুপারিশটিই কেবলমাত্র প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থার গতিবিধিকে ঠিক রাস্তায় চালাতে পারবে। 'অশিক্ষিত' ধীবরের সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য ছিল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের। তাঁরা এই ধারণা খারিজ করে দিয়েছিলেন।

আমাদের অনুসন্ধান কর্মের সময়ও এই বিভাজন রেখাটি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা গিয়েছিল। বেশির ভাগ শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য শিক্ষিত লোক যাঁরা গ্রাম্য সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেন, তাঁরা এটাকে সমর্থন করেন না, অন্যদিকে গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী লোক যেমন কৃষক, মজুর, কারিগর, ইত্যাদি সবাই চান এমন একটি অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি যা,

১) প্রত্যেকটি স্কুলে থাকবে

২) বিভিন্ন সংগঠন, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সদস্য দ্বারা তৈরি হবে

৩) অনুদান দেওয়া বা পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে যার আইনী ক্ষমতা থাকবে। ১৭৪ জন বাবা-মা'র (যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে) তাঁদের মধ্যে ১৩৭ (৭৯ শতাংশ) জন বাবা-মা মনে করেন প্রতি স্কুলের অভিভাবক-শিক্ষক কমিটির হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত, অনুদান দেওয়া এবং তার সঠিক ব্যবহারের। মাত্র ১৩ জন (৭ শতাংশ) বাবা-মা এটা সমর্থন করেন না এবং ২৪ জন (১৪ শতাংশ) এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি কীভাবে গঠন করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে ৮৫ জন (যাঁরা সমর্থন করেন তার ৬২ শতাংশ) মনে করেন গ্রামবাসীরা এক সঙ্গে বসে কমিটি গঠন করবেন; ১৩ জন (১০ শতাংশ) মনে করেন মাতা-পিতারা মিলে কমিটি সদস্যদের নির্বাচন করবেন; ১১ জন (৮ শতাংশ) মনে করেন সদস্যরা পঞ্চায়েত দ্বারা মনোনীত হবে; ১৭ জন (১২ শতাংশ) মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সদস্য নির্বাচন করবেন; আর ১১ জন (৮ শতাংশ) কোনও মতামত দেননি।

সারণী ১ : অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি তৈরির পন্থা

গ্রামবাসীদের বৈঠক	৮৫ (৬২ শতাংশ)
পঞ্চায়েত দ্বারা মনোনয়ন	১১ (৮ শতাংশ)
মাতা-পিতাদের নির্বাচন	১৩ (১০ শতাংশ)
শিক্ষক দ্বারা নির্বাচন	১৭ (১২ শতাংশ)
কোনও উত্তর নেই	১১ (৮ শতাংশ)

বেশির ভাগ উত্তরদাতা সংশয় প্রকাশ করেন যে, যদি পঞ্চায়েত সদস্য বা শিক্ষকদের দিয়ে গঠিত হয় তাহলে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হবে।

সব মা-বাবা'ই মনে করেন কমিটিতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য থাকা উচিত। মাত্র তিনজন (২ শতাংশ) মনে করেন যে কমিটিতে শুধু শিক্ষিত লোক থাকবেন আর তিনজন (২ শতাংশ) কোনও মতামত দেননি।

সারণী ২ : অভিভাবক-শিক্ষক কমিটির সদস্য কে হবেন

সব শ্রেণি এবং জনগোষ্ঠীর মহিলা-পুরুষ	১৩১ (৯৬ শতাংশ)
শুধুমাত্র শিক্ষিত লোক	৩ (২ শতাংশ)
মতামত দেননি	৩ (২ শতাংশ)

বেশিরভাগ তফসিলী জাতি এবং জনজাতির উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালানোর ব্যাপারে তাঁদের মতামত নেওয়া হয় না। তাঁরা বলেন যে তাঁরা (বাবা-মা'য়েরা) তাঁদের সন্তানদের সম্পর্কে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে শিক্ষকরা তাতে কোন গুরুত্ব দেন না।

মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে বর্তমান স্কুল এবং গ্রামের শিক্ষা কমিটিতে মহিলাদের নেওয়া হয় না। 'শুধু বাবারা যায়'। মেদিনীপুরের এক গ্রামে, একদল তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের মহিলা মনে করেন যে মায়েরাই পারেন অমনোযোগী শিক্ষকদের উচিত শিক্ষা দিতে। তাই মহিলাদের কমিটিতে নেওয়া উচিত। তাঁরা স্কুল পরিচালনা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ এবং অসহায়, কারণ তাঁরা মিটিংয়ে বসতেই পারেন না। অনেক গ্রামেই মায়েরা এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে কিছু সংখ্যক মায়েরা মনে করেন যে শুধু বাবাদেরই এই কমিটি মিটিংয়ে যাওয়া উচিত।

অনেক বাবা-মা (৫১ শতাংশ) মনে করেন বিভিন্ন শ্রেণি এবং সম্প্রদায় থেকে সদস্য নেওয়া উচিত। "নইলে গরিব আর দুর্বল লোকেরা কোথায় কথা বলবে? "আপনারা কেন মনে করেন সব শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের সদস্য কমিটিতে থাকা উচিত?" এই প্রশ্নের

উত্তরে আমরা নিম্নলিখিত উত্তর পাই।

সারণী ৩ : কেন সব শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের সদস্য কমিটিতে নেওয়া উচিত?

মহিলারা তাঁদের মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন	১৫ (১১ শতাংশ)
সঠিক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন	৭০ (৫১ শতাংশ)
শিক্ষকরা নিচু জাতের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন	৭ (৫ শতাংশ)
ছাত্রদের সুবিধের জন্য	৯ (৭ শতাংশ)
সমাজের সঠিক প্রতিফলনের জন্য	১৫ (১১ শতাংশ)
বিভিন্ন শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের জন্য	১৫ (১১ শতাংশ)
কোনও মতামত নেই	২২ (১৫ শতাংশ)

(একটি উত্তর অন্যটির সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়)

দুপুরের খাবারের কর্মসূচি

প্রচলিত 'দ্বিপ্রাহরিক আহার কর্মসূচি' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা সংখ্যা বাড়াতে পারেনি। অনেক উত্তরদাতা (৭৮ শতাংশ) জোর দিয়ে বলেছেন যে এই কর্মসূচির (৩ কেজি চাল প্রতি মাসে মাথা পিছু) বদলে ছাত্রদের প্রতিদিন ঠিকমতো খেতে দেওয়া উচিত। মাত্র ১২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এখনকার পরিকল্পনা ঠিক। কারণ বিতরিত চাল গোটা সংসারের কাজে আসে, আর বাচ্চাদের খাবার শুধু তাদের জন্যই হবে। ৭ শতাংশ মনে করেন বাচ্চাদের খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আর ৩ শতাংশ কোনও উত্তর দেননি।

মূল রিপোর্টে দেখা গেছে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া ছাত্ররা, যারা গরিব পরিবার থেকে আসে, তারা এই দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্পের আওতায় পড়ে না। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাচ্চাদের বাবা-মা'য়েদের মধ্যে ১০০ শতাংশ মনে করেন যে তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রদের বাবা-মা'য়েদের মতামত নিচের সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী ৪ : দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্প সম্বন্ধে মতামত

চাল বিতরণের বদলে দৈনিক খাবার	১৩৫ (৭৮ শতাংশ)
চাল বিতরণ	২০ (১২ শতাংশ)
খাবার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন	১৩ (৭ শতাংশ)
কোনও উত্তর নেই	৬ (৩ শতাংশ)
মোট	১৭৪ (১০০ শতাংশ)

তবে বাচ্চাদের খাবার দেওয়ার ব্যাপারে নানা মত আছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কেউ কেউ দুপুরে খাবার দেওয়ার নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে মতামত দেন যে বাচ্চারা ডাল ভাতের চেয়ে কেক, বিস্কুট আর মিষ্টি বেশি পছন্দ করবে। কেউ বা রান্না করা

খাবার পরিবেশন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, "রান্না আর শিক্ষা একই সঙ্গে হয় না, তাতে না রান্না হয়, না শিক্ষাদান হয় (যদি রান্না করা খাবার দিতে হয়)। বরং তাঁরা মনে করেন রাজ্য সরকার শুকনো খাবার যেমন "খানিকটা মুড়ি, কিছুটা চালভাজা, পাঁউরুটি বা কলা" দিলে গরিব বাচ্চারা আকৃষ্ট হবে।

আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যেও আমরা এরকম কিছু স্বর শুনতে পাই। ৪৮ শতাংশ বাবা-মা মনে করেন বিস্কুট, পাউরুটি, চকোলেট আদর্শ খাবার। তাঁদের মতে এই ধরনের খাবার বাচ্চাদের স্কুলের দিকে আকৃষ্ট করবে, হাজিরা বাড়াবে, একই সঙ্গে রান্না করার ঝামেলাও এড়ানো যাবে। তাঁরা মনে করেন রান্না শিক্ষকদের সময় নিয়ে নেবে আর তাতে শিক্ষার মান আরও খারাপ হবে। আশ্চর্যের বিষয় ৭৮ শতাংশ বাবা-মা'রা কেউ (যারা শুকনো খাবারের পক্ষে) তফসিলী জাতি/জনজাতি অন্তর্ভুক্ত নন।

অন্যদিকে, ৫২ শতাংশ বাবা-মা রান্না করা খাবারের পক্ষে। এঁদের বেশিরভাগই (৮৪ শতাংশ) তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের। শুকনো খাবার দেওয়ার কথায় অনেক উত্তরদাতা কৌতুক প্রকাশ করে বলেন, "পাউরুটি, বিস্কুট তো বড়লোকদের খাবার"।

সারণী ৫ : দুপুরের খাবার কর্মসূচি সম্পর্কে মতামত

সম্প্রদায়	খাবারের ধরণ	
	রান্না করা	কাঁচা খাবার
তফসিলী জাতি	২৫ (৩৬)	৯ (১৪)
তফসিলী জনজাতি	৩৪ (৪৮)	৫ (৮)
অন্যান্য	১১ (১৬)	৫১ (৭৮)
মোট	৭০ (৫২)	৬৫ (৪৮)

শুধুমাত্র ১৩৫ জন বাবা-মা যাঁরা চাল বিতরণের প্রচলিত পন্থার বদলে দৈনিক আহার দেওয়ার সপক্ষে (সারণী ৪ দেখুন), তাঁদের মতামত এখানে দেওয়া হল এখানে। (বন্ধনীর সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

এখানে যে শুধুমাত্র সম্প্রদায়ভিত্তিক মতামত পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, শ্রেণিভিত্তিক অভিমতও মিলছে। কিছু তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের উত্তরদাতা ছাড়া, যাঁরা শ্রমজীবী, তাঁরা রান্না করা খাবারের সপক্ষে, কারণ, তা তাঁদের সন্তানদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

মূল রিপোর্টে এক গ্রামের উল্লেখ আছে যেখানে লোকেরা কেবল একবেলা খান।[৪] সেখানে ফিরে গিয়ে আমরা দেখি গ্রামবাসীরা প্রবলভাবে রান্না করা খাবারের পক্ষে। "খাবারের অভাবই বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার পথে বাধা। ওরা সারাদিন ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে, পেটের খিদে মেটানোর জন্য", এক উত্তরদাতা বলেন।

মেদিনীপুরের এক গ্রামে একটি বাচ্চা স্কুল পালিয়ে খড় কুটো যোগাড়ে যায়, বদলে এক চাষীর বাড়ি থেকে কিছু মুড়ি পাবে। তার বাবা-মা তাকে সকালে কিছু খেতে দিতে পারেননি।

আমরা এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি। এর থেকে মনে হয় যে গরিব বাচ্চারা শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই স্কুলে যেতে পারে না। আর স্কুলে না যাওয়ার জন্য শ্রেণিবিভেদ আর সামাজিক প্রভেদ আরও বাড়তে থাকে।

ক্ষুধা, অশিক্ষা আর শ্রেণিবিভেদের দুষ্ট চক্র

পুরুলিয়ার খুদিটাঁড় গ্রামের বাসিন্দারা এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন। এক জোতদারের অনেক জমি ছিল। স্থানীয় লোকেরা জানতে পারেন যে সেই জমি গরীব শবরদের নামে নথি করা আছে। কেউই অবশ্য ঠিকমত জানেন না। কারণ "বিলোনো জমির পাট্টা জোতদারের কাছেই থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সেই জমির ফসল জোতদারই পায়", "আর আমরা উয়ার কাজে গতর খাটি"। "আমরা পড়ালিখা নাই জানি, যে করে সে বাবুরা করে", তাঁরা বলেন, আমরা যদি পড়তে জানতাম তা হলে তো আমরা "জেলারো" (জুনিয়র ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার) অফিসে গিয়ে জেনে আসতে পারতাম ব্যাপারটা। আমাদের মধ্যে শুধু একজন শিক্ষিত লোক আছে, কিন্তু তাকে নেতারা পাত্তা দেয় না।

গ্রামবাসীরা বলেন, "*আমাদের ভিতরে পড়ালিখা জানা লোক দু দশজন বেশি থাকলে কি আর ইরকম হত?*"

শিক্ষাবর্জিত এই গরিব মানুষগুলি যে শুধু কৃষিসংস্কারের থেকে সুবিধা পাননি তা নয়, তাঁরা আরও নানা দু:খকষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন। গ্রামের প্রায় সব পরিবারই স্থানীয় মহাজনদের ঋণে জড়িয়ে আছে। এই মহাজনরা অন্তত ৫০ শতাংশ বার্ষিক সুদে টাকা ধার দেন। গ্রামবাসীদের নিজেদের সামান্য জমি বাঁধা দিতে হয় ধার শোধ করার জন্য। "মূর্খের দুর্গতি অনেক হে!" এক বিমর্ষ গ্রামবাসী বলেন।

প্রাইভেট টিউশন

"টাকাই সব বলে"। বীরভূমের এক চাষীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য প্রাইভেট টিউশন অপরিহার্য কি না, তখন এই ছিল তার উত্তর। তাঁরা সন্তানকে প্রাইভেট টিউশন দিতে পারে না শুধু টাকার অভাবে আর মনে করেন যারা খরচ করতে পারে তারা শিক্ষা "কিনতে" পারে।

আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ১১৬ জন (৬৭ শতাংশ) মনে করে প্রাইভেট টিউশন অপরিহার্য। "প্রাইভেট না দিলে অক্ষর পরিচয়ও হবে না", এক উত্তরদাতা বলেন। কিন্তু ৪৮ জন (২৭.৫ শতাংশ) মনে করেন প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন নেই। ১০ জন (৫.৫ শতাংশ) এর উত্তর দেননি।

সারণী ৬ : প্রাইভেট টিউশন কি অপরিহার্য?

হ্যাঁ	১১৬ (৬৭)
না	৪৮ (২৭.৫)
উত্তর নেই	১০ (৫.৫)
মোট	১৭৪ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

উত্তরদাতাদের মতে প্রাইভেট টিউশনের অপরিহার্যতার মূল কারণ স্কুলে পড়ানোর নিম্ন মান। অন্য কারণের মধ্যে আছে "প্রাইমারি স্কুলে কম সংখ্যক শিক্ষক", "বাচ্চারা বাড়িতে পড়াশোনা করে না", "ভাল ফলের জন্য বাড়তি চেষ্টা", আর "যাদের পয়সা আছে তারা তা খরচ করে"।

সারণী ৭ : কেন প্রাইভেট টিউশন অপরিহার্য

স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কম	১৪ (১২)
বাড়ির কাজে সাহায্য	১৭ (১৫)
নিচু মানের শিক্ষা	৪৫ (৩৯)
বাড়িতে সাহায্য না মেলা	১৩ (১১)
যারা খরচ করতে পারে তারা প্রাইভেট টিউশন নেয়	১২ (১০)
ভাল ফলের জন্য বাড়তি চেষ্টা	১৫ (১৩)

(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

যে সব বাবা-মা মনে করেন প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন নেই তাঁরা বলেন এটা বন্ধ করা যাবে শুধুমাত্র স্কুলের শিক্ষার মান উন্নত করে।

প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার উপায়

দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট টিউশন শুধু যে সমাজ-মানসের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে গেছে তাই নয়, এটা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন -- আজকাল প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের উপর নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করছেন। শিক্ষকরা সাধারণত এটাকে তাঁদের অধিকারের উপর জুলুম বলে মনে করছেন। সব দিক থেকে সমালোচনার জন্য সরকারকে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে হচ্ছে, যদিও এখনও কোর্টে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়নি।[৫]

যদিও কিছু বাবা-মা মনে করেন প্রাইভেট টিউশন অপ্রয়োজনীয়, বেশির ভাগ বাবা-মা'ই (৭২ শতাংশ) মনে করেন প্রাইভেট টিউশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত নয়। অনেকে মনে করেন এর ফলে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার হাল আরও খারাপ হবে। প্রায় সবাই মনে করেন প্রাইভেট টিউশন নিষেধ হলে যাঁরা তার জন্য ব্যয় করতে পারেন তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের ভাল শিক্ষা দিতে পারবেন না। এমন কী যে সব বাবা-মা নিজেরা প্রাইভেট টিউশনের জন্য ব্যয় করতে পারেন না তাঁরাও মনে করেন যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁদের বঞ্চিত করা উচিত নয়।

মাত্র ১৭ শতাংশ বাবা-মা মনে করেন প্রাইভেট টিউশন নিষেধ করা উচিত, আর ১১ শতাংশ কোন উত্তর দেয়নি। মজার ব্যাপার, যাঁরা মনে করেন প্রাইভেট টিউশন নিষেধ করা উচিত তারা আর্থিক ভাবে সবচেয়ে নিচু স্তরের। আর সবাই বলেন যে এটা করা যাবে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার মান উন্নত করে।

সারণী ৮ : প্রাইভেট টিউশন কি নিষেধ করা উচিত?

হ্যাঁ	৩০ (১৭)
না	১২৬ (৭২)
উত্তর নেই	১৮ (১১)
মোট	১৭৪ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

প্রাইভেট টিউশনের আর্থিক সংগতি

আমাদের মূল অনুসন্ধানে আমরা দেখেছি ৪৫ শতাংশ ছাত্র প্রাইভেট টিউশন নেয়। পরের অনুসন্ধানে সংখ্যাটি সামান্য বেশি। ১৭৪ ছাত্রের মধ্যে ৮০ (৪৬ শতাংশ) জন প্রাইভেট টিউশন নেয়।

২৬ জন (৩৩ শতাংশ) বাবা-মা (যাঁদের সন্তানরা প্রাইভেট টিউশন নেয়) বলেন যে প্রাইভেট টিউশনের খরচ মেটানো তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য নয় আর ৬ জন (৭.৫ শতাংশ) উত্তর দেন নি। ৪৮ জন (৬০ শতাংশ) বলেন যে এই খরচ তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যেহেতু বেশির ভাগই কৃষি বা অন্যান্য মজুরি-নির্ভর কাজের সঙ্গে যুক্ত এইসব সংসারে তাই আর্থিক অনটন থাকা খুবই সম্ভব - বেশির ভাগ উত্তরদাতা এটাই বলেন। "কিন্তু পড়াতে তো হবে।"

৩৫ জন বাবা-মা যাঁদের পক্ষে প্রাইভেট টিউশন কষ্টসাধ্য, তাঁদের অনেকে (৭৩ শতাংশ) বলেন যে তাঁরা অনেক কষ্ট করে এই খরচ মেটান, অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে। ৯ জন (১৯ শতাংশ) বলেন যে তাঁদের ঋণ নিতে হয়েছে প্রাইভেট টিউটরকে বেতন দেওয়ার জন্য। ৪ জন (৮ শতাংশ) বলেন যে তাঁরা প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে জনমজুরি করে মাইনে বাবদ খরচ শোধ করেন।

সারণী ৯ : প্রাইভেট টিউশনের খরচ মেটানোর সমস্যা

প্রাইভেট টিউশন নেয়	প্রাইভেট টিউশন নেয় না	মোট	প্রাইভেট টিউশনের খরচ কষ্টসাধ্য	হ্যাঁ	না	উত্তর নেই	মোট
৮০ (৪৬)	৯৪ (৫৪)	১৭৪ (১০০)		৪৮ (৬০)	২৬ (৩৩)	৬ (৭)	৮০ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

সারণী ১০ : প্রাইভেট টিউশনের খরচ মেটে কীভাবে?

অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে	৩৫ (৭৩)
ধার নিয়ে	৯ (১৯)
জনমজুরি খেটে	৪ (৭)
মোট	৪৮ (১০০)

(বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক)

উপসংহার

আগেই যা বলা হয়েছে, বীরভূম, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়ার ১৮টা গ্রাম পুনর্দর্শন আমাদের মূল অনুসন্ধানের ফলকেই জোরদার করে। বহু সংখ্যক উত্তরদাতা বলেন, কেউ কেউ খুবই উৎসাহ নিয়ে, অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিতে বাবা-মায়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত করতে পারে। তাঁদের মতে, বাবা-মায়েরা এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার সাহায্য করতে পারেন এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে পারেন। এর থেকে আমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে চিন্তার সূত্র পাই।

দ্বিতীয়ত, যদিও অনেক উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার এখনকার হালে প্রাইভেট টিউশন অপরিহার্য, তবু অনেক বাবা-মা-ই মনে করেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য এতে রদবদল করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যয়হীন ও সার্বজনীন করে তুলতে এবং প্রাইভেট টিউশনের ব্যয় বহন করতে যাঁরা পারেন না তাঁদের প্রতি সুবিচারের দিকে তাকিয়ে বাবা-মা'র এই প্রত্যাশাকে সক্রিয় সংগ্রামে পরিণত করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁদের মতামত থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক আবহাওয়া সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা এখনও সদ্ভাব এবং প্রীতির শক্তিতে বিশ্বাস রাখেন। এই শক্তিকেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চতুর্থত, বিদ্যালয়-শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে তফসিলী জাতি/জনজাতি সম্প্রদায়ের এবং নারীদের সাহায্যের আগ্রহকে মূলধন করে সমতা এবং সুবিচার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

এর পাশাপাশি আমাদের অনুসন্ধান, দুপুরের খাবার, প্রাইভেট টিউশন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, পরিকাঠামোগত সুবিধা, শিক্ষকদের নিয়োগ ইত্যাদি সমস্যার সত্বর প্রতিকার দাবি করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পাওয়া উৎসাহ/সুবিধেগুলি শিশু শিক্ষা কেন্দ্ররও পাওয়া উচিত এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রর পরিকাঠামোগত দুর্বলতার দিকে অনতিবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার।

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এতদিন অব্যবহৃত একটি বিশাল সম্পদ রয়ে গেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীন ও সমস্ত রকমের হস্তক্ষেপ ও বিভেদমুক্ত করে তোলা আমাদের গুরুতর প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সামনে এগোতে এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত্ নয়।

টীকা

১. দ্রষ্টব্য, অমর্ত্য সেন লিখিত মুখবন্ধ এবং রিপোর্টের মূল অংশ (অনুচ্ছেদ ১.৫) "কর্মপন্থার রদবদল"।

২. ২০০১ সালের মে মাসে পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (রাজস্থান) সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ায় 'খাদ্যের অধিকার' নামে একটি আর্জি পেশ করেন। ওই দরখাস্তে ভারতে সঞ্চিত বিশাল খাদ্য ভান্ডারকে ক্ষুধার প্রতিকারে অনতি বিলম্বে ব্যবহারের জন্য আবেদন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট, ২৮ নভেম্বর ২০০১ সালে, একটি তাৎপর্যময় "অন্তর্বর্তিকালীন আদেশ" দেন। দুপুরের খাদ্য সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ নিম্নরূপ ছিল, "আমরা রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিকে দুপুরের খাদ্য কর্মসূচীকে সম্পাদন করতে বলছি। সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতি বিদ্যালয়ে দুপুরে রান্না করা খাবার বিতরণ করে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে হবে। দৈনিক বিতরণযোগ্য রান্না করা খাবারে কম করে ৩০০ গ্রাম ক্যালরির সমান খাদ্যপ্রাণ এবং ৪-১২ গ্রাম প্রোটিন থাকতে হবে। (বছরে) কম করে ২০০ দিন এই খাবার দিতে হবে। যে সব সরকার কাঁচা খাবার দেয় রান্না করা খাবারের বদলে তাদের তিন মাসের মধ্যে রান্না খাবার দিতে হবে রাজ্যের অর্ধেক জেলার (দারিদ্র্যের ক্রমানুসারে) সব সরকারি আর সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলে। আর পরের তিন মাসের মধ্যে রান্না করা খাবার দিতে হবে রাজ্যের বাকি স্কুলে।

আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে আর ফুড করপোরেশনকে (এফ.সি.আই.) নির্দেশ দিচ্ছি যাতে যথেষ্ট ভাল শস্য সময়মত দেওয়া হয়। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আর এফ.সি.আই.কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন এক সঙ্গে খাদ্যশস্য পরিদর্শন করা হয়। যদি পরিদর্শনের সময় দেখা যায় খাদ্যশষ্যের ভাণ্ডার যথেষ্ট ভালমানের নয়, এফ.সি.আই. তা বদল করে দেবে।" (ভারত জ্ঞানবিজ্ঞান সমিতির চিঠি থেকে প্রাপ্ত, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০২)।

৩. তবে আমরা প্রাথমিক স্কুল এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর তথ্য আলাদা করে পরবর্তী রিপোর্টে পরীক্ষা করিনি যেহেতু বিচার্য বিষয়গুলি সাধারণ কর্মনীতি বিষয়ক।

৪. ১৬ নং গ্রামের ছবি দ্রষ্টব্য। গ্রাম - কুলটাঁড়-খুদিটাঁড়, ব্লক - পুঞ্চা, জেলা - পুরুলিয়া, আর মূল রিপোর্টের বক্স নং ২।

৫. দ্রষ্টব্য, "প্রাইভেট টিউশন ব্যান : কান্ট ডু ইট নাউ", দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ৬ জানুয়ারি, ২০০২।

প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন

দ্বিতীয় খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা : বাধা ও সম্ভাবনা

গবেষক দল

কুমার রাণা

স্যমন্তক দাস

অমৃতা সেনগুপ্ত

আব্দুর রফিক

শুভ্রাংশু সাঁতরা

অরিন্দম মুখার্জি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অন্তরা দেব সেন
অনুপ সেনগুপ্ত
অরবিন্দ নন্দী
এ. জে. ফিলিপ
গৌতম ঘোষ
জ্যঁ দ্রেজ
লিবি টি. জনসন
মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ
নিত্যা রাও
রেজাউল করিম
সত্যপ্রসাদ চৌধুরী
সৌমিক মুখার্জি
সুবির জানা
সুমিতা মুখার্জি
এবং
আমাদের সকল উত্তরদাতা

১। ভূমিকা

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের গবেষকদল, ট্রাস্টের অধ্যক্ষ অমর্ত্য সেনের দিশা নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার উপর একটি সমীক্ষার কাজ শেষ করে। তিনটি জেলা, মেদিনীপুর, বীরভূম ও পুরুলিয়া ছিল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকের। রাজ্যের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে এবং সমগ্র পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণতর ছবি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতীচী গবেষকদল প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরি করার পর পরই অন্য তিনটি জেলাতে একটি একইরকম সমীক্ষার কাজ শুরু করে।

জেলাগুলি হল মধ্যবঙ্গে বর্ধমান, মধ্য-পূর্ব বঙ্গে মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং। তিনটি জেলা থেকে নির্বিচার চয়ন পদ্ধতিতে (Random Sampling) দশটি ব্লককে বেছে নেওয়া হয়। আমাদের আগেকার করা সমীক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী বর্ধমান ও মূর্শিদাবাদ জেলা থেকে তিনটি করে ছ'টি ব্লক বেছে নেওয়া হয়, কিন্তু দার্জিলিং-এর ক্ষেত্রে এর প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক গঠনের কারণে আমাদের একটু পরিবর্তন করতে হয়। দার্জিলিং এর চারটি মহকুমার মধ্যে তিনটি (দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং) কে নিয়ে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ (DGHC) নামে স্বয়ংশাসিত পরিষদটি গঠিত। পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো পশ্চিমবাংলার মূল প্রশাসনিক কাঠামোর থেকে বেশ কিছুটা আলাদারকম। দার্জিলিং জেলার অন্য মহকুমাটি (শিলিগুড়ি) সমতলে অবস্থিত ও তার প্রশাসনিক কাঠামো রাজ্যের সাধারণ কাঠামোরই অন্তর্ভুক্ত। এই বৈচিত্র্যের কারণে, এবং জেলাটির একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার জন্য আমরা দার্জিলিং-এর গোর্খা পার্বত্য পরিষদ থেকে দু'টি ব্লক ও শিলিগুড়ি মহকুমা থেকে দু'টি ব্লককে নিরপেক্ষভাবে বেছে নিই।

সমীক্ষার জন্য প্রতিটি ব্লক থেকে দু'টির হিসেবে মোট কুড়িটি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়, যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। মোট ২০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ২০ জন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক-সহায়িকা (১৮ জন সহায়িকা ও ২ জন সহায়ক) ও সমাজের বিভিন্ন অংশের ৩৫০ জন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে আমরা কথা বলি।

এঁরা ছাড়াও আমরা গ্রাম শিক্ষা কমিটি (VEC)র সদস্য, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা, সরকারি আধিকারিক, পঞ্চায়েত এবং অসরকারি সংগঠনের (NGO) অধিকারী, শিক্ষক সংঘের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং অন্যান্য বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলি।

আমাদের প্রথম প্রতিবেদনের মতোই বর্তমান সমীক্ষাটিতেও নমুনার সংখ্যা বেশ ছোট, কিন্তু সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলির একরূপিতা ও প্রথম প্রতিবেদনের ফলাফলগুলির সঙ্গে সাযুজ্য থেকে এ কথা বলা চলে যে, প্রতিটি রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য না হলেও আমাদের প্রতিবেদন থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় -- অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত যতটা না নিশ্চয়তামূলক তার চেয়ে অনেক বেশি ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু সেগুলিতে অনেক বেশি উন্নতি ঘটাতে হবে।

- গৃহ-শিক্ষকতার উপর নির্ভরতা। এটি যে নিজেই একটি দুষ্ট ব্যাধি শুধু তা-ই নয়, গৃহ-শিক্ষকতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে শ্রেণিগত বিভাজনের মাত্রা আরো প্রকট হচ্ছে। গৃহ-শিক্ষকতার ব্যাপকতা ও এর অনিবার্যতা থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ শ্রেণির শিশুরা। অধিকাংশ মাতা-পিতাদের মধ্যে এই ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল যে, গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিশুদের লেখাপড়া হবে না।
- মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ রূপায়ণ সম্পর্কে অসন্তোষ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য পিতা-মাতাদের আগ্রহ ও উৎসাহ।
- সমাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রেণির শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কাজে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ইতিবাচক ভূমিকা।
- মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে তাঁদের শিশুদের শিক্ষা আহরণের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'মুসলমানরা তাঁদের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না', সমাজে বিশেষত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা গভীরভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

৩। বস্তুগত পরিস্থিতি

শিক্ষা গ্রহণের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা

শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ও অন্যান্য বিভাজন নির্বিশেষেই মাতা-পিতারা কোনোমতেই নিরক্ষরতা ও অশিক্ষাকে তাঁদের শিশুদের ভবিতব্য বলে মেনে নিতে রাজি নন। মাতা-পিতাদের কথা অনুযায়ী, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই তাঁদের এটা শিখিয়েছে যে সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য সমস্ত রকম রাস্তাই তাঁদের খুঁজে বার করতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষা ছাড়া কোথাওই এক পা অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁরা মনে করেন। সংক্ষেপে, বর্তমান সমীক্ষাটিতে মাতা-পিতাদের আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত তথ্যগুলি আমাদের আগের প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ।

* ৩৫০ জন পিতা-মাতার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী।
* ২৬৯ জন শিশুর মধ্যে শতকরা ৯৮.৫ ভাগই পড়াশুনো চালিয়ে যেতে চায়।

শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আকাংখা এত বেশি যে ৩৫০টি পরিবারে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের মোট ৪৩৪টি শিশুর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশই এমন পাওয়া গেছে যারা কখনোই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। শিশুদের ভর্তি না করার পেছনে একটি বড় কারণ হিসাবে বলা হয়েছে তাদের স্কুলে পাঠাবার বয়স সম্পর্কে অভিভাবকদের ধারণা -- বেশ কিছু অভিভাবক মনে করেছেন যে পাঁচ বছর বয়সটা স্কুলে পাঠানোর জন্য বেশ কম। অনাগ্রহবশত স্কুলে ভর্তি না করার ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটের নিম্ন হার ও শিক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে। স্কুলে ভর্তি হওয়া মোট শিশুর মধ্যে মাত্র ০.৫ শতাংশ (২ জন)কেই স্কুল ছুট হিসাবে

প্রতীচী ট্রাস্টের প্রথম প্রতিবেদন – একটি পুনরালোচনা

বর্তমান সমীক্ষাটিতে এগোবার আগে প্রতীচীর প্রথম শিক্ষা প্রতিবেদনটির প্রাপ্ত ফলাফলগুলির উপর সংক্ষেপে নজর দেওয়াটা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হবে। তিনটি জেলা থেকে প্রথম প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছিল। তিনটি জেলা থেকে নির্বিচার চয়ন পদ্ধতিতে (Random selection) বেছে নেওয়া ৯টি ব্লক থেকে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-র সমীক্ষার ভিত্তিতে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ২১২ জন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল। এ ছাড়াও বর্তমান সমীক্ষার মতোই অন্যান্য বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল।

প্রথম প্রতিবেদনটির ফলাফলগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আশা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা নৈরাশ্য ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল। আশার কারণ হল অভিভাবকদের মধ্যে তাঁদের সন্তানসন্ততিদের পড়ানোর জন্য প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কারণগুলি ছিল, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতি; শিক্ষার নিম্ন মান; গৃহ-শিক্ষকতার উপর চূড়ান্ত নির্ভরতা; জাতি ও জনগোষ্ঠী-গত বঞ্চনা; মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের সীমিত রূপায়ণ; পরিচালনায় অযোগ্যতা সহ অন্যান্য নানান বিষয় যার মধ্যে ছিল পরিকাঠামোর স্বল্পতা (বিশেষত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে) ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অপ্রতুলতা (বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে)।

নীতি সংক্রান্ত যে পরামর্শগুলির কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল সেগুলিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বাধাদানকারী দুষ্ট ক্ষতগুলিকে অপসারণ করার দিকে। প্রধান পরামর্শগুলির মধ্যে ছিল – শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়া শিক্ষার মানকে উন্নত করার মাধ্যমে গৃহ-শিক্ষকতাকে অপসারণ করা, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ ও অন্যান্য বৈষম্যগুলিকে দূর করা, একটি প্রকৃত মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প চালু করা, প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন করা (যে কমিটির হাতে বিদ্যালয়ের অর্থমঞ্জুরী সংক্রান্ত আইনী ক্ষমতা থাকবে), পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

২। বর্তমান সমীক্ষাটির প্রধান ফলাফলগুলি

বর্তমান সমীক্ষাটি থেকে পাওয়া তথ্যগুলি আগেকার সমীক্ষাটির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি হল :

- অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের বিপুল আকাংখা (সমস্ত শ্রেণি, জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গের মানুষের মধ্যেই); প্রাথমিক স্তরে ভর্তির উচ্চহার ও স্কুলছুটের নিম্নহার।
- ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির নিম্ন হার। অবশ্য বর্তমান সমীক্ষাটিতে আগেরটির তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থা দেখা গেছে।
- শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অসন্তোষ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার নিম্ন মান। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশই প্রায় কিছুই শিখতে পারে না। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অবস্থাটি কিছুটা ভাল,

পাওয়া। এই ছুটের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অসুবিধা বা অন্যান্য পারিবারিক সংকটকে দেখানো হয়েছে।

সারণী - ১ : ভর্তি ও স্কুলছুটের হার

৫-৯ বছর বয়সের মধ্যে মোট শিশুর সংখ্যা	বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি আছে	কখনোই ভর্তি হয়নি	স্কুলছুট
৪৩৪	৪১২ (৯৪)*	২০ (৫)	২ (০.৪৬)

* বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

আমাদের সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যাগুলিও শিক্ষার আকাংখার দিকটিকেই শক্তিশালী করে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ২২৫ জন করে ও প্রতিটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে গড়ে ৬১ জন করে শিশু ভর্তির হিসাব পাওয়া গেছে। যেহেতু সমীক্ষা চালাবার সময় বেশির ভাগ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রতেই কেবল দুটি শ্রেণিই চালু ছিল (প্রথম ও দ্বিতীয়), সেই হিসাবে শিশু ভর্তির অংকটিকে বেশ বড়ই বলা যায়।[২]

পরিকাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মাতা-পিতাদের সচেতনতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিশেষত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে উচিত পরিকাঠামো নির্মাণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়ানোর চাহিদা বেড়ে উঠেছে। আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের ভিড়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় উপচে পড়ার অবস্থা। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীর তুলনায় জায়গা অনেক কম। বহু শিশুকেই, বিশেষত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে খোলা আকাশের নীচে পাঠগ্রহণ করতে দেখা গেছে। এমন কি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও জায়গার অভাবে বেশ কিছু শিশুকে বাইরে বসতে দেখা গেছে। চাহিদার তুলনায় যোগানের অপ্রতুলতার এটি একটি পরিষ্কার চিত্র।

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে স্কুল পিছু ভর্তির গড় সংখ্যা ছিল ৭৯ (আমাদের সমীক্ষাকৃত কেন্দ্রগুলিতে এই সংখ্যাটি ছিল ৭৮)। সমগ্র জেলার শিক্ষার্থী ও সহায়িকাদের গড় অনুপাত ছিল ৩৫:১ (আমাদের সমীক্ষাকৃত কেন্দ্রগুলিতে সংখ্যাটি ছিল ৩১:১)। তথ্যগুলি এই জন্য উল্লেখের দাবি রাখে যে 'মুসলমানরা শিক্ষায় অনাগ্রহী' সাধারণ প্রচলিত ধারণাটি উপরোক্ত তথ্যগুলির দ্বারা খন্ডিত হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ এমন একটি জেলা যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগই মুসলমান। এ ছাড়া, আমাদের সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছ'টির মধ্যে চারটিতেই কোনো অমুসলমান শিক্ষার্থী ছিল না। প্রতিটি বিদ্যালয়ই শিশুদের ভিড়ে ঠাসা। মুসলমান মাতা-পিতারা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিত করানোর ব্যাপারে কতটা ব্যগ্র সেটা বোঝা যায় যখন একজন শিক্ষক বলেন, "আমাদের সমস্যাটা শিশুদের ভর্তি করানো নিয়ে নয়, সমস্যাটা (মুসলমান) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে আটকানোর।"

শিক্ষক-শিক্ষিকা

সারা পশ্চিমবাংলার তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক স্কুল পিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার গড় সংখ্যা তিনের কাছাকাছি (২.৯৮)। বলা বাহুল্য সংখ্যাটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশ ছোট।[৩] আমাদের সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্কুল পিছু গড় শিক্ষকের সংখ্যাটি পাওয়া গেছে ৪.৩ এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত পাওয়া গেছে ৫০:১। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বন্টনটি এমনভাবে করা হয়ে থাকে যে দেখা গেছে যখন কোনো স্কুলে ১০০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একজন মাত্র শিক্ষক স্কুল চালাচ্ছেন, তখন অন্য একটি স্কুলে একই সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য আছেন ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

শিক্ষকদের সংখ্যার স্বল্পতাটি সবচেয়ে তীব্র আকারে দেখা গেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সারা জেলায় প্রতি স্কুল পিছু গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪০ (আমাদের সমীক্ষাকৃত স্কুলগুলিতে সংখ্যাটি ২৯৯) এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকের গড় অনুপাত ৭১:১ (আমাদের সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই গড় অনুপাত ৮২:১)। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রপিছু গড় সহায়িকার সংখ্যা (২ জন করে) ও শিক্ষার্থী-সহায়িকা অনুপাত (৩৫:১) তুলনামূলকভাবে ভাল।

সারণী - ২ : সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত

(বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি সারা জেলার গড় হিসাব)

জেলা	প্রতিষ্ঠান পিছু গড় শিশু ভর্তির সংখ্যা		প্রতিষ্ঠান পিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা		প্রতিজন শিক্ষক পিছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
	প্রা. বি.	শি.শি.কে.	প্রা. বি.	শি.শি.কে.	প্রা. বি.	শি.শি.কে.
বর্ধমান	১৯৭ (১৭২)	৫৬ (২৮)	৪ (৩.৭)	১.৮ (২)	৪৯ (৪৬)	৩১ (১৪)
মুর্শিদাবাদ	২৯৮ (২৪০)	৭৮ (৭৯)	৩.৫ (৩.৪)	২.৫ (২.২)	৮২ (৭১)	৩১ (৩৫)
শিলিগুড়ি মহকুমা	২৪৫ (১৭২)	৬০ (৬০)	৩ (৩.১)	২.৫ (২.১)	৮২ (৫৪)	২৪ (২৮)
দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ	১২১* (২৩)	৩২ (২)	৮.৫* (১১)	২.৭	১৫	১২
সারা পশ্চিমবাংলার গড়	১৬২	৬৭.৫	৩	২	৫৪	৩৪

* দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ও শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বাড়ানোটা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মোদ্যম একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।[৫]

মনে হয়, শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ সামগ্রীর (TLM) লভ্যতার দিক দিয়ে বেশ খানিকটা অসুবিধার জায়গায় আছেন। উপরন্তু, এটাও মনে হচ্ছে যে, যতখানি সামগ্রী ও সাধন পাওয়া যাচ্ছে তার সবটুকু ঠিকভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তাঁদের অনেকেই যথেষ্ট সক্ষম নন। পশ্চিমবঙ্গ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (DPEP)র একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকারই শিক্ষণ সামগ্রী (TLM) সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণাই নেই, এবং অনেকেই যেটুকু সামগ্রী (TLM) পাওয়া গেছে তার সার্থক ব্যবহার করে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৬]

শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যার স্বল্পতা ও তাঁদের কর্মোদ্যমের সমস্যাটি আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে শিক্ষিকাদের সংখ্যার অপ্রতুলতার মধ্য দিয়ে। সারা রাজ্যে শিক্ষিকাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার মাত্র ২৫ শতাংশ[৭], আমাদের সমীক্ষাকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাওয়া সংখ্যাটি হচ্ছে ৩০ শতাংশ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যার অপ্রতুলতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আশু দৃষ্টি দানের দাবি করে। সারা রাজ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাটি ১৯৮৬ সালে ছিল ৬৫ শতাংশ, যা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে মাত্র এক একক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ শতাংশে।[৮] আরো উদ্বেগের কথা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাদের একটি ছোট প্রশিক্ষণ কোর্স (৭-১০ দিনের) ছাড়া অন্য কোনো প্রশিক্ষণই প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রাথমিক শিক্ষাদানের অবস্থা

শুধুমাত্র পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও উন্নত পরিকাঠামো থাকলেই যে প্রাথমিক শিক্ষা দানের কাজটি সুনিশ্চিত হয় না এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ, আমরা এমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখেছি, যেখানে ভালো অবস্থার তিনটি শ্রেণিকক্ষ ও চারজন শিক্ষক আছেন; অথচ সেখানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা শ্রেণির, ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র যে যোগ বিয়োগই করতে পারেনি তা-ই নয়, এমন কি অনেকেই নিজেদের নামটুকুও ঠিকমতো লিখতে পারেনি। অন্যদিকে, আর একটি স্কুলে ১৩৫টি শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিয়ে কর্মরত একজন মাত্র শিক্ষককে দেখা গেছে যাঁর পাঠদানের সাফল্য এত বেশি যে মাতা-পিতারা পার্শ্ববর্তী প্রাইভেট স্কুল থেকে তাঁদের শিশুদের ছাড়িয়ে এনে সেই সরকারি স্কুলটিতে ভর্তি করেছেন।

বস্তুত খারাপ পরিকাঠামো ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অপর্যাপ্ততা ও অর্থের অপ্রতুলতা, ইত্যাদি সমস্যাগুলি পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের একটি বৃহত্তর ও জটিল সমস্যার অংশ মাত্র।

উপস্থিতি

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির তথ্য নেওয়ার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যার্থীদের উপস্থিতির সংখ্যাটিকে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানোর একটা ঝোঁক বিদ্যমান। একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ই উঠে গিয়ে তাঁর সহকারী শিক্ষককে নির্দেশ দিয়ে আসেন সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অবশ্য

কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং সব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই আমরা সরাসরি হাজিরা বই থেকেই সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করি।

বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতার দিকটিকে যদি গুরুত্ব না-ও দেওয়া হয়, তা হলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারটি কাম্য স্তরের চেয়ে অনেক নীচে — প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ৬৫ ভাগ। উল্লেখ্য যে, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির চিত্রটি মোটামুটি একই রকম, কিন্তু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে চিত্রটি অনেক বেশি অসমরূপ — ১৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৮০ ভাগ, কিন্তু অন্য পাঁচটির ক্ষেত্রে এই হিসাবটি ছিল শতকরা ২০ ভাগেরও নীচে। তথ্যটি নীতিসংক্রান্ত একটি গুরুতর সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা আমরা ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রাপ্তির মাত্রা

উপস্থিতির খারাপ হার থেকে হয়তো অবস্থাটি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হওয়া যাবে না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-প্রাপ্তির মাত্রাটি নিশ্চিতভাবেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের করুণ অবস্থাটিকে তুলে ধরে। যারা বাড়িতে মা-বাবা কিংবা অন্য কারো সাহায্য পায়না, আবার গৃহশিক্ষকতার সাহায্যও নিতে পারে না, সেই অভাগা শিশুরা স্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে প্রায়শই বঞ্চিতই থেকে যায়। ২১১ জন শিশুর মধ্যে একটি মূল্যায়নের চেষ্টা করে দেখা গেছে যে এদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগই ঠিকমতো লিখতে বা পড়তে পারে না, শিক্ষার ন্যূনতম মানে পৌঁছানো তো দূরের কথা।[১১] শুধুমাত্র অভিভাবকরাই বলেন না, বহু শিক্ষকও স্বীকার করেন যে এই রকম খারাপ মানের কারণে বহু শিক্ষার্থীই পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে স্কুল-ছুট হয়ে যায়।[১২]

শিক্ষাদান বিষয়ে মাতা-পিতাদের মতামত

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণত মা-বাবারা খুবই তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।[১৩] সমীক্ষাকৃত বাড়িগুলিতে শতকরা ৩৭ শতাংশ মাতা-পিতাই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কার্য-নিষ্পাদন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এই রকম অসন্তোষের মাত্রা পাওয়া গেছে শতকরা ১৭ ভাগ।

সারণী - ৩ ঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্য-নিষ্পাদন সম্পর্কে মাতা-পিতাদের অভিমত

প্রতিষ্ঠান	সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬ (৬৩)	৭৪ (৩৭)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	১০১ (৮৩)	২১ (১৭)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	২৫ (৮৯)	৩ (১১)	২৮ (১০০)
মোট	২৫২ (৭২)	৯৮ (২৮)	৩৫০ (১০০)

* বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্য-নিষ্পাদনের বিষয়ে অসন্তুষ্টির মাত্রা সব থেকে বেশি পাওয়া গেছে তফসিলী জনজাতির লোকেদের মধ্যে (৪৪ শতাংশ), তার পরেই আদিবাসী (২৯ শতাংশ) ও মুসলমানদের স্থান (২৭ শতাংশ)। বর্ণহিন্দু জাতিগুলির মধ্যে অসন্তুষ্টির মাত্রা ছিল ২২ শতাংশ। এটিই বোধহয় পিছিয়ে থাকা জাতি ও গোষ্ঠীগুলির মাতা-পিতাদের বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায় এবং তাঁদের বিশ্বাসে পরিণত হয়, "মাস্টাররা তো শুধু বাবুদের ছেলে-মেয়েদেরই দেখে"।

শিক্ষকদের অনুপস্থিতি

শুধুমাত্র অভিভাবক ও সাধারণ গ্রামবাসীরাই নন, বহু পঞ্চায়েত কার্যকর্তা ও সরকারি আধিকারিকরাও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্য-নিষ্পাদনের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। একটি প্রধান অভিযোগ হল এই যে শিক্ষকরা খুব কম সময়ই স্কুলে থাকেন। প্রতীচীর গবেষকদলও বেশ কিছু স্কুলে এরকম ঘটনা দেখে এসেছেন।

সামগ্রিকভাবে সমীক্ষাকৃত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হার যেখানে ছিল শতকরা ১৯ ভাগ সেখানে তফসিলী জাতি ও জনজাতি বহুল এলাকাগুলিতে এই হার ছিল ৭০ শতাংশ। শিক্ষকদের অনুপস্থিতির মাত্রা এত বেশি যে, এমন কি সবথেকে শান্ত ও গুটিশুটি মেরে থাকা শিশুটিকেও শিক্ষকদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে সহায়িকাদের অনুপস্থিতির মাত্রা পাওয়া গেছে ১৫ শতাংশ। মজার ব্যাপার, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক অনুপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে সহায়ক (পুরুষ)দের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রগুলিতে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য ৭ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই রকম একটি দয়নীয় পরিস্থিতিতে যাঁর পক্ষে খরচ বহন করার ন্যূনতম সামর্থ্য আছে, তিনিই নিজের শিশুর পড়াশুনোর জন্য গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নেবেন।

৪। গৃহশিক্ষকতা :

"এমনকি সম্রাট আলেকজান্দারও অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে গৃহশিক্ষকতা পেয়েছিলেন", গৃহশিক্ষকতার অনিবার্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বিষয়টিকে দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত করেন। শুধু এই শিক্ষকটিই নন, মাতা-পিতাদের একটি বিরাট অংশ (৭৫ শতাংশ) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিশুদের লেখাপড়া হবে না। কথাটি এমনভাবে বলা হচ্ছে যেন, গৃহশিক্ষকতাও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনকি যে অভিভাবকরা নিজেরা তাঁদের সন্তানদের বাড়িতে পড়ার কাজে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে শিশুদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষকতা অপরিহার্য। অনেকেই বলেছেন যে, যেহেতু সহপাঠীদের বেশির ভাগই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে, সে কারণে গৃহশিক্ষকতার সাহায্য না পাওয়া শিশুদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতার ভাব গড়ে উঠতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে শিশুরা কেবল গৃহশিক্ষকের কাছেই ঠিকমতো পড়াশুনো করে, যেহেতু তারা তাঁকে ভয় পায়

এবং শিশুদের বইপত্র নিয়ে পড়তে বসানোর জন্য সবচেয়ে দরকারি হিসাবে গণ্য হয় তাদের ভয় পাওয়ানো!

গৃহশিক্ষকতার অপরিহার্যতার ধারণাটি আসলে এসেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃত অবস্থাটি থেকে। ২১১ জন শিশুর শিক্ষালাভের মান যাচাই করতে গিয়ে আমরা দেখি গৃহশিক্ষকতার সাহায্য পায়নি এমন ৫৫ জন শিশুর শতকরা ৭১ শতাংশই ঠিকমতো লিখতে পড়তে পারে না – পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যেকার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা তো দূরের কথা। অন্যদিকে যারা গৃহশিক্ষকতার সাহায্য নেয় এমন শিশুদের শতকরা ৬৭ শতাংশই ঠিকমতো পড়া, লেখা ও সাধারণ যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি করতে পেরেছে।

সারণী - ৪ : শিশুদের শিক্ষালাভের মাত্রা

বিভাগ	মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা	পড়া, লেখা ও সাধারণ যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি করতে পারা
যারা স্কুলের বাইরে কোনো সাহায্যই পায়নি	৫৫	১৬ (২৯ শতাংশ)
গৃহশিক্ষকের সাহায্য পাওয়া	১২১	৮১ (৬৭ শতাংশ)
মাতা-পিতা বা অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া	৩৫	১৮ (৫১ শতাংশ)
মোট	২১১	১১৫ (৫৫ শতাংশ)

গৃহশিক্ষকতার শ্রেণিগত দিক

গৃহশিক্ষকতার "সাফল্য" সত্ত্বেও বহু মা-বাবাই এর খরচ যোগাতে সক্ষম হয়ে ওঠেননা। খরচটি এক একজন শিশুর জন্য প্রতি মাসে ৩০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত। আমাদের বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৪২ ভাগ অভিভাবক তাঁদের শিশুদের গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। অভিভাবকদের পেশাগত পরিচয়ের সঙ্গে গৃহশিক্ষকতার সম্পর্কটিকে মিলিয়ে দেখলে এর শ্রেণিগত দিকটি পরিষ্কার হয়। যেখানে কৃষি মজুর ও অন্যান্য মজুরদের শিশুদের অধিকাংশই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে পারে না, সেখানে বিভিন্ন কৃষি বহির্ভূত পেশার লোকেদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি পরিবারের শিশুরাই এই সাহায্য নিতে পেরে থাকে। চাষী পরিবারগুলির অবস্থা এই দুই শ্রেণির মাঝামাঝি একটা অবস্থানে আছে।

সারণী - ৫ : বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে গৃহশিক্ষকতার মাত্রা

শ্রেণি	শিশুর মোট সংখ্যা	গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে	শতাংশ
চাষী	৭৪	৩০	৪১
কৃষি ও অকৃষি মজুর	১১৫	৩৩	২৯
অন্যান্য	১৬১	৮৪	৫২
মোট	৩৫০	১৪৭	৪২

এটি পরিষ্কার যে, গরিব মা-বাবার সন্তানরা গৃহশিক্ষকতার সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আর গৃহশিক্ষকের কাছে শিশুদের পড়তে পাঠানোর জন্য অধিকাংশ মা-বাবাকেই অনেকটাই আর্থিক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। গৃহশিক্ষকের কাছে শিশুকে পড়ান এরকম ১৪৭ জন অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই বলেন যে এর জন্য তাঁদের যথেষ্ট আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এর জন্য সংসারের অন্য খরচ ছাঁটাই করতে বাধ্য হন, আবার কেউ কেউ ঋণ নিতে বাধ্য হন। প্রায়শই কৃষি-মজুরদেরকে ঋণ শোধ করবার জন্য বাজার দর থেকে অনেক কম মজুরিতেই কাজ করতে হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে, একজন কৃষি মজুর তাঁর সন্তানের গৃহশিক্ষকের বেতন দেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে কিছু টাকা ঋণ নিতে হয়। সেই সময় মজুরী দর ছিল দৈনিক ৩০ টাকা। ঋণের শর্ত হিসাবেই, তাঁকে পাওনাদার চাষীর জমিতে ডিসেম্বর মাসে মজুরি খেটে সেই ধার শোধ দিতে হয়। যদিও ডিসেম্বর মাসে মজুরির বাজার দর ছিল দৈনিক ৭০ টাকা, কিন্তু সেই মজুরটিকে দৈনিক ৩০ টাকা দরেই, ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত খাটতে হয়। অর্থাৎ তাঁকে দৈনিক ৪০ টাকা করে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়!

এইভাবে দরিদ্র পরিবার থেকে আসা লোকেরাই এই ধরনের শ্রেণি বিভাজনের সব চেয়ে বড় শিকার হয়ে থাকেন। কৃষি মজুরদের পরিবার থেকে আসা শতকরা ৬৬ শতাংশ শিশুই প্রায় কিছুই শিখে উঠতে পারে না। (যেহেতু তাদের মধ্যে বেশিরভাগই অর্থনৈতিক কারণে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নিতে পারে না)।

আমরা দেখেছি যে স্কুলের বাইরে গৃহশিক্ষকের কাছে কিংবা বাড়ির লোকেদের কাছে লেখাপড়ার কাজে সাহায্য পায় সেই শিশুরা সাহায্য না পাওয়া শিশুদের তুলনায় সাধারণত ভালো ফল করে থাকে। দেখা গেছে যে স্কুলের বাইরে যারা কোনো রকম সাহায্যই পায় না সেরকম শিশুদের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগই আসে শ্রমিক পরিবারগুলি থেকে। এই শিশুদের মাতা-পিতাদের আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের লেখাপড়ার কাজে বাড়িতে সাহায্যদানের মতোও যথেষ্ট শিক্ষাগত ক্ষমতাও তাঁদের থাকে না।

মোট ৩৫০ শিশুর মধ্যে ৭১ জন (২০ শতাংশ)ই স্কুলের বাইরে কোনো রকম সাহায্যই পায়নি। এদের মধ্যে ৪১ জনেরই (৫৮ শতাংশ) মা-বাবারা মজুরি করে সংসার চালান।

দুঃখের বিষয়, গৃহশিক্ষকতাও সব ক্ষেত্রেই শিশুদের শিক্ষালাভের মান সুনিশ্চিত করতে পারে না। এই ব্যর্থতাটি বিশেষ করে ঘটে থাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণি থেকে আসা শিশুদের ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি যে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শিশুদের মধ্যে ৪০ জনের (৩৩ শতাংশ) শিক্ষালাভের মাত্রা আদৌ সন্তোষজনক নয়। এটাতে হয়তো খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই যে এদের মধ্যেকার ৩৫ জনই (৮৮ শতাংশ) মজুর পরিবারগুলি থেকে আসা — যাদের অধিকাংশই তফসিলী জাতি ও জনজাতিভুক্ত। একটি প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষকের কথায় : "গৃহশিক্ষকতা জলের উপর ফেলে দেওয়া কয়েক ফোঁটা তেলের মতো, যা ভাসতে ভাসতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অভিভাবকদের মানসিকতা এখন এই রকম একটি ধারণায় আচ্ছন্ন যে, প্রাইভেট না দিলে ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া হবে না। ফলে, এমনকি দরিদ্রতম মজুরটিও প্রবলভাবে চেষ্টা করে যান তাঁর সন্তানকে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ানোর খরচ যোগাতে। নিয়তির পরিহাস, শিক্ষাদানের ক্ষমতা সম্পর্কে সেই মজুরটির বিন্দুমাত্র ধারণা থাকে না। আবার সেই গৃহশিক্ষক একই টাকা বেতন নেওয়া সত্ত্বেও সেই সব শিশুদের প্রতিই বিশেষ বা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে থাকেন যাঁদের বাড়িতে একটি শিক্ষাগত ভিত্তি আছে, অর্থাৎ যে মা-বাবারা প্রাপ্ত শিক্ষার মান যাচাই করে নিতে পারেন।"

মজুরদের এরকমই ভাগ্য। বিনামূল্যের শিক্ষা তাঁদের শিশুদের নাগালের বাইরে। আবার শিক্ষা কিনতে চাইলেও সবসময় তাঁরা সেটা করে উঠতে পারেন না!

নির্বাচিত কিছু শিশুর শিক্ষালাভ সংক্রান্ত মূল্যায়নের ফলাফল

(শিশুদের শিক্ষালাভ সংক্রান্ত মূল্যায়নটি পরিবারগুলিতে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় করা হয়েছিল। শিশুদেরকে কয়েকটি পংক্তি লেখা ও কিছু সাধারণ অঙ্ক (যথা দুই সংখ্যা বিশিষ্ট অঙ্কের যোগ) করতে বলা হয়। এছাড়াও তাদের কিছু মৌখিক প্রশ্ন করা হয়। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই মূল্যায়নটি করা হয়)

মূল্যায়ণে অংশগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা - ২১১

ক. <u>মূল্যায়নে কৃত ফলাফল</u>

* যারা পড়া, লেখা ও সহজ অঙ্ক সমাধান করতে পেরেছে (যাকে সন্তোষজনক বলা হচ্ছে) : ৫৫ শতাংশ
* যারা এগুলি করতে পারেনি (অ-সন্তোষজনক) : ৪৫ শতাংশ

খ. স্কুলের বাইরে সাহায্য ও সন্তোষজনক ফলাফল

* গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শিশু যারা সন্তোষজনক ফল করেছে : ৬৭ শতাংশ
* যে শিশুরা কেবল বাড়িতে মা-বাবা বা অন্যান্য আত্মীয়দের সাহায্য পেয়েছে (গৃহশিক্ষকের সাহায্য পায়নি) তাদের মধ্যে সন্তোষজনক ফল : ৫১ শতাংশ
* গৃহশিক্ষকের সাহায্য বা মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়দের সাহায্য না পাওয়া শিশু যারা সন্তোষজনক ফল করেছে : ২৯ শতাংশ

কৌতূহলজনক ভাবে গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ নেওয়া সত্ত্বেও যারা খারাপ ফল করেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই (৮৮ শতাংশ) মজুর পরিবারগুলি থেকে আসা।

গ. সন্তোষজনক ফল ও শিশুদের শ্রেণি-উৎস

* চাষী বাড়িগুলি থেকে আসা শিশুদের সন্তোষজনক ফল : ৮৩ শতাংশ
* চাষী ও মজুর ছাড়া অন্যান্য বাড়িগুলি থেকে আসা শিশুদের সন্তোষজনক ফল : ৮৩ শতাংশ
* মজুর বাড়িগুলি থেকে আসা শিশুদের সন্তোষজনক ফল : ৩৩ শতাংশ

ঘ. সন্তোষজনক ফল ও বিদ্যালয়ের ধরণ
* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের মধ্যে সন্তোষজনক ফল : ৫৪ শতাংশ (এদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ গৃহশিক্ষকের সাহায্য পেয়েছে)
* শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠরত শিশুদের মধ্যে : ৫৬ শতাংশ (এদের মধ্যে ১৯ শতাংশ গৃহশিক্ষকের সাহায্য পেয়েছে)

ঙ. স্কুলের বাইরে পড়াশুনোর কাজে সাহায্য লাভের ধরন
* শতকরা ৫৭ ভাগ শিশু গৃহশিক্ষকতার সাহায্য পেয়েছে।
* শতকরা ১৭ ভাগ শিশু অভিভাবক বা বাড়ির অন্যান্যদের সাহায্য পেয়েছে।
* শতকরা ২৬ ভাগ শিশু কোনো সাহায্য পায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিগত দিকটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকেও দেখা যেতে পারে। এগুলিতে পাঠরত মাত্র ১৯ শতাংশ শিশুই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। অধিকাংশ শিশুর মাতা-পিতারাই গৃহশিক্ষকের বেতন যোগাতে অপারগ। সে কারণে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তুলনামূলক ভালো কার্য্য নিষ্পাদনের সঙ্গে গৃহশিক্ষকতার তেমন একটা সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত ১২২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ শতাংশই মজুর বাড়িগুলি থেকে আসা।

গৃহশিক্ষকতার সামাজিক দিক

শ্রেণি বঞ্চনার বিষয়টি সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। নিচের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ানোর দৌড়ে আদিবাসী ও মুসলমান সমাজের মানুষরা অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। যেখানে আদিবাসী ও মুসলমান পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে ২০ ও ৩২ শতাংশই এই সুযোগ পেয়েছে, সেখানে তফসিলী জাতি ও অন্যান্য বর্ণহিন্দুদের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য পাওয়ার মাত্রা যথাক্রমে ৪৪ ও ৫৬ শতাংশ।

সারণী - ৬ : জাতি ও ধর্মের গৃহশিক্ষকতার সাহায্য গ্রহণ

বিভাগ	মোট শিশুর সংখ্যা	গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে	শতাংশ
তফসিলী জাতি	৯০	৪০	৪৪
তফসিলী জনজাতি	৩৫	৭	২০
মুসলমান	১১০	৩৫	৩২
অন্যান্য বর্ণহিন্দু	১১৫	৬৫	৫৬
মোট	৩৫০	১৪৭	৪২

যেহেতু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান নিশ্চয়তার জন্য গৃহশিক্ষকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সে কারণে আদিবাসী, মুসলমান ও তফসিলী জাতিদের মতো পিছিয়ে থাকা সামাজিক গোষ্ঠীগুলি একটি বহুমুখী বঞ্চনার শিকার হতে বাধ্য হন।

মুসলমানদের উদাহরণটিকেই দেখা যাক। প্রথমত, আগেই আমরা যেমনটা উল্লেখ করেছি, মুসলমান বসতিপূর্ণ এলাকাগুলি পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিদ্যালয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, বহু স্কুলেই মুসলমান শিশুরা এক ধরণের বিভেদের শিকার এবং তৃতীয়ত:, মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগেরই তাঁদের শিশুদের জন্য গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্রয় করবার সামর্থ্য নেই। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগেরই অবস্থান দারিদ্র সীমারেখার নিচে।[১৬]

তফসিলী জাতি ও জনজাতিদের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা কমবেশি একইরকম। আমাদের সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির মধ্যে তফসিলী জাতিদের ৫৮ শতাংশ ও জনজাতিদের ৬৫ শতাংশই দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করেন। এই পরিবারগুলির লোকেরাই মজুরি-নির্ভর লোকেদের একটি বড় অংশ (৫২ শতাংশ)।

এছাড়াও, মুসলিমদের মতোই, তফসিলী জাতি ও জনজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ও শিক্ষার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত অন্যদের কাছ থেকে প্রায়শই বিভেদমূলক আচরণ পেয়ে থাকে।

পিছিয়ে থাকা সামাজিক গোষ্ঠীগুলি আবার বিশেষভাবে নিরক্ষরতাজনিত সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যেকার বেশির ভাগ লোকই যেহেতু প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, সে কারণে (নিরক্ষর) মা-বাবাদের পক্ষে তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনোর ব্যাপারে সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে গৃহশিক্ষকতা কেবল যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে তা-ই নয়, এটি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দূরত্ব বাড়িয়ে তোলে।

গৃহশিক্ষকতা অবলুপ্ত করার উপায়

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে গৃহশিক্ষকতার মূলোচ্ছেদ করাটা খুব সহজ কোনো কাজ নয়। গৃহশিক্ষকতার অবলোপনের বিষয়ে মাতা-পিতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটি পরিষ্কার যে এর মূল শিক্ষাব্যবস্থারই গভীরে প্রোথিত, যার লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে গৃহশিক্ষকতার উপর চরম নির্ভরতা ও এর অপরিহার্যতা সংক্রান্ত মনোভাবের মধ্য দিয়ে।

* শতকরা ৭৫ ভাগ মা-বাবাই মনে করেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষায় গৃহশিক্ষকতা অপরিহার্য
* গৃহশিক্ষকতার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী মা-বাবাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই মনে করেছেন যে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের নিম্ন মানই এই অপরিহার্যতার জন্য দায়ী।

গৃহশিক্ষকতার অপনয়ণ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে, মা-বাবাদের মাত্র ১১ শতাংশই এর নিঃশর্ত অপনয়নের পক্ষে মত দেন। মাতা-পিতারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মানকে উন্নত করে তুলেই গৃহশিক্ষকতাকে

অপসৃত করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শিক্ষকদের দ্বারা গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে চাওয়া হলে বেশিরভাগ অভিভাবকই মন্তব্য করেছেন, এই নির্দেশ খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না, প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, গৃহশিক্ষকদের বেশিরভাগই হচ্ছেন বেকার যুব সম্প্রদায় থেকে আসা, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে নয়। এবং এই বেকার যুব-সম্প্রদায় সরকার কর্তৃক জারি করা নির্দেশের আওতায় পড়েন না। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় শিক্ষার মানকে উন্নত করে না তুলে, গৃহশিক্ষকতার উপর আইনী প্রতিবন্ধকতা জারি করার ফলটি ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি হবে।

বহু উত্তরদাতাই মনে করেছেন, যাঁরা গৃহশিক্ষকতার খরচ যোগাতে পারেন, তাঁদেরকে এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। যাঁরা নিজেরা এই খরচ করতে অপারগ, তেমন অভিভাবকদেরও বেশিরভাগই এই মত পোষণ করেন।

কেবলমাত্র, বিদ্যালয় শিক্ষার মানকে সুনিশ্চিত করেই প্রাথমিক স্তরে গৃহশিক্ষকতার দুষ্ট ব্যাধিটিকে নির্মূল করা সম্ভব ও সেই সঙ্গে পিছিয়ে থাকা শ্রেণিগুলির মধ্যে, "সামাজিক সমতা বিধানের পূর্বশর্ত" শিক্ষার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

৫। উৎসাহবর্ধক প্রকল্প সমূহ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মূলত তিন ধরনের উৎসাহবর্ধক যোজনা চালু আছে। প্রথমটি হচ্ছে মধ্যাহ্ন আহার (মিড্-ডে-মিল) — যা প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত সব শিশুকে (শতকরা ৮০ ভাগ উপস্থিতির ভিত্তিতে) প্রতিমাসে তিন কেজি করে চাল বিতরণের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি এই প্রকল্পের আওতার বাইরে।[১৮]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র উভয় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা। তৃতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে, প্রাথমিক স্কুলের তফসিলী জাতি ও জনজাতিদের সকল মেয়েদের মধ্যে ও অন্যান্য জাতির (মুসলমান সহ) মেয়েদের শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে এর আওতায় আনা হয়নি।

মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প

শিক্ষকদের একাংশের কথায়, বহু ছাত্র-ছাত্রীই কেবলমাত্র ক্ষুধার তাড়নায় হয় স্কুল থেকে পালিয়ে যায় অথবা পাঠদানে মনোযোগ দিতে পারে না। আমাদের প্রথম সমীক্ষাটিতে আমরা এই ক্ষুধার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্তমান সমীক্ষাটিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি আগেরটির চেয়ে বিরাট আলাদা কিছু নয়। সে কারণে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে মা-বাবাদের অভিমতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সারণী - ৭ : শিশুদের পাওয়া সাহায্য

উৎসাহবর্ধক প্রকল্প সমূহ	প্রাথমিক বিদ্যালয়		শিশু শিক্ষা কেন্দ্র		মোট	
	পেয়েছে	পায়নি	পেয়েছে	পায়নি	পেয়েছে	পায়নি
মিড-ডে-মিল (চাল)	১৯১ (৯৬)	৯ (৪)	—	১২২ (১০০)	১৯১ (৫)	১৩১ (৪১)
পাঠ্যবই	১৯০ (৯৫)	১০ (৫)	১০৩ (৮৪)	১৯ (১৬)	২৯৩ (৯১)	২৯ (৯)
পোশাক	২৪				২৪	
উত্তরদাতার সংখ্যা	২০০		১২২		৩২২	

* বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

যদিও প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত শিশুদের মা-বাবাদের ৯৬ শতাংশই মিড-ডে-মিল (বস্তুত চাল) পাওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু বিতরিত চালের পরিমাণ ও বিতরণ করার সময় সম্পর্কে নানারকম মত পাওয়া গেছে। যেখানে কেউ কেউ বলেছেন যে প্রতি শিশু প্রতিমাসে ৩ কেজি করে চাল পেয়েছে, অনেকেই আবার বলেছেন যে প্রতি শিশু তিন-চার মাস অন্তর চার, পাঁচ বা ছয় কেজি করে চাল পেয়েছে। কিছু অভিভাবক জানান যে তাঁদের শিশুরা মাসে ৭৫০ গ্রাম করে চাল পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, বহু মাতা-পিতারই বিভিন্ন উৎসাহ-বর্ধক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

মা-বাবাদের মতোই, উৎসাহ-বর্দ্ধক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদেরও নানান অভিযোগ রয়েছে। প্রায় সমস্ত শিক্ষকই বর্তমান মিড-ডে-মিল প্রকল্পটি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এই প্রকল্পটির বদলে শিশুদের জন্য কিছু 'টিফিন' খাবার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। মাত্র দশ শতাংশেরও কম মাতা-পিতা বলেছেন যে প্রকল্পটি (চাল বিতরণের) যেমন চলছে তেমনই আরও ভালভাবে চলা উচিত।

মিড-ডে-মিল প্রকল্প সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ চাওয়া হলে যাঁরা এর পরিবর্তিত রূপায়ণের পক্ষে তেমন মাতা-পিতাদের (২৯২ জন) ৮৬ শতাংশই চালের জায়গায় দৈনিক খাদ্য সরবরাহের প্রকল্প চালু করার কথা বল্লেন।

সরবরাহকৃত খাদ্যের প্রকৃতি নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে দুই ধরণের মত পাওয়া গেল। যেখানে শতকরা ৪৩ ভাগের অভিমত হল স্কুলের বাচ্চাদের রান্না করা খাবার দেওয়া উচিত, সেখানে শতকরা ৫৭ ভাগ মনে করেছেন যে বাচ্চাদের কিছু শুকনো খাবার (টিফিন) দেওয়া উচিত। যেখানে মজুরি-নির্ভর পরিবারগুলির ৭০ শতাংশই রান্না করা খাবারের পক্ষে মত দিয়েছেন, সেখানে অন্যান্য পরিবারগুলির মাত্র ২০ শতাংশই এর পক্ষে বলেছেন। যেখানে মজুরদের মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ শুকনো খাবারের (টিফিন) পক্ষে, সেখানে অন্যান্যদের মধ্যেকার ৭৩ ভাগই চান যে চালের জায়গায় বিস্কুট, পাঁউরুটি, ইত্যাদি চালু হোক।

সহজবোধ্য কারণেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত শিশুদের মা-বাবাদের শতকরা ৯৮ ভাগই চান যে এই কেন্দ্রগুলিতেও মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প চালু হোক।

ঠিকমতো রূপায়িত হলে, মধ্যাহ্ন আহার (রান্না করা খাবার) প্রকল্পটি শুধু যে শিশুদের উপস্থিতির হারই বাড়িয়ে তুলবে তা-ই নয়, এটি, বিশেষত দরিদ্র বাড়িগুলি থেকে আসা শিশুদের পুষ্টির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন যেরকমটা বলেছেন, "এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি খাদ্যের সমস্যাটি কোনো অলঙ্ঘনীয় বাধা নয়", বিশেষত, "যে দেশে ছয় কোটি টনেরও বেশি খাবার সরকারি গুদামে মজুত আছে।" এবং সরকারের উপর বাড়তি অর্থনৈতিক বোঝাটি একটি "প্রাসঙ্গিক বিষয়" হলেও সেটি, "অসম্ভব একটি ব্যাপার নয়।"[১৯] কর্নাটকের অভিজ্ঞতাটি পশ্চিমবঙ্গে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প চালু করার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।[২০]

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ

অভিভাবকদের মতে এই প্রকল্পটি শিশুদের প্রভূত সাহায্য করেছে। প্রকল্পটি চালু না হলে, হয়তো গরিব শিক্ষার্থীদের অনেককেই পাঠ্যবই ছাড়াই লেখাপড়া করতে হত (বা পড়া ছেড়ে দিতে হত) এবং বই কেনার খরচটি পড়ার অন্যান্য খরচ (খাতা, পেন্সিল, পোষাক, গৃহশিক্ষকের বেতন, ইত্যাদি)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেটিকে আরো বাড়িয়ে তুলতো। বর্তমানে এই খরচটি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বছরে ২০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে বলে জানা গেছে।[২১]

অবশ্য প্রকল্পটির রূপায়ণের কাজে আরো উন্নতি করার জায়গা আছে। সমীক্ষাকৃত সব শিশুদের মধ্যে ৯ শতাংশ (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ শতাংশ ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ১৬ শতাংশ) শিশু সমীক্ষাকৃত বছরে পাঠ্যবই পায়নি। এছাড়াও বহু অভিভাবক শিক্ষক ও শিশুদের অভিযোগ ছিল যে পাঠ্যবই প্রায়শই স্কুলে লেখাপড়া শুরু হওয়ার অনেক পরে সরবরাহ করা হয়, যা শিশুদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ

বহু মা-বাবার মতে এই প্রকল্পটি অনেক মেয়েকেই স্কুলে নিয়ে আসার কাজে বেশ সফল হয়েছে। অনেক মাতা-পিতাই জানালেন যে তাঁরা শিশুদের জন্য স্কুলে পরে যাবার মতো কাপড়ও সবসময় কিনে দিতে পারেন না। ছেলেরা যদিও কোনোরকমে একটা পোশাক পরে স্কুলে যেতে পারে, মেয়েদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে তাঁরা জানান। অবশ্য অনেক অভিভাবকের মতে প্রকল্পটির রূপায়ণ বেশ খারাপ। মোট ছাত্রীদের মাত্র ১৬ শতাংশই প্রকল্পটি থেকে সুবিধা পায়। এমনকি কেবলমাত্র তফসিলী জাতি ও জনজাতির শিক্ষার্থীদের কথা ধরলেও সুবিধাপ্রাপ্ত মেয়েদের সংখ্যাটি বেশ কম। তফসিলী জাতি ও জনজাতির সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত নীতির সঙ্গে প্রকল্পটির রূপায়ণে একটি বড় গরমিল দেখা গেছে। আবার বহু মাতা-পিতার মতোই প্রকল্পটি স্কুলের সমস্ত ছাত্রীদের জন্যই

চালু করা উচিত যাতে সুবিধা পায় না এমন ছাত্রীদের মনে বঞ্চনার বোধ জাগতে না পারে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির শিশুদের প্রায় সমস্ত মা-বাবাই মনে করেন যে, প্রকল্পটির সুবিধা তাঁদের শিশুদের জন্য অবিলম্বে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। যেহেতু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা প্রধানত সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলি থেকেই আসে, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এই শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে।

৬। পরিচালনা :

পরিদর্শন

বর্তমান সমীক্ষায় পরিচালনা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যগুলি আমাদের আগেকার করা সমীক্ষার সঙ্গে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ। আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাটি প্রায় ভেঙে পড়েছে। অনেকগুলি কারণ থেকেই বর্তমান অবস্থাটির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যে পড়ে, বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সংখ্যার স্বল্পতা, পরিদর্শন বহির্ভূত অন্যান্য নানা কাজে তাঁদের নিযুক্তি, শিক্ষক ও তাঁদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পরিদর্শকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। আমাদের সমীক্ষাকৃত ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দশটিতেই প্রধান শিক্ষকরা বলেছেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে সমীক্ষার আগের বছর কোনো পরিদর্শনই হয়নি। এছাড়া, বহু শিক্ষকের মতে পরিদর্শন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দেখে যা মনে হয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরিদর্শন ব্যবস্থাটি তুলনামূলকভাবে ভালো কাজ করে, যদিও এখানেও অনেক উন্নতি করার দরকার আছে। ২০টির মধ্যে ৮টি (৪০ শতাংশ) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই সমীক্ষার আগের বছর চার বারেরও বেশি পরিদর্শন হয়েছে। মাত্র তিনটি (১৫ শতাংশ) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এই সময়ের মধ্যে কোনো পরিদর্শন হয়নি। কিছু কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যেখানে বলা হয়েছে যে পরিদর্শকরা কেবল প্রতীকী পরিদর্শন করে গেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে তাঁরা রীতিমতো খাতাপত্র পরীক্ষা করে সই করে গেছেন। কিন্তু কেবল কয়েকটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই বলা হয়েছে যে পরিদর্শকরা শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন দেখেছেন ও সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

বিদ্যালয় পরিচালনায় মাতা-পিতাদের অংশগ্রহণ

যদিও সমীক্ষাকৃত প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেছেন যে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনো কমিটি আছে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি, ভর্তির জন্য কমিটি, উপস্থিতির জন্য কমিটি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এস.এস.কে. কমিটি), মা-বাবাদের প্রতিনিধিত্বও এই কমিটিগুলির পরিচালনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১০ জন প্রধান শিক্ষক (৫০ শতাংশ)ই বলেছেন যে তাঁদের বিদ্যালয়ে কখনো সখনো সভা ডাকা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা (২৫ শতাংশ) জানালেন যে সেগুলিতে প্রতি মাসে সভা করা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এটাও জানালেন যে "যেহেতু মা-বাবারা আগ্রহ দেখান না",

সে কারণে সভাগুলিতে উপস্থিতি খুবই খারাপ থাকে।

অনেক ক'টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেও সভা ডাকার ব্যাপারটি সরকারি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে করা হয় না। যদিও নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রেই মাসিক সভা করার কথা, কেবল ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের বলা হয়েছে যে সেই নিয়মটি পালিত হয়। কিছু কিছু সহায়িকা মা-বাবাদের আগ্রহের অভাবের কথা বললেন।

অন্যদিকে দেখা গেছে, বিদ্যালয় সংস্থার উন্নয়নের জন্য বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য শিক্ষকদের আবেদনে মাতা-পিতারা কিন্তু আদৌ ঔদাসীন্য দেখাননি। ২০টির মধ্যে ১৪টি (শতকরা ৭০ ভাগ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে তাঁরা এই ধরনের সাহায্য চেয়েছেন। এগুলির মধ্যে ১১টি (শতকরা ৭৯ ভাগ)টিতেই অভিভাবকরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে ১১টিতে সহায়িকারা জানিয়েছেন যে তাঁরা মা-বাবাদের কাছে বিভিন্ন সাহায্য ও কেন্দ্র পরিচালনার আবেদন জানিয়ে ভালো সাড়া পেয়েছেন।

মা-বাবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে, বিদ্যালয়ের সভাগুলি সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষকদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে গুরুতর অমিল আছে। যেখানে কেবল ৩০ শতাংশ মা-বাবাই জানালেন যে শিক্ষকরা অভিভাবকদের সভা করেন, সেখানে শতকরা ৪২ জনই বিপরীত কথা বলেন এবং শতকরা ২১ ভাগই জানান যে তাঁরা এ সম্পর্কে আদৌ কিছু জানেননা। কেবলমাত্র প্রাইভেট স্কুলগুলির ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের একটি বড় অংশই (৫৭ শতাংশ) সভা হয় বলে জানিয়েছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে ৮ নং সারণী থেকে।

সারণী - ৮ : অভিভাবক-শিক্ষক সভা সম্পর্কে মা-বাবাদের প্রতিক্রিয়া

	সভা হয়	সভা হয়না	জানিনা	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৪ (৩৭)	৮৮ (৪৪)	৩৮ (১৯)	২০০
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৪১ (৩৪)	৫৩ (৪৩)	২৮ (২৩)	১২২
প্রাইভেট স্কুল	১৬ (৫৭)	৪ (১৪)	৮ (২৯)	২৮
মোট	১৩১ (৩৭)	১৪৫ (৪২)	৭৪ (২১)	৩৫০

* বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় মাতা-পিতাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ

বহুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের মধ্যে মৌলিক শক্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবহেলায় সেই শক্তির চাপা পড়ে যাওয়ার দিকটিও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে যায়নি।[২২]

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মা-বাবারা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করতে শুধু যে প্রস্তুত তা-ই নয়, বহু জায়গাতেই তাঁরা এ ব্যাপারে প্রচন্ড আগ্রহী। যেমনটা দেখা গেছে, আসল সমস্যাটি হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থার ধরন, যাতে মাতা-পিতাদের ভূমিকাকে অনেক দূর পর্য্যন্তই অবহেলিত রেখে দেওয়া হয়।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিচালনার কাজে অবদান রাখতে পারেন কি না, তখন শতকরা ৬৮ ভাগ মাতা-পিতাই অত্যন্ত ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মা-বাবাদের মধ্যে এই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে অনেক বেশি — শতকরা ৭৩ ভাগ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে এটি ছিল ৬৬ শতাংশ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত শিশুদের মা-বাবাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে তাঁদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিকা অর্জনের কাজে লেগে থাকতে হয়, ফলে আর্থিকভাবে বা সময় দিয়ে সাহায্য করাটা তাঁদের পক্ষে বেশ মুস্কিল। কিন্তু এরকম মন্তব্য করা সত্ত্বেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বহু অভিভাবককেই বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। সভায় উপস্থিত থাকা, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে সক্রিয় অংশ নেওয়া, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজেই তাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা বিভিন্ন গ্রামে এমন মানুষও দেখেছি যাঁরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য জমি দান করেছেন। এমন কি যেখানে জমি হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ[২৩] সেই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এরকম অনেক উদাহরণ আছে। মা-বাবারা বারংবার প্রয়োজনে আরো বড় অবদান রাখবার কথাও বলেছেন।

সারণী - ৯ ঃ অভিভাবকরা কি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন?

	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫ (৭৩)	২০ (১০)	৩৫ (১৭)	২০০
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৮১ (৬৬)	১৮ (১৫)	২৩ (১৯)	১২২
প্রাইভেট স্কুল	১১ (৩৯)	৮ (২৯)	৯ (৩২)	২৮
মোট	২৩৭ (৬৮)	৪৬ (১৩)	৬৭ (১৯)	৩৫০

* বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

অভিভাবকদের হাতে ক্ষমতা

আমাদের প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদনে নীতি সংক্রান্ত পরামর্শগুলির মধ্যে একটি ছিল, প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন করা, ও সেই কমিটিগুলির হাতে বিদ্যালয়ের অর্থমঞ্জুরীর অনুমোদন সংক্রান্ত আইনী ক্ষমতা দেওয়া। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হলে, প্রাথমিক স্কুল, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও প্রাইভেট স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে যথাক্রমে ৮১ শতাংশ, ৮০ শতাংশ ও ৭৯ শতাংশই পরামর্শটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। তথ্যটি আমাদের প্রথম সমীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। কমিটিগুলির সদস্য কারা হবেন এ প্রশ্নের উত্তরে ৩১৭ জন মা-বাবার মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ লোকই বলেন যে এগুলিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ ও ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও প্রাইভেট স্কুলের অভিভাবকদের যথাক্রমে ৯৭ শতাংশ, ৯৬ শতাংশ ও ৯২ শতাংশ এই মত ব্যক্ত করেন।

অবশ্য শিক্ষকদের মনোভাব এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহগ্রস্ত ও নঞর্থক বলে মনে হল। কেবল চারজন প্রধান শিক্ষক (২০ শতাংশ) ও ৮ জন প্রধান সহায়িকা (৪০ শতাংশ) পরামর্শটির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। ১২ জন (৬০ শতাংশ) প্রধান শিক্ষক বিরোধিতা করেন। ৪ জন প্রধান শিক্ষক (২০ শতাংশ) ও ৫ জন সহায়িকা (২৫ শতাংশ) মনে করেন যে প্রস্তাবটি কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরিবর্তনগুলি বলতে তাঁরা শিক্ষকদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া ও অভিভাবকদের হাতে অর্থমঞ্জুরী সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা না দেওয়া ইত্যাদি বোঝান। পুরুষ সহায়কদের দ্বারা পরিচালিত দুটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

যাঁরা বিশেষত প্রধান শিক্ষকদের একাংশ, উপরোক্ত প্রস্তাবের খোলাখুলি বা প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা করেছেন তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মন্তব্য করেছেন যে এরকম কমিটি গঠনের "ফল খুবই বিপজ্জনক" হবে। শিক্ষা সম্পর্কে যাঁদের কোনো ধারণাই নেই, সেই নিরক্ষর অভিভাবকদের হাতে আইনী ক্ষমতা দেওয়া হলে তাঁরা তার অপপ্রয়োগ করতে পারেন ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক আচরণ করতে পারেন। সহায়িকাদের মধ্যে অবশ্য এই ধরনের কমিটি গঠন করার ব্যাপারে খুব বেশি বিরোধিতা দেখা যায়নি।

প্রতিক্রিয়াগুলির বিভিন্নতা ও বিপরীতধর্মীতা শিক্ষক ও মাতা-পিতাদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক দূরত্বকেই প্রমাণিত করে। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে অভিভাবকদের আগ্রহটিকে এই দূরত্ব কমানোর কাজে লাগানোর দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দান করা দরকার। এই আগ্রহের সঠিক ব্যবহার স্কুল পরিচালনায় একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাম শিক্ষা কমিটি

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় গণ-অংশগ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং এই গণ-অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। গ্রাম শিক্ষা কমিটির ধারণাটি এই প্রয়োজন বোধ থেকে উদ্ভূত এবং অন্যান্য অনেক রাজ্য সরকারের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এর রূপায়ণ করার কাজটি শুরু

করে। কিন্তু যে কয়েকটি গ্রাম শিক্ষা কমিটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে সেগুলি অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় গণ-অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করতে পারেনি।

আমাদের আগের সমীক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবেই দেখা গেছে যে গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলির সঞ্চালনই যে শুধু খারাপ তা-ই নয়, এদের মধ্যে অনেকগুলিরই জনজীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের সঙ্গে কথা বলা অধিকাংশ মাতা-পিতার গ্রাম শিক্ষা কমিটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও একজন গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য জানতেন না যে তাঁর নাম ঐ কমিটিতে আছে। সাক্ষাৎকার নেবার জন্য বিশেষ করে অনেকেই যখন তাঁদের সেই কমিটিগুলিতে মনোনীত হবার কথা নিজেরাই জানতেন না, সেখানে গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলির সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাঁদের খুঁজে পেতেও আমাদের বেশ অসুবিধা হয়েছে।

বহু ক্ষেত্রেই গ্রাম শিক্ষা কমিটির গঠনটিই করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে। বিভিন্ন এলাকায় শক্তিশালী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দেখা গেছে গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলিকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে। যা লক্ষ্য করা গেছে তা হল জনসাধারণের সঙ্গে গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলির সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

সমীক্ষাকৃত ২০টি গ্রামের মধ্যে ১০টিতে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়, কিন্তু আমরা কেবল ৮টি কমিটির সদস্যদের সঙ্গেই কথা বলতে পেরেছি। এদের মধ্যে ৫টির সদস্যদের অভিজ্ঞতা যারপরনাই হতাশা-ব্যঞ্জক। কেবল ৩টির সদস্যরা জানান যে সেই গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি তাদের গঠন হওয়ার গোড়ার দিকে শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে কিছু ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সঙ্গে অবশ্য তাঁরা এটাও যোগ করেন যে পরবর্তিকালে সেই কমিটিগুলি কার্যত অচল হয়ে গেছে।

আমাদের আগেকার সমীক্ষাতে যেমনটা পাওয়া গেছে, সমস্যাটি বোধ হয় গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলির গঠন পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত — এই কমিটিগুলি স্কুল-নির্দিষ্ট সংস্থা নয় এবং এগুলিতে মাতা-পিতাদের প্রতিনিধিত্বের জায়গা খুবই কম। এর ফল হিসাবে, কমিটিগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মাতা-পিতাদের প্রতিনিধিত্বের অভাবের ফলে, এগুলি বিকলাঙ্গ হয়েই জন্ম নেয়।

জনসাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিচালনায় আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে এই আগ্রহের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। এমন অবস্থায় এটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়, যখন এই প্রয়োজনকে সমাজে স্বতঃ বিদ্যমান সাধনের দ্বারা মিটিয়ে তুলে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমুন্নত করে তোলা দরকার। প্রতিটি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে এই কাজটি করে ওঠা যায়।

৭। শিশু শিক্ষা কর্মসূচি — একটি অবলোকন

শিশু শিক্ষা কর্মসূচি তার চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করেছে (২০০২ সালে) এবং রাজ্যে ১১,০০০ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীর ৮ শতাংশ শিশু ভর্তি আছেন

(২০০২ সালে)। ২৬ আমাদের আগেকার সমীক্ষাতে আমরা দেখেছি যে অত্যন্ত দুর্বল পরিকাঠামো ও সহায়িকাদের অত্যন্ত কম বেতন (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায়) সত্ত্বেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি তুলনামূলকভাবে বেশ ভাল কাজ করছে।

উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা

আমরা দেখেছি যে সহায়িকাদের কার্য নিষ্পাদন সম্পর্কে সাধারণত মা-বাবাদের সন্তুষ্টির মাত্রা বেশ ভালো। অবশ্য এই সন্তুষ্টি সর্বদাই কেন্দ্রগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার উঁচু মানের কারণে হয়ে থাকে তা নয় -- শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত বহু শিশুর মাতা-পিতাদেরই তাঁদের সন্তানদের শিক্ষালাভের মান বা মাত্রা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই (এই কেন্দ্রগুলি মূলত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরই শিক্ষা দান করে থাকে)। প্রধানত সহায়িকাদের আচরণের কারণেই বাবা-মায়েরা তাঁদের সম্পর্কে সন্তোষজনক ধারণা গড়ে তোলেন।

* যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিশুদের অনুপস্থিতির কারণ জানবার জন্য শিক্ষকরা শতকরা ৫৫ ভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা যায়, সেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে এই রকম সম্পর্ক স্থাপনের মাত্রা শতকরা ৯৫ ভাগ।
* বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগ গ্রহণের হার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে শতকরা ৫৫ ভাগ ক্ষেত্রে, সেখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে এটির মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ।

সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য থেকে এরকমটা মনে হচ্ছে যে, সাধারণতঃ সহায়িকারা শিশুদের ও বিদ্যালয়ের উন্নতির বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক। অথচ, শতকরা ৭০ শতাংশ সহায়িকা তাঁদেরকে দেয় বেতনের স্বল্পতা ও তার অনিয়মিত প্রদানের ব্যাপারে অভিযোগ জানালেন। শতকরা ৮৫ ভাগই অভিযোগ জানালেন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অত্যন্ত খারাপ পরিকাঠামোর ব্যাপারে।

উদ্বেগের কারণ

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অভিজ্ঞতা সাধারণত বেশ ইতিবাচক হলেও কিছু কিছু উদ্বেগের কারণও আছে, যেগুলি সরাসরি ভাবে এদের পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তুলনামূলক বঞ্চনা

পরিকাঠামোগত সমস্যাটি কতখানি গুরুতর সেটি বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে ২০টির মধ্যে ১৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই (৭৫ শতাংশ) কোনো নিজস্ব ঘর নেই। ৬টি কেন্দ্র (৩০ শতাংশ) চলে খোলা আকাশের নীচে, এবং বাকিগুলি বসে কারো বারান্দায় বা গোয়ালঘরে। বহু ক্ষেত্রেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের তীব্র দাবদাহের মধ্যে আমরা শিশুদের খোলা আকাশের নীচে বসে পাঠগ্রহণ করতে দেখেছি।

প্রাথমিক স্কুল ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে লভ্য সুযোগ সুবিধাগুলির মধ্যে বাস্তবত কোনো তুলনা করাই চলে না। শুধু একটি কথা যোগ করাটাই বোধ হয় যথেষ্ট যে,

সমীক্ষাকৃত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৭টিতে (৩৫ শতাংশ) কোনোরকম কোনো সুযোগ সুবিধাই নেই -- তা সে, মানচিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, খেলার মাঠ, পানীয় জল, শৌচাগার, ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহায়িকারা সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ দু'দিক থেকেই ভয়ানক ভাবে সহায়হীন। অধিকন্তু, প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত শিশুদের দ্বারা প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকে যায়। তারা কেবল বিনামূল্যে পাঠ্য বই পেয়ে থাকে।[২৭]

রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক বাধা

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ যেটিকে আমরা দেখেছি সেটি একজন পুরুষ সহায়ক দ্বারা পরিচালিত। ভদ্রলোকের শিক্ষাগত অযোগ্যতা কল্পনারও বাইরে। পাঁচ বা ছয় এর নামতাও তিনি বলতে পারেন না। আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর এক ও অদ্বিতীয় উত্তর ছিল, "আপনারাই বলুন"। সপ্তম শ্রেণি পাস ও একটি দৈহিক প্রতিবন্ধী সংশাপত্র নিয়ে তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক যোগাযোগের সুবাদে "চাকরিটি পেয়েছেন"। আমরা তাঁর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধী হওয়ার মত কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনি, যদিও গ্রামের অনেকেই তাঁর মধ্যে বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতার অনেক গুণ দেখতে পেয়েছেন!

"মায়েরা সহায়িকার সঙ্গে অবাধে দেখা করতে পারেন" বলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বহু অভিভাবক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু পুরুষ সহায়ক নিযুক্ত হলে বিষয়টি আর এরকম থাকেনা, এবং যা হওয়ার তা-ই হয় -- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়েরা কেন্দ্রে গিয়ে শিশুদের পঠন পাঠন সংক্রান্ত খোঁজখবর করা বা তাদের সম্পর্কে কিছু জানানো থেকে বিরত থাকেন।

মজার কথা যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটির কথা একটু আগেই বলা হয়েছে, সেটিতে একজন সহায়িকার পদ বহুদিন আগেই মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগটি তখনো পর্য্যন্ত করা হয়নি শুধুমাত্র এই কারণে যে পদটির জন্য একটি রাজনৈতিক দল থেকে বিশেষ একজন প্রার্থীকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত পদটির জন্য প্রয়োজনীয় বয়স সেই প্রার্থীর হয়নি!

বলা বাহুল্য, উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য যে এস.এস.কে. কমিটিটি তৈরি হয়েছিল (যেটি জনসাধারণের একটি সংস্থা হওয়ার কথা) সেটি কার্যত একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থকদের দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। যথারীতি, মা-বাবাদের সুপরিকল্পিতভাবে কমিটির বাইরে রেখে দেওয়া হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির খারাপ কার্য-নিষ্পাদনের প্রধান কারণ হিসাবে দেখা যায় যে সেই জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবেই একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খুলে দেওয়া। এরকম ক্ষেত্রেও গ্রামের মানুষের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র স্বার্থে এরকম কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়ে থাকে। স্থানীয় চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে উপর থেকে

চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের একটি নমুনা হল হঠাৎ করে একটি এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সময়সূচি বদলে দেওয়া। স্থানীয় মানুষ নিজেদের সুবিধামতো যে সময়সূচী নির্ধারণ করেছিলেন, শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচির সঙ্গে সমতা বিধান করার নাম করে তাকে বদলে দেওয়ার হুকুম জারি করা হল। এটি যে শুধুমাত্র সেই কেন্দ্রের শিশুদের স্বার্থের পরিপন্থী (যেহেতু খেটে খাওয়া বাড়ির এই শিশুদের পড়াশুনোর বাইরেও অন্য অনেক কাজ করতে হয়, এবং সেই হিসেবেই সময়সূচি ঠিক করা হয়) তা-ই নয়, এটি শিশু শিক্ষা কর্মসূচির মৌলিক ধারণাটিরও বিরুদ্ধে যায়। কেবলমাত্র গণ-অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা একটি পরিবেশই পারে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সবচেয়ে বেশি ফলবতী করে তুলতে।

৮। প্রাইভেট স্কুল :

আমাদের মোট ৩৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ২৮ জনই ছিলেন প্রাইভেট স্কুলে পাঠরত শিশুদের মাতা-পিতা -- সকলেই দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ (DGHC) এলাকার মধ্যে। এখানকার (DGHC)র শিক্ষা দপ্তরের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের কথায়, "প্রাইভেট স্কুলগুলি খুব দ্রুত সরকারি স্কুলগুলিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শ্রেণির অভিভাবকরাই তাঁদের সন্তানদের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করার দিকে অনেক বেশি করে ঝুঁকছেন।

অবশ্য আমাদের সমীক্ষাকৃত অন্যান্য এলাকাগুলিতে (দাজিলিং জেলারই শিলিগুড়ি মহকুমা সহ) কিন্তু চিত্রটি অন্যরকম। কয়েকটি প্রাইভেট স্কুলের অস্তিত্বের কথা আমরা শুনেছি ঠিকই, আমাদের সমীক্ষাতে সেগুলি তেমনভাবে আসেনি। সচ্ছল পরিবারের কয়েকটি মাত্র শিশুর এরকম স্কুলে ভর্তির কথা জানা যায়। শিলিগুড়ি মহকুমাতে আমরা এমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখেছি যেখানে মাত্র একজন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও (ছাত্র-ছাত্রী - ১৩৫ জন) শিক্ষার গুণগত মানকে এমন ভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে, বেশ কিছু মা-বাবা পাশের একটি প্রাইভেট স্কুল থেকে তাঁদের শিশুদের ছাড়িয়ে এনে উক্ত সরকারি বিদ্যালয়টিতে ভর্তি করেন।

এর তীব্র বৈপরীত্যে DGHC এলাকাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও বিদ্যার্থী-শিক্ষক অনুপাত অনেক ভালো হওয়া সত্ত্বেও প্রাইভেট স্কুলের প্রতি মাতা-পিতাদের আকর্ষণ এতই তীব্র যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাড়ানোর জন্য নানান নতুন নতুন পদ্ধতি নিতে হচ্ছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা জানালেন যে তাঁরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে শিশুদের গলায় বাঁধার 'টাই' কিনে দিয়েছেন। একজন শিক্ষক বললেন, "গলার টাই নার্সারি (প্রাইভেট) স্কুলের প্রতীক, এবং এটি বাচ্চার ও তাদের বাবা-মায়েদের খুবই পছন্দের জিনিস।"

তবে শুধু 'গলার টাই' আসল কথা নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ইংরেজি শেখার 'প্রয়োজনীয়তা'। DGHC-র বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কথায়, "উচ্চশিক্ষার জন্য নেপালি ভাষায় বইপত্র পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ

করার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি ভাষাতেই পড়তে বাধ্য হয়। বিশেষ করে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে, যেখানে শিক্ষার মাধ্যম নেপালি, পড়াশুনো করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই যাতে ইংরেজি ভাষা শিখে উঠতে পারে না, সেই উদ্দেশ্যে তাদের মা-বাবারা তাদের প্রাথমিক স্তর থেকেই প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে চান।" আরো অনেক শিক্ষক ও অভিভাবক এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এর মত শহর ছাড়াও অন্যান্য অনেক ছোট ছোট জায়গায় বহু সংখ্যক প্রাইভেট স্কুল গজিয়ে ওঠাটাও বোধহয় অভিভাবকদের তাঁদের শিশুদের এই সব স্কুলে ভর্তি করার ঝোঁককে বাড়িয়ে তুলে থাকতে পারে।

অবশ্য, ব্যাং-এর ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এই সব প্রাইভেট স্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই শিক্ষাদানের মান যথেষ্ট খারাপ। প্রাইভেট স্কুলে পাঠরত ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থীকেই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে দেখা গেছে। কৌতূহলের বিষয় হল, মজুরি-নির্ভর পরিবার থেকে প্রাইভেট স্কুলে পড়তে যাওয়া শিশুদের ১০০ শতাংশই যখন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে, সেখানে কিন্তু অন্য পরিবারগুলি (ব্যবসাজীবী, চাকরিজীবী, ইত্যাদি) থেকে প্রাইভেট স্কুলে পড়তে যাওয়া শিশুদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। নিজের ছেলেকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠান এমন একজন মজুর আমাদের বললেন যে, সেই স্কুলের শিক্ষকই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন ছেলের জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে। সেটা করতে না পারলে তাঁর ছেলে, "স্কুলের পড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।"

নিশ্চিতভাবেই এটি বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলির উপর, অর্থনৈতিক বোঝা বাড়িয়ে তোলে। কারণ, এই স্কুলগুলিতে পড়ার খরচ সরকারি স্কুলে পড়ার খরচের তুলনায় অনেক বেশি। প্রাইভেট স্কুলের শিশুদের অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগই জানালেন যে প্রতি শিশুর জন্য তাঁদের বছরে ১৮০০ টাকারও বেশি খরচ করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এই রকম বেশি খরচ (বার্ষিক ১৮০০ টাকা বা তার বেশি) যথাক্রমে ৬ ও ১ শতাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মা-বাবাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাঁদের শিশুদের পড়ার খরচ মাথা পিছু বার্ষিক ১০০০ টাকা বা তার কম। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বেশির ভাগই জানিয়েছেন যে এই অংকটি বার্ষিক ৬০০ টাকা বা তার কম। শিশুদের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করার নেশায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন গরিব লোকেরা। ডি.জি.এইচ.সি. এলাকার একটি গ্রামের একজন অভিভাবকের কথায় প্রায়শই তাঁদেরকে এই খরচ মেটানোর জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে হয়। অথচ, যে টাকা তাঁরা খরচ করেন, সেই তুলনায় কিন্তু শিক্ষার মানও আদৌ নিশ্চিত হয় না।

৯। উপসংহার :

বর্তমান সমীক্ষাটি থেকে প্রাপ্ত সারাংশগুলি প্রতীচীর প্রথম প্রতিবেদনে পাওয়া তথ্যগুলির সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য তারতম্য পাওয়া গেছে

(যথা, ডি.জি.এইচ.সি. এলাকাতে প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যার বিপুলতা)। নতুন পাওয়া তথ্য হিসাবে, প্রধানত বলা যেতে পারে, মুসলিমদের মধ্যে শিশুদের পড়াবার ও তাদের স্কুলে ভর্তি করার বিপুল আকাঙ্ক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমাদের প্রথম সমীক্ষাটিতে মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। এটা বোধহয় পুনরুল্লেখের দাবি রাখে যে আমাদের পাওয়া তথ্যগুলি কিন্তু সাধারণ, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত বিশ্বাসটির (মুসলমানরা লেখাপড়ায় আগ্রহী নন) সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে।

আমরা বর্তমান প্রতিবেদনটি শেষ করব, আমাদের দু'টি সমীক্ষাতেই পাওয়া কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে -- যে, বিষয়গুলির উপর অবিলম্বে একটি গণ-আলোচনা ও বিতর্ক শুরু করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য, শিক্ষার পরিচালনা ও তদারকির কাজে মাতা-পিতাদের অংশগ্রহণ একটি মূল বিষয়। প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সমাজের বিভিন্ন অংশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব-সহ একটি করে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন করা এবং এর হাতে স্কুলের অর্থমঞ্জুরীর বিষয়টিকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য আইনি ক্ষমতা প্রদান করা। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার যথাসম্ভব স্থানীয় জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া ও সেগুলিকে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা।

আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু শিক্ষা কর্মসূচি সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি বিশেষত সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা বিস্তারের কাজে অনেকখানি সফল হয়েছে। অবশ্য, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির স্থাপনা ও পরিচালনা এবং এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনো অনেক উন্নতি ঘটাতে হবে। শুরুতেই, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের 'সহায়িকা'রা নিজস্ব অধিকারেই অন্যান্য শিক্ষাদানকারীদের মতোই স্বীকৃতির দাবি রাখেন। 'সহায়িকা' কথাটি 'শিক্ষক'-এর সঙ্গে তুলনামূলক মর্যাদায় যথেষ্ট নীচু, অথচ 'সহায়িকা'রা বেতন কম পেলেও কাজের দিক দিয়ে শিক্ষকদের চেয়ে বেশি না হলেও কম কাজ করেন না। আবার তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম মানও শিক্ষকদের সমান। সুতরাং তাঁদেরকে আধা-শিক্ষকের মতো শোনায় এমন একটি পদবি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিরাট অনিয়ম আছে তাকে অবিলম্বে দূর করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা তথা সমাজের জন্য তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, সে কথা মনে রেখে তাঁদের সামান্য বেতনটুকু যাতে তাঁরা ঠিক সময়ে পান সে ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালু থাকা বিভিন্ন উৎসাহ-বর্ধক প্রকল্প শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও চালু করা দরকার। এই সব প্রকল্পর সঠিক রূপায়ণের দিকটিকেও অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

পরিকাঠামোগত সমস্যাটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রবল, এবং এগুলিকে যাতে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান জায়গায় নিয়ে আসা যায়, সে চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে গণ-অংশগ্রহণের

মাত্রা অনেক বেশি, সুতরাং এ কাজটি করতে প্রচুর আর্থিক খরচের ভার বহন করতে হবেনা।

সুপ্রিম কোর্ট-সহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেভাবে বলেছেন, এবং আমাদের সমীক্ষাগুলিতেও যেভাবে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, তাতে, নিশ্চিতভাবেই প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষাগত মান দুটিকেই বাড়াবার জন্য রান্না করা খাবার পরিবেশন করা দরকার। যেহেতু পুষ্টি ও শিক্ষাগত মানের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে, সে কারণে আরো বেশি করেই এই প্রকল্পটির সঠিক রূপায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

শেষত, শ্রেণি বিভাজন বাড়িয়ে তোলার উপাদান গৃহশিক্ষকতার দুষ্ট ব্যাধিকে প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি থেকে অবলুপ্ত করা দরকার। কেবল আইন করে এটা সম্ভব নয়। ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মানকে বাড়িয়ে তুলতেই হবে। শিক্ষকদের আত্মনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ও একটি সঠিক নিরীক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এটি অর্জন করা যেতে পারে।

টীকা

১। দ্রষ্টব্য, প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন-১।

২। রাজ্যস্তরে এই সংখ্যাগুলি প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়-পিছু ১৬২ জন ও প্রতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-পিছু ৬৮ জন শিশু।

৩। পরিকাঠামোগত ও শিক্ষকের অভাব সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বহুদিন আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, Report of the Education Commission (1992); Chattopadhyay et al, (1998); Annual Report of the Department of School Education, W.B. (2001)। প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদন-১ এ আমরা বিষয়গুলি আলোচনা করেছি।

৪। তথ্যসূত্র : Office of the District Inspector of School, Bardhaman; Office of the Chairperson, District Primary Education Council, Murshidabad; Office of the Chairman, Primary Education Council, Siliguri Sub-Division। ডি.জি.এইচ.সি.-র ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা পাওয়া যায়নি।

৫। আরো দ্রষ্টব্য, Report of the Education Commission (1992), পৃ. ১১।

৬। A Study on Utilization of Yearly Grant for 1) Development of each school as well as 2) Preparation and uses of TLM by teachers; West Bengal DPEP (2001).

৭। দ্রষ্টব্য Yadav, M.S. and Meenakshi Bharadwaj with Mona Sedwal and Neeti Gour (2002) : "Learning Conditio and Learner Achievement in Primary Schools : A Review" in R. Govind (ed), India Education Report 2002, OUP, New Delhi.

৮। দ্রষ্টব্য Sitaramalu, A.S. (2002) : "Status of Elementary Teachers in India" in R. Govind (op cit.).

৯। উদাহরণ হিসাবে, কেরলা ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ একইরকম হলেও

(যথাক্রমে ২৫ ও ২৬ শতাংশ) প্রকৃত শিক্ষা পরিবেশনের চিত্রটি কিন্তু দুটো রাজ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্রষ্টব্য Shah, Partha J, "On the Role of Government and Civil Society in Educatio : Liberalisation, Accountability and Empowerment" in Bhalla, Surjit (ed) New Economic Policies for a New India (ICSSR), cited by Parikh, K.S., "Social Infrastructure : As Important as Physical Infrastructure" in Parikh, K.S. and R. Radhakrishnan (eds), India Education Report (New Delhi : OUP, 2002).

১০। Education Committee (1992)-এর পর্যবেক্ষণগুলি ছিল একই রকম।

১১। সরকারি প্রতিবেদন-এ খুব ভালো কোনো চিত্র দেয় না, উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য The external evaluation report of Class 2 children of Birbhum done in 2001, Birbhum District Primary education Council।

১২। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক স্তরে কোনো শিশুকে অনুত্তীর্ণ রাখা যায় না। এই ফেল না করানোর নীতিটি, বহু শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে, একটি বিপরীতধর্মী ফল দিচ্ছে এবং এর ফলে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে এই স্তরেই স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে।

১৩। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই নন, কিছু নীতি রূপায়ক সংস্থাও (যথা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ) মনে করছেন যে "শিক্ষা পরিবেশনের ব্যবস্থাটিতে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আশু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।" দ্রষ্টব্য "Study on School Efficiency : Studied through number of pupil years taken to complete primary education"; West Bengal DPEP (2000)।

১৪। মূল্যায়নটি তিনটি শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নের ভিত্তিতে করা হয়।

১৫। আমাদের সঙ্গে কথা বলা, বহু বর্ণহিন্দু শিক্ষক, সরকারি আধিকারিক ও রাজনীতিবিদও পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে মুসলমানরা তাঁদের শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাঁদের স্কুলে পাঠাতে চান না, কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত উপাত্ত সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে।

১৬। The Islamic Voice (May, 2001), Web Edition জানাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন।

১৭। একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করেছেন Chattopadhyay et al (1998)। এমনকি শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা একটি রাজ্য কেরালাতেও "পরম্পরাগত অসাম্যগুলিকে দূর করবার জন্য" বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে (দ্রষ্টব্য Chandrasekhar et al, ২০০১)।

১৮। বর্তমান অনুবাদটি করার সময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকেও মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প-র আওতায় আনা হয়েছে তথা, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ২০০৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার জন্য সরকারি নির্দেশ জারি হয়েছে।

১৯। দ্রষ্টব্য Sen, Amartya (2002) : Introduction to the Pratichi Education Report, footnote 9. The issue has also been discussed at length in Dreze, Jean and Amartya Sen (2002) : India : Development and Participation, OUP, New Delhi।

২০। কর্নাটকের সাতটি পশ্চাৎপদ জেলার সমস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রান্না করা মধ্যাহ্ন আহার দেবার জন্য কর্নাটক সরকারের Order No. ED 20 MMS 2002(B), dated 1.10.2001 অনুসারে, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ প্রকল্পটি রূপায়িত করার জন্য একটি

নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

২১। The West Bengal DPEP Study on School Efficiency : Studied through number of pupil years taken to complete primary education; West Bengal DPEP (2000)-ও লক্ষ্য করেছে যে স্কুলে পড়ার জন্য আর্থিক খরচের দিকটি বেশ বেশি।

২২। দ্রষ্টব্য Tagore, Rabindranath (1919, reprint 2001) : The Centre of Indian Culture, Visva-Bharati, Calcutta।

২৩। মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা ঘনত্ব (১১০১ প্রতি বর্গ কি.মি.) পশ্চিমবঙ্গের গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব (৯০৪) অপেক্ষা অনেক বেশি (Census, ২০০১)। জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি একটি সাক্ষাৎকারে মাথাপিছু জমি মালিকানার স্বল্পতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

২৪। বিশেষ দ্রষ্টব্য the Introduction to Pratichi Education Report (2002) by Amartya Sen।

২৫। কেবল পশ্চিমবাংলাতেই নয়, গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলির (VEC) কার্য পদ্ধতি অন্যান্য অনেক জায়গাতেই বেশ খারাপ। দ্রষ্টব্য Ramchandran V. and A. Saihjee (2002), Economic and Political Weekly, April 27, 2003।

২৬। দ্রষ্টব্য Annual Report 2001, Department of School Education and Economic Review 2001-2, Government of West Bengal।

২৭। অবশ্য আগে যেমন বলা হয়েছে বর্তমান প্রতিবেদনটি অনুবাদের সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে নীতি সংক্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। ১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

গ্রাম পরিচিতি

বর্ধমান জেলা

<u>গ্রাম - মোহনপুর,</u> <u>ব্লক - ভাতার</u>

ভাতার ব্লকের একেবারে পশ্চিমে মোহনপুর গ্রাম। বর্ধমান ও গুসকরা শহর সংযোগকারী সড়কের কাছে মোহনপুর। লোক সংখ্যা প্রায় ২৬০০। গ্রামের জনগোষ্ঠী তফসিলী সম্প্রদায়, জনজাতি, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। পানীয় জলের জন্য আছে নলকূপ এবং কলের জল সরবরাহ ব্যবস্থা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা খেতমজুরি। দেড়শোর মতো পরিবারের কৃষি জমি আছে, এঁদের অধিকাংশ বর্ণহিন্দু জাতিভুক্ত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী। এঁরা অধিকাংশই কুলিমজুরের কাজ করেন। কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫০ টাকার মতো।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, দুটো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং একটি ডাকঘর আছে। উচ্চবর্ণের পাড়ার কাছে গ্রামের এক কোণে প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি মাটির বাড়ি আর একটি সদ্যনির্মিত পাকা বাড়িতে চারটি শ্রেণীর পড়াশুনো হয়। বিদ্যালয়ের অনুমোদন আছে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু যেহেতু খুব কাছে উচ্চ বিদ্যালয়, তাই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। ৪টি শ্রেণির জন্য শিক্ষক আছেন ৩ জন। তফসিলী সম্প্রদায়ের পাড়ার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি অবস্থিত। কেন্দ্র চলে স্থানীয় একটি ক্লাবের মাটির ঘরের বারান্দায়। পাড়ার মানুষজন এই কেন্দ্রকে তাঁদের নিজেদের স্কুল বলে মনে করেন। পাড়ারই একজন মানুষ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটির জন্য জমি দান করতে চেয়েছেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ২ জন সহায়িকা। এঁরা উচ্চবর্ণের মহিলা। মনে হয়, এরা সম্পূর্ণরূপে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান সম্পর্কে গ্রামের মানুষজন আদৌ সন্তুষ্ট নন। তাঁরাই বললেন, এই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া ছেলে নিজের নামটুকু লিখতে পারে না। গ্রাম শিক্ষা কমিটির (VEC) সভাপতির মতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমাবনতি হয়েছে গত ২০ বছরে। এ জন্য দায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গ্রামে ১২ জন গৃহ-শিক্ষকতা করেন। শিক্ষার্থী পিছু মাসিক বেতন ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এতেই বোঝা যায় গৃহ-শিক্ষকতার চাহিদা খুব বেশি।

<u>গ্রাম - ভূমশোর</u> <u>ব্লক - ভাতার</u>

ভাতার ব্লকের খুব কাছের গ্রাম ভূমশোর। গ্রামের দুই পাশ দিয়ে চলে গেছে দুটো মোরাম রাস্তা। পুব দিকের রাস্তা গেছে কাটোয়া আর পশ্চিমের রাস্তাটি গেছে নূতনহাট পর্যন্ত। গ্রামের সাড়ে তিন হাজার জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। সামান্য কয়েক ঘর আছে তফসিলী ও বর্ণহিন্দু জাতির। প্রায় সব গ্রামবাসী চাষ আবাদের উপর নির্ভরশীল। প্রায় ১০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন। গ্রামের দুই পাশে দুটো মোরাম রাস্তা। এরই সুবাদে জনা পঞ্চাশেক মানুষ ভ্যান রিকশা চালান এবং দশ জন ট্রাক চালক।

কিছু মানুষ ভাতার কিংবা অন্যত্র রাজ মিস্ত্রির কাজ করেন। ধানের চাষই একমাত্র চাষ। ধান রোপণ ও কাটা এই দুটো কাজের সময় গ্রামের বাইরে থেকে মজুর আনা হয়। গ্রীষ্মে সেচের ব্যবস্থা হয় অগভীর নলকূপ থেকে। খরিফ চাষের জন্য পাওয়া যায় সেচ খালের জল। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। দুটো উচ্চবিদ্যালয় আছে গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। ৫ থেকে ৯ বছরের প্রায় সব ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। জনাকয়েক বালিকা মসজিদে আরবি শিখতে যায়। আরবি শিখলে তারা কোরান পড়তে পারবে।

দারিদ্র্যের জন্য কিশোরদের স্কুল কামাই করে নানারকম অর্থোপার্জনের কাজে লাগতে হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুসলমান। দু'জন সহায়িকার মধ্যে একজনের বাড়ি পাশের গ্রামে। আর যিনি গ্রামের বাসিন্দা তিনি ছেলেমেয়েদের পড়ান স্কুল সময়ের পরে। সম্প্রতি এক মুসলমান ভদ্রলোক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিকে কিছুটা জমি দান করবেন বলে জানিয়েছেন। জমি পাওয়া গেলে কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হবে গয়েশ পাড়ার কাছে গ্রামবাসীরা সন্তানদের বিশেষ করে কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষার পর আর বেশি দূর পড়াতে আগ্রহী নন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি পাওয়া গেছে দানে, আর বেশ বড়সড় বাড়ির একাংশ গ্রামবাসীদের অর্থসাহায্যে তৈরি হয়েছে। দোতলা নির্মাণের জন্য এখন অবধি সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে এক লক্ষ টাকা। স্কুলের জমির কিছু অংশ লিজ দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট বাৎসরিক ভাড়ায়। এ ছাড়া একটা মেলা বসানো হয় প্রতি বছর। এই মেলা থেকে একটা মোটা টাকা স্কুলের উপার্জন হয়। গ্রামবাসীরা খালের মাছ নিলাম করে, সেটিও স্কুলের তহবিলে আসে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জন মুসলিম। হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান ছাত্রদের প্রতি কিছুটা পক্ষপাত-দুষ্ট এমন নজির আমরা পেয়েছি। গৃহ-শিক্ষকতা গ্রামে ভালভাবেই চালু আছে। গ্রামে ৫ জন গৃহ-শিক্ষকতা করেন। বেতন, পড়ুয়া-পিছু মাসে ৩০ টাকার মতো।

গ্রাম - জয়নগর ব্লক - জামুরিয়া-১

চুরুলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে জয়নগর গ্রাম। চুরুলিয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান। গ্রামের ভিতর দিয়ে গেছে একটি মোরাম রাস্তা। গ্রামে যাতায়াতের জন্য বাস কিংবা অন্য যানবাহন নেই। গ্রামে তিনটি পাড়া। বাউরিপাড়া, উপরপাড়া ও নামুপাড়া। বারুই পাড়ায় দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের বাস -- বাউরি আর ডোম। উপরপাড়া ও নামুপাড়ায় বাস করেন বাদ্যকার, তিলি ও গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষ। বাদ্যকাররা তফসিলী জাতিভুক্ত। লাল পাথুরে উঁচুনীচু জমির জন্য কৃষি এই গ্রামের প্রধান জীবিকা হতে পারেনি। বর্ষাকালে এই জমিতে চাষ-আবাদ করা খুবই দুরূহ কাজ। এই এলাকা রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে পড়ে। গ্রামের প্রায় সব পরিবার খনি থেকে কয়লা তোলা অথবা কয়লা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। একটা খনি (তারা কোলিয়ারি) সম্প্রতি ই.সি.এল. কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। এটাই ছিল গ্রামের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। ই.সি.এল. ছেড়ে দেবার পর কয়েকজন পরিত্যক্ত খনির কিছু কিছু এলাকা দখল করে

টাকা লাগিয়ে ব্যক্তিগত খনি বানিয়েছে। তফসিলী জাতির মানুষজন মূলত এইসব ব্যক্তি-মালিকানাধীন খনির কয়লা তোলার কাজ করেন -- দৈনিক মজুর হিসেবে। যাঁরা খনি এলাকা দখল করেছেন তাঁরা ব্যবসায়ীদের কয়লা বিক্রি করেন। যা আয় হয় খনির দখলদার এবং শ্রমিকদের মধ্যে ৭:৩ অনুপাতে ভাগ হয়। শ্রমিকদের রোজগার দৈনিক ৫০ থেকে ২০০ টাকা। খনির কাজ চলে জানুয়ারি থেকে জুন মাস অবধি। পুরো ব্যাপারটাই চলে বে-আইনি ভাবে। পুলিশের সঙ্গে তাই ঘনঘন সংঘর্ষও লেগে থাকে। গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব পাকা বাড়ি ইঁটের পাচিল দিয়ে ঘেরা। ৩ জন পুরুষ শিক্ষক আছেন। ছাত্র-ছাত্রী ১৪০ জন। গ্রামের কিছু মানুষজন স্কুলের পড়াশুনায় আদৌ সন্তুষ্ট নন। তাঁদের কথায় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া ছাত্ররা সামান্য যোগ-বিয়োগের অঙ্কও করতে পারে না। গ্রামবাসীদের মত শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকরা আদৌ মনোযোগী নন। পক্ষান্তরে শিক্ষকরা বলেন, কয়লা থেকে গ্রামবাসীদের উপার্জন, তাই তাঁরা সন্তানদের খনি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করেন। ফলে পড়ুয়ারা পড়াশুনায় অবহেলা করে। এর প্রভাব পড়ে প্রাথমিক শিক্ষায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি রাজনৈতিক দলের অফিসে চলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। বাউরি ও ডোম সম্প্রদায়ের ৫২ জন ছেলেমেয়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়তে আসে। কেন্দ্রের শিক্ষক একজন। তাঁর কাজেরও কড়া সমালোচনা করেছেন অভিভাবকেরা। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে। এর সভা খুব অনিয়মিত। অভিভাবকদের অভিযোগ, কমিটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পুরোপুরি দখলে।

<u>গ্রাম - মধুডাঙ্গা</u>   <u>ব্লক - জামুরিয়া-১</u>

আসানসোল-চুরুলিয়া সড়কের পাশে চুরুলিয়া থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মধু-ডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। যাতায়াতের যানবাহন বাস ও ট্রেকার। গ্রামে বাস করেন দুটি তফসিলী জাতি, বাউরি ও শুঁড়ি, এছাড়া মুসলমান ও কোঁড়া জনজাতির মানুষও আছেন। গ্রামের ৪টি এলাকা -- চাষা পাড়া, মুসলমান পাড়া, বাউরি পাড়া ও কোঁড়া পাড়া। শুঁড়িরা নিজেদের চাষা বলেন। এঁদের কৃষিজমি আছে এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছোটাখাটো ব্যবসায়ী। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দিনমজুরী করেন চাষ আবাদের কাজে বা অন্য কাজে। কৃষিকাজ ও ছোটখাটো ব্যবসা করেন কয়েকজন। তাছাড়া কয়েকজন চাকরি করেন। চাষ আবাদের বড় অসুবিধে, সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই। চাষ সবটাই বর্ষা নির্ভর। জমি বেশ উর্বর -- কিন্তু জলাভাবই কৃষির উন্নতির একটা বড় বাধা। গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে 'সুচেতনা' নামে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনৌপচারিক শিক্ষা (NFE) কেন্দ্র চালান। গ্রামের মাঝখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং এন.এফ.ই. দুটোই বাউরি পাড়ায়। এই গ্রামের প্রান্তে একটি কলেজ আছে -- চুরুলিয়া নজরুল মহাবিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ভালই -- ১৮২ জন। শিক্ষক ৪ জন। স্কুলে পড়াশুনা ভালই হয়। গ্রামের মানুষ এব্যাপারে সন্তুষ্ট। শিক্ষাদানের মান ভাল। বিদ্যালয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম পড়ুয়ার সংখ্যা কম। মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে মুসলমান

ও তফসিলী জাতির সংখ্যা বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি আছে। স্কুল পরিচালনার কাজে অধিকাংশ গ্রামবাসী উদাসীন। দেখে মনে হয়, তরুণ শিক্ষকরা বেশ দক্ষ ও দায়িত্বশীল। গ্রামের মানুষজনও এঁদের পছন্দ করেন। অধিকাংশ অভিভাবক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের চেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই ভাল মনে করেন। বারুই পাড়ার ছেলেমেয়েরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যায়। কেন্দ্রের ৪০ জন পড়ুয়ার মধ্যে মুসলমান ছেলেমেয়ে খুব কম। কোন কোন পড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে গৃহশিক্ষার জায়গা বলে মনে করে, যদিও শোনা যায়, কেন্দ্রে শিক্ষাদানের মান খুব ভাল নয়। একজন সহায়ক এবং একজন সহায়িকা সেখানে শিক্ষাদান কার্যের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের সম্পর্কে গ্রামের মানুষের ধারণা ভাল নয়।

<u>গ্রাম - গোপালপুর</u>　　　　<u>ব্লক - কাঁকসা</u>

কাঁকসা ব্লক এলাকার মধ্যস্থলে গোপালপুর গ্রাম। গ্রাম থেকে ১৫ মিনিটের হাঁটাপথের দূরত্বে রাজবাঁধ বাসস্টপ — বর্ধমান-দুর্গাপুর (জাতীয় সড়ক-২) সড়কের উপর অবস্থিত। গ্রামটি অপেক্ষাকৃতভাবে বড়। গ্রামের সামাজিক সংগঠনে আছে বিবিধ গোষ্ঠীর মানুষ। ১৯৫৬ সালের কাছাকাছি সময় থেকে কিছু মানুষ ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে চলে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা কিছু মানুষ গোপালপুর উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন — তাঁদের কিছু বাস্তু জমি দেওয়া হয় এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। এই সব অভিবাসীদের এখনো বহিরাগত বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিবাসী এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অসন্তোষের একটা কারণ হল — তাঁরা মনে করেন 'বাঙাল'রা তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে এবং এই গ্রামে বসবাসের সুযোগ করে দিচ্ছে। গ্রামের জনসংখ্যা ২,৬০০। গ্রামের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি-নির্ভর। দুর্গাপুর ও সংলগ্ন এলাকার শিল্পোৎপাদনের ক্রমাবনতির জন্য জনসাধারণ ক্রমশ কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়ছেন। এই এলাকার বহু মানুষ আগে ছোট বড় নানা কারখানায় কাজ করতেন। গ্রামের কিছু মানুষ ছোটখাটো ব্যবসা করেন। একটা বড় অংশ মাল বেচা-কেনা এবং বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তফসিলী জাতি ও জনজাতির মানুষরা মূলত কৃষি শ্রমিক। এঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিসংস্কারের ফলে লাভবান হয়েছেন। যদিও মজুরের কাজই এঁদের প্রধান জীবিকা। গ্রামবাসীদের মতে গত ১৫ বছরে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সচেতনতা অনেক বেড়েছে। প্রতিটি পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠান। নগর জীবন ও শিল্প এলাকার প্রভাবে অনেক পরিবারে শিক্ষা এখন যথেষ্ট অগ্রাধিকার পেয়েছে। গোপালপুরে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ২টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। উত্তর পাড়ায় বিদ্যাসাগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটো ঘর। একটি ঘরে ৪টি শ্রেণির পড়াশুনার ব্যবস্থা আর ছোট একটি ঘরে স্কুলের অফিস। শিক্ষকদের মতে প্রধান সমস্যা শ্রেণিকক্ষের অভাব। প্রতি শ্রেণির জন্য আলাদা ঘর নেই। স্কুলের একটি ছোট খেলার মাঠ আছে এবং পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। তফসিলী জাতি এলাকায় স্কুলের অবস্থান হেতু অধিকাংশ পড়ুয়া ওই সম্প্রদায়ের। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৫৩:১। কিছুটা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন বর্ণহিন্দুর

সন্তানদের শহরের স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা লক্ষণীয়। উত্তর .াড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে একটি পরিত্যক্ত দোকানঘরের বারান্দায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে কাজ চলে। কেন্দ্রের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। তাছাড়া কেন্দ্রের অস্থায়ী আচ্ছাদনটি এমন একটি বিপজ্জনক জায়গায়, যার একদিকে খোলা নর্দমা এবং অন্যদিকে গভীর একটা কুয়ো। জানা গেল, সহায়িকা শিশুদের প্রতি খুব মনোযোগী ও যত্নবান। প্রাথমিক বিদ্যালয় কাছে হলেও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশ ভাল। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪০:১। যারা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে তাদের মা-বাবারা প্রায়ই বাংলাদেশে তাঁদের পৈতৃক ভিটেয় যান, তাই এইসব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা খুব অনিয়মিত হয়ে যায়। গৃহ-শিক্ষকতা ভাল রকম চালু আছে। এর একটা কারণ সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এঁরা মনে করেন, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৈরি হতে হলে স্কুলে লেখাপড়াই যথেষ্ট নয়। অনেক শিক্ষিতা গৃহিণী শিশুদের কোচিং ক্লাস চালান।

<u>গ্রাম - রাজকুসুম</u> <u>ব্লক - কাঁকসা</u>

জাতীয় সড়ক-২ (জি.টি. রোড) থেকে ৫ কিমি দূরে রাজকুসুম গ্রাম। গ্রামের নিকটবর্তী বাজার ৩ কিমি দূরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ১৬৩০। এটি এক-ফসলী এলাকা। কিন্তু বোরো চাষের জন্য ১ বছর অন্তর সেচ খালের জল পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা কৃষি-নির্ভর। ৮টি পরিবারের জমি ৫ একরের বেশি, বাকি সবাই প্রান্তিক চাষি। ১৯৯০-এর প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসাক্ষরতা অভিযানের পর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রামের ৭০ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়িটি চোখে পড়ার মতো। ৩টি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি অফিস ঘর। এ ছাড়া আছে বড় সড় একটি খেলার মাঠ। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৭:১। শিক্ষকরা সবাই উদ্যমী। নতুন রকম প্রশ্নপত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ধারণ করতে চান প্রধান শিক্ষক। তাঁর মতে পরীক্ষা না নিয়ে সবাইকে ঢালাও উপরের ক্লাসে তুলে দেওয়ার নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান নেমে গেছে। জানা গেল, শিক্ষার ব্যাপারে পঞ্চায়েত খুব উদ্যমী। পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনার উপর নজর রাখেন এবং নিবিড় পরিদর্শনের জন্য নিয়মিত সভা ডাকেন। গৃহশিক্ষার সুযোগ পায় ২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া তফসিলী জাতি ও জনজাতির মানুষ। তাই ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার সামর্থ তাঁদের নেই। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র দুটি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা হাজরাডাঙা ও আধকাডাঙায় অবস্থিত। আধকাডাঙা পুরোপুরি সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা। এখানকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নিজস্ব বাড়ি নেই। কাজ চলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাড়িতে। গ্রামবাসী কেন্দ্রের কাজকর্মে খুশি। দুই জন সহায়িকা কাজ করেন। যেহেতু পড়ুয়াদের ভাষা সাঁওতালী আর সহায়িকা দুজনের ভাষা বাংলা, তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভাষার একটা সমস্যা আছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত একটি বিদ্যালয় আছে এই গ্রামে। বিদ্যালয়ে কাজ করেন ৭ জন শিক্ষক, ১ জন ডাক্তার, ১ জন পাচক এবং একজন করে ঝাড়ুদার, কেরানি ও পিয়ন। এখন এই বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের। ভবিষ্যতে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যালয়কে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কর্তৃপক্ষের।

মূর্শিদাবাদ জেলা

গ্রাম - ধুসুরি পাড়া কলোনি   ব্লক - সামশেরগঞ্জ

ধুসুরিপাড়া কলোনি ফারাক্কা থেকে ২২ কিমি দূরে। গ্রামের সবচেয়ে কাছের বাসস্টপ সাজুর ২ কিমি দূরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের (বহরমপুর-ফারাক্কা) উপর অবস্থিত। গ্রামে তফসিলী জাতির মানুষজনের সংখ্যা বেশি। গ্রামে ৫৫০টি পরিবার এবং লোকসংখ্যা ৩ হাজারের মত। গ্রামে একটা সমবায় ঋণ সমিতি আর তিনটি মুদিখানা আছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা অনেকগুলো নলকূপ থেকে এবং সব ক'টি নলকূপ চালু আছে। কিছু গ্রামবাসীর চাষের জমি আছে। এখানে প্রধান জীবিকা হল বিড়ি বাঁধার কাজ। গ্রামের ১০ শতাংশ মানুষ খেতমজুরের কাজ, চাষ আবাদ, মাছ ধরা, ব্যবসাপাতি এবং দিনমজুরীর সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য মানুষদের একমাত্র নির্ভরতা বিড়ি বাঁধার কাজে। এজেন্ট (দালাল) কেন্দু পাতা দেয়। বিড়ি বাঁধার মজুরী প্রতি হাজারে ৩৭ টাকা ২০ পয়সা। সারা দিন একজন শ্রমিক ৭০০-৮০০ বিড়ি বাঁধাতে পারেন। আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরাও বিড়ি বাঁধার কাজ করে।

ধুসুরিপাড়া কলোনিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কোন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। কিন্তু পাশের গ্রাম হাসিমপুরে একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। তাই ধুসুরিপাড়া কলোনির উত্তর দিকের ছেলে-মেয়েরা এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়তে যায়। গ্রামের দক্ষিণে প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের দুটি বাড়ি। একটি পাকাবাড়ি আর একটির দেয়াল পাকা - টিনের ছাউনি। স্কুলে চারজন শিক্ষক -- তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। সব শিক্ষকরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৩৮।

প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেটে পড়ে। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের টিউশন ফি মাসে ৪৫-৫০ টাকা। ১৯৯৯ সালে যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তার কোন ঘরবাড়ি নেই। তাই কেন্দ্র চলে খোলা জায়গায়। ৩ জন সহায়িকা কাজ করেন। এখন কেন্দ্রে চারটি শ্রেণি, মোট ছাত্র-ছাত্রী ৯৫। মা-বাবারা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতে চাননা। কারণ এরা বিড়ি বেঁধে অর্থোপার্জনে সক্ষম। পড়তে পড়তে স্কুল ছেড়ে দেওয়া পড়ুয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। পড়া ছেড়ে দেওয়ার অনেকগুলো কারণ -- যেমন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা নেই। ঠিক সময়ে পড়ুয়ারা পাঠ্যপুস্তক পায় না। তাছাড়া কেন্দ্র থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে পাস করে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে কি না এব্যাপারে গ্রামবাসীদের কোনও ধারণা নেই।

গ্রাম - খেজুরতলা   ব্লক - সামশেরগঞ্জ

খেজুরতলা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান। গ্রাম থেকে এক কিমি দূরে পাকা রাস্তা আর সবচেয়ে কাছের বাস স্ট্যান্ডের দূরত্ব ৩ কিমি। এই গ্রামে ২৫০টি পরিবার, লোকসংখ্যা ২ হাজারের মত। অধিকাংশ বাড়ি বেশ উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। জানা গেল খেজুরতলার অধিবাসীরা আল্হাদি সম্প্রদায়ভুক্ত, খুব রক্ষণশীল এবং পর্দাপ্রথার সমর্থক।

গ্রামের মানুষজন বিড়ি শিল্পে এবং চাষআবাদের কাজ করেন। এ গ্রামের শতকরা

১০ জন, ২০ থেকে ৩০ বিঘা জমির মালিক। আর ২ থেকে ৪ বিঘা করে জমির মালিক শতকরা ২০ শতাংশ। বাকিরা সবাই প্রায় ভূমিহীন মজুর। খাস জমি নেই বলে, এ গ্রামের কেউই জমির পাট্টা পাননি।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি অচল। এই গ্রামের নিরক্ষরতার হার বেশি। গত ২০ বছরে এ গ্রামের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অভিভাবকেরা বিশেষ করে মায়েরা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী ও তৎপর। কিন্তু এই উন্নতির দীর্ঘস্থায়ী কোনও ফল পাওয়া যাচ্ছে না, যেহেতু পড়ুয়ারা বিশেষ করে কিশোরীরা কম বয়সেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে বিড়ি বাঁধার কাজে লেগে যাচ্ছে। গত বছর স্কুল-ছুটের হার ছিল অনেক বেশি। অনেক পড়ুয়া তৃতীয় শ্রেণির পর স্কুল ছাড়ে। ছেলে-মেয়েদেরও পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। বিড়ি বাঁধার কাজ করে সহজে টাকা রোজগার করার দিকে তাদের ঝোঁক বেশি। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই খুব কম বয়স থেকে অর্থোপার্জনের কাজকর্মে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪টি ঘর, একটি লম্বা বারান্দা এবং চারদিকে ঘেরা পাঁচিল। স্কুলে ৩ জন শিক্ষক, সবাই পুরুষ এবং কেউ এই গ্রামের বাসিন্দা নন। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ১:১১০। অভিভাবকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন। পক্ষান্তরে, শিক্ষকদের বক্তব্য হল, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন আগ্রহ নেই। গ্রামবাসীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সব সমস্যার কথা বলেছেন, সেগুলি হল -- ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত খুবই খারাপ, ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির দিকে শিক্ষকদের কোনও নজর নেই, স্কুলে কোন শিক্ষিকা নেই।

গ্রামের মানুষজন অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সচেতন। বলা হয়, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের সন্তান-সন্ততিদের দিকে শিক্ষকরা মনোযোগী। গ্রাম শিক্ষা কমিটির (VEC) শতকরা ৯০ ভাগ সদস্য সেই রাজনৈতিক দলের। দুপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়ে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ পড়ুয়া সকালে পড়তে যায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রকে এক রকম গৃহশিক্ষকতার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে একজন সহায়িকা এবং দু'জন সহায়ক। সবাই গ্রামের বাইরে থেকে আসেন। এবং এই মুসলমান-প্রধান গ্রামের এঁরা তিনজনই হিন্দু। এই গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দুটি ঘর এবং ভবিষ্যতে আরো দুটো ঘর তৈরির ব্যবস্থা আছে। এই রকম শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আমাদের সমীক্ষায় একটি বিরল দৃষ্টান্ত। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য গ্রামেরই একজন ৫ কাঠা জমি দান করেন, আর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাড়ি তৈরির টাকা মঞ্জুর করেছেন।

<u>গ্রাম - নসিপুর</u>　　　　<u>ব্লক - হরিহরপাড়া</u>

নসিপুর থেকে জেলা সদর বহরমপুরের দূরত্ব ১৬ কিমি এবং ব্লক সদর হরিহরপাড়ার দূরত্ব ২ কিমি।

গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান। গ্রামের হাজার পাঁচেক মানুষের মধ্যে জনা পঞ্চাশেক তফসিলী জাতির মানুষ। ব্লক অফিসের এত কাছের এই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছয়নি।

পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীরা নলকূপ এবং ইঁদারার উপর নির্ভরশীল। গ্রীষ্মকালে গ্রামে জলাভাব দেখা দেয়। প্রায় ৮০ ভাগ জমি দো-ফসলী এবং বাকি ২০ ভাগ বহু-ফসলী। প্রধান ফসল হল ধান, পাট এবং গম। প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষের জমি আছে, কিন্তু অধিকাংশই ছোট ছোট জমির মালিক। শতকরা ১৫ জন গ্রামবাসী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সামান্য কয়েকজন সরকারী চাকরি করেন। বাকি সকলের জীবিকা মূলত কৃষি ক্ষেত্রে দিনমজুরী। অনেকে ইঁটভাটায় এবং নির্মাণ কাজে মজুর খাটতে যান। খেতমজুরদের মজুরী দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ টাকা।

গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব পায়ে হাঁটা পথে ১০ মিনিট। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়া গ্রামবাসীরা মিশন স্কুলের অবাধ সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন। মিশন স্কুল হরিহরপাড়ায় অবস্থিত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সামগ্রিকভাবে, এই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনোর অবস্থা খুব খারাপ। এই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২২৩। দু'জন শিক্ষক এবং একজন প্রধান শিক্ষক থাকলেও এঁরা পড়াশুনো ভুলে বসে আছেন -- পড়াতেই পারেন না। একজন শিক্ষককেই ২২৩ জন পড়ুয়াকে সামলাতে হয়। একটা ঘরোয়া ব্যবস্থাপনা অনুসারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্প্রতি স্থানীয় এক যুবককে পড়াতে অনুরোধ করেছেন।

শিক্ষকদের মতে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে অভিভাবকদের সামান্যতম সচেতনতা নেই। শিক্ষকরা মনে করেন স্কুলে ছাত্র-ভর্তির এত যে ভিড় তার একমাত্র কারণ হল স্কুলে ছাত্রদের চাল দেওয়া হয়।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের দু'জন সহায়ক এবং তিনটে শ্রেণিতে ৪৫ জন পড়ুয়া। কেন্দ্রের কোন নিজস্ব জায়গা নেই। গ্রামের একজনের ব্যক্তিগত জমিতে কেন্দ্রের অস্থায়ী চালা। ব্লক অফিসের দেওয়া ত্রিপলের ছাউনির নীচে পড়াশুনোর কাজ চলে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজকর্মের উন্নতির ব্যাপারে কেন্দ্র পরিচালক কমিটি কোন সহযোগিতা করেন না বরং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন।

এসব সত্ত্বেও, কেউ কেউ বলেছেন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কাজকর্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো। বড়লোকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কোনওটাই পছন্দ করেন না। কারণ ওখানে পড়াশুনোর মান খুব খারাপ। তাই তাঁরা ছেলে-মেয়েদের পাঠান মিশন স্কুলে। যে সব পড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ে ভবিষ্যতে তারা স্থানীয় হাইস্কুলে ভর্তি হতে পারবে কি না এ নিয়ে অভিভাবকদের আশঙ্কা আছে। বোঝা যায়, হাইস্কুলের শিক্ষকরা এই সব অভিভাবকদের বলেছেন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত এলাকায় আলাদা বিশেষ স্কুল হবে আর হাইস্কুলে পড়বে শুধুমাত্র প্রাথমিক স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা।

ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে মা-বাবাদের উদাসীনতার জন্য প্রধান শিক্ষক দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, অভিভাবকরা রাজনৈতিক দলের 'কমরেড'দের প্রতিই অনুগত -- শিক্ষকদের প্রতি নয়। এ অঞ্চলে তিন-চারজন গৃহশিক্ষকতা করেন। এই

গৃহশিক্ষকদের একজন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়ক এবং অন্যজন এক তরুণ -- যাঁকে প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

<u>গ্রাম - রুকুনপুর (মাঠপাড়া)</u> <u>ব্লক - হরিহরপাড়া</u>

জেলা সদরের পূবদিকে ২৮ কিমি দূরে রুকুনপুর (মাঠপাড়া) গ্রামটি অবস্থিত। প্রধান সড়ক থেকে হাঁটাপথে ২ কিমি। গ্রামে ৫০০ পরিবারে প্রায় ২,৭০০ লোকের বাস। এটি প্রধানত মুসলমান-প্রধান গ্রাম। গ্রামের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বর্ষাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে নিয়মিত যাতায়াতের প্রধান বাধা হল এই রাস্তা।

গ্রামটি কৃষি-নির্ভর। শতকরা ২০ থেকে ২৫টি পরিবারে চাষের জমি আছে। বাকিরা সবাই ক্ষেতমজুর। গোটা ১২টি পরিবার ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সেচের মূল উৎস হল অগভীর নলকূপের (স্যালো টিউবওয়েল) জল।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। জানা গেল যদিও শতকরা ১০০ ভাগ ছেলে-মেয়েই স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তার মধ্যে স্কুলে যায় শতকরা ৭০ ভাগ। অভিভাবকরা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। অনেকে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছুক, কিন্তু দারিদ্রের জন্য পারেন না। গরিব মা-বাবারা স্কুলে যাবার জন্য মেয়েদের ভদ্র জামা-কাপড় দিতে পারেন না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটি কক্ষ আছে, যার মধ্যে দুটি শ্রেণিকক্ষ হিসেবে এবং একটি অফিসঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৮৪:১। স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রী মুসলমান, কিন্তু তিন জন শিক্ষক সকলেই হিন্দু এবং তাঁরা গ্রামের বাসিন্দা নন। প্রধান শিক্ষক সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন। সাধারণ মানুষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন। গৃহশিক্ষকতার প্রচলন খুব বেশি। কারণ অভিভাবকদের মতে, "স্কুলে মাস্টারমশাইরা পড়ান না"। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া জানে কি জানে না এটা ঠিক করে প্রাইভেট টিউশন -- এটা সর্বসাধারণের মধ্যে চালু কথা। সামান্য কিছু পড়ুয়া স্কুলে নিয়মিত যায় -- অনেকেই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো খুব খারাপ -- পড়াশুনো হয় আমগাছের নীচে। কেন্দ্র চালান ২ জন সহায়িকা ও ১ জন সহায়ক। সহায়িকা ২ জন আসেন গ্রামের বাইরে থেকে, কিন্তু সহায়ক গ্রামের বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে ২ জন মুসলমান এবং ১ জন হিন্দু। পাঠ্যপুস্তকের অনিয়মিত সরবরাহ, উৎসাহবর্ধক কোনও প্রকল্প এবং পরিকাঠামোর অভাবের জন্য সহায়করা উদ্বিগ্ন। বিনে পয়সায় চাল পাওয়ার লোভে অনেক পড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদানের আবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেননি। সহায়করা এজন্য পঞ্চায়েতের উপর অসন্তুষ্ট। অভিভাবকেরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামোর অভাব সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেও সহায়কদের সম্পর্কে এবং কেন্দ্রে কাজকর্মে তাঁরা বেশ সন্তুষ্ট।

গ্রাম - সইদপুর　　　　　ব্লক - ভগবানগোলা-২

লালবাগ শহর থেকে ২৫ কিমি পূবে, লালবাগ-জিয়াগঞ্জ বাস রাস্তার উপর সইদপুর গ্রাম। গ্রামে সংযোগকারী রাস্তাটি পাকা। পরিবারগুলির ভিটে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো। এটি পুরোপুরি মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রাম। খুব বড় গ্রাম, সাড়ে পাঁচশো পরিবারে লোক সংখ্যা ৩,৯০০। গ্রামে একটি রেশন দোকান আছে, কিন্তু কোন ডাকঘর নেই। গভীর নলকূপ পানীয় জলের প্রধান উৎস।

গ্রামের অর্থনৈতিক কাজকর্ম হল চাষ আবাদ এবং কৃষিভিত্তিক অন্যান্য কাজ। শতকরা ৪৫ ভাগ গ্রামবাসীর নিজস্ব চাষ জমি আছে। বাকি ৪৭ ভাগ মানুষ খেতমজুর। সামান্য কয়েকজন চাকরিজীবী এবং ছোটোখাটো ব্যবসা করেন। সেচের জন্য গ্রামবাসীরা অগভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল।

এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, একটি মাদ্রাসা এবং একটি বেসরকারী স্কুল আছে। গ্রামের অধিবাসীরা শিক্ষা সম্পর্কে ভালরকম সচেতন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান গ্রামের দক্ষিণাংশে। চারটি শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট স্কুলের পাকা বাড়িটা খুব ভাল। ছাত্র-ছাত্রী ৩৫২ জন এবং শিক্ষক ৫ জন। ৪ জন শিক্ষক মুসলমান, ১ জন হিন্দু। গ্রামে হিন্দু শিক্ষকের খুব সুনাম আছে। স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার খুব বেশি, সেজন্য স্কুলে আরো শিক্ষকের প্রয়োজন। যদিও গ্রামে বেশ কিছু মানুষ নিরক্ষর, কিন্তু তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনো করানোর ইচ্ছে প্রবল। তাঁরা মনে করেন, বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের অভাবই মূল সমস্যা। এই গ্রামে গৃহশিক্ষকতার প্রচলন মাঝারি ধরনের। যদিও প্রায় সব অভিভাবক মনে করেন গৃহশিক্ষকের খুবই দরকার তাঁদের সন্তানদের ভাল করে লেখাপড়া শেখানোর জন্য, কিন্তু অনেকেরই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার আর্থিক সঙ্গতি নেই।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটিও গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। কেন্দ্রটির কোন ঘরবাড়ি নেই। লেখাপড়া হয় আমগাছের নিচে। ৮০টি পড়ুয়ার জন্য সহায়িকা ২ জন। সহায়িকাদের মতে অভিভাবকরা বেশ উদ্যমী এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অভিভাবকদের মতে, বাড়িঘর না থাকাটাই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে মূল সমস্যা। পাঠ্যপুস্তকের অনিয়মিত সরবরাহ আর একটি বড় সমস্যা।

গ্রাম - আমডহরা　　　　　ব্লক - ভগবানগোলা-২

বহরমপুর জেলা সদর থেকে আমডহরার দূরত্ব ২২ কিমি — আখেরিগঞ্জ ব্লক অফিস থেকে ১০ কিমি। গ্রাম থেকে ২ কিমি দূরে জিয়াগঞ্জ পৌরসভার আসাইপাড়া বাজার।

গ্রামটি ছড়ানো ছিটানো। জনসংখ্যা ৪,০০০। ৬০ শতাংশ হিন্দু, বাকিরা মুসলমান। মজার ব্যাপার হল এ গ্রামে প্রতিটি মানুষের পরিচয় তার ধর্ম দিয়ে। হিন্দুদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ তফসিলী জাতিভুক্ত। এ গ্রামের শতকরা ৫ জন কৃষক, শতকরা ৫০ জন খেতমজুর এবং শতকরা ১ জন মানুষ কাজ করেন ইটভাটায়। বাকিদের জীবিকা নানারকম। যেমন, ছোট ছোট ব্যবসা, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, জুতো তৈরি, লোহালক্কড়ের

ব্যবসা, সরকারী চাকরি, মাছ ধরা, বিড়ি বাঁধা, ইত্যাদি। মূলত মেয়েরাই বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। গ্রামবাসীদের চাষের জমি খুবই কম। জমি দো'ফসলি কিংবা বহু-ফসলি। পাট, ধান, লংকা, সরষে, আলু এবং নানারকম তরিতরকারির চাষ হয় এইসব জমিতে। গ্রামটি আর্সেনিক প্রবণ।

গ্রামে পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপ। গ্রামের একাংশে বিদ্যুৎ এসেছে। প্রতিদিন সবজি বাজার বসে। ক্ষেতমজুরদের দৈনিক মজুরি ৩০ থেকে ৫০ টাকা। মজুরির বাড়া কমা নির্ভর করে মরসুমের উপর।

বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ সাক্ষর, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স যাদের সেই সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৯০ শতাংশ। গ্রামের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, দু'টো শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং অতি সম্প্রতি একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তাটির পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়।

একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র মুসলমান পাড়া হাজিগঞ্জে, অন্যটি ঠাকুরপাড়ায়। বিলপাড়ার তফসিলী জাতির বাস। তাই বিলপাড়া থেকে তফসিলী জাতির পড়ুয়াদের অনেকটা হেঁটে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যেতে হয়। হাজিগঞ্জ পাড়ার সব পড়ুয়া মুসলমান বাড়ির ছেলে-মেয়ে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটো বাড়িতে ৩টে শ্রেণিকক্ষ। একটি বারান্দাতেও ক্লাস হয়। এছাড়া আছে একটি অফিস ও গুদামঘর। স্কুলে ৪ জন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৯২ জন।

যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি আমরা সমীক্ষা করেছি, সেটির পড়াশুনো চলে খোলা আকাশের নীচে। কেন্দ্রে ৪টি ক্লাসের জন্য ৩ জন সহায়িকা। পড়ুয়া ৬৫ জন। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতির কারণ অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও অনাগ্রহ। অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের অর্থোপার্জনের কাজ করার জন্য বাধ্য করেন বাবা-মায়েরা। অনেক পড়ুয়া চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশুনো করে হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছেলে-মেয়েরা গৃহ-শিক্ষকতার সাহায্য নেয়। গ্রামে প্রায় দশ জন গৃহ-শিক্ষকতা করেন। এঁরা সবাই গ্রাজুয়েট (স্নাতক)। টিউশন ফি ৩০ থেকে ৪০ টাকা।

দার্জিলিং জেলা

<u>গ্রাম - আলুবাড়ি-ফুলবাড়ি</u> <u>ব্লক - বিজনবাড়ি</u>

গ্রামটি দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের আওতার মধ্যে। দার্জিলিং শহর থেকে ২ কিমি দক্ষিণে। একটি কাঁচা রাস্তায় গ্রামটি যুক্ত হয়েছে প্রধান সড়কের সঙ্গে। বহু জাতির মানুষ এই গ্রামে বাস করেন। তফসিলী জনজাতি, তফসিলী জাতি, মুসলমান, বর্ণ হিন্দু পরিবারের বসতি এই গ্রামে। গ্রামে চারটি পাড়া — গার্ডেন পাড়া, বস্তি পাড়া, ধোবি পাড়া এবং নীচু আলুবাড়ি। গ্রামের পরিবার সংখ্যা মোটামুটি ১০০ এবং জনসংখ্যা ৪২০। গ্রামে একটি টীকাকরণ কেন্দ্র এবং একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

১ জন ডাক্তার, ১ জন নার্স, ১ জন সহকারী এবং ২ জন ধাত্রী কাজ করেন। গ্রামে একটা রেশন দোকান এবং দু'টো মুদিখানা আছে।

গ্রামবাসীরা অনেকে চা বাগানের শ্রমিক আবার কেউ কেউ দিনমজুর। তাছাড়া কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসা চালান। সামান্য দু'চারজন সরকারী চাকরি করেন। তিন-চারটি পরিবারের নিজস্ব (রায়তী) চাষ জমি আছে। গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষক, তার মধ্যে ৬ জন মহিলা। শিশু (নার্সারি) শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্য্যন্ত ৬টি শ্রেণি। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কাঠের বাড়ি আছে, কিন্তু বাড়িটির অবস্থা খুবই খারাপ। অভিভাবকরা শ্রম ও অর্থ দিয়েছেন মেরামতের জন্য। শিক্ষকরা বলেন, বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে সারানোর খরচ জোগানোর আর্থিক সঙ্গতি নেই অভিভাবকদের। স্কুলে একটা হাজিরা কমিটি আছে -- এর পাঁচজন সদস্যের সকলেই পুরুষ। প্রধান শিক্ষকই এই কমিটির সম্পাদক এবং একজন ৬৯ বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত অভিভাবক হলেন সভাপতি। কমিটির মাত্র দু'জন অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত। অন্য ৩ জন মনোনীত। একজনকে মনোনীত করেন পুরপিতা, আর একজন মনোনীত হন শিক্ষানুরাগী হিসাবে। মাসে একবার কমিটির সভা হয়। শিক্ষকরা সমস্ত অভিভাবকদের সভা ডাকেন, বছরে অন্তত ২ বার। যাঁরা এই মিটিং-এ যোগ দেন তাঁদের অর্ধেক হলেন পড়ুয়াদের মা। কমিটির সভাপতির মতে আজকাল ছেলে-মেয়েদের বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর একটা কেতা হয়েছে। জনসাধারণ প্রলুব্ধ হচ্ছেন, নেক-টাই, জুতো আর ইংরেজি বুলির প্রতি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫০০ মিটার উপরে একটি টিলার উপর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। কেন্দ্রে কাজকর্ম চলে যে বাড়িতে তার একটা মাত্র ঘর এবং এই বাড়িতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজও চলে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে সহায়িকা ৩ জন। এঁদের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট। অবশ্য, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ এলাকার অন্যান্য বহু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মতো এই কেন্দ্রও এক রকম অবৈতনিক গৃহশিক্ষা দানের কাজ করে। কিছু পড়ুয়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'জায়গাতেই পড়তে যায়।

<u>গ্রাম - সাংমা-রানিবন</u> <u>ব্লক - সুখিয়াপোখরি</u>

এই গ্রামটিও দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের আওতার মধ্যে। গ্রামটি প্রধান বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে। ৭১টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪টি তফসিলী জাতির। অধিবাসীরা প্রায় সবাই বৌদ্ধ।

৯০ শতাংশ গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী বিড়লা চা বাগানের শ্রমিক। এঁদের কারোরই কৃষি জমি নেই। তবে কয়েকজন নিজেদের ভিটে সংলগ্ন ছোট জমিতে তরিতরকারির চাষ করেন। চা বাগানের কর্তৃপক্ষ দু'কামরা বিশিষ্ট কাঠের বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে শ্রমিকদের জন্য। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি এই ধাঁচের। সামান্য কয়েকটা পাকা বাড়ি আছে। শতকরা ৩০ জন পড়ুয়া বেসরকারী স্কুলে পড়ে। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বেশ বড়। লম্বা একটা পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ আছে। স্কুলের সামনে নানা রঙের পতাকা লাগানো। পতাকার রঙগুলি বিভিন্ন

বাড়ির প্রতীক। অফিস ঘর সুন্দর করে সাজানো। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়াশুনো হয় আলাদা আলাদা ঘরে। একটা ঘরের মাঝখানে কাঠের দেওয়াল। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাস হয়। আর একটা ঘর আছে, সেখানে শিশু শ্রেণি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের বিশেষভাবে যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়। ছাত্র-শিক্ষকের হার ১৪:১। স্কুলে ৯ জন শিক্ষক। ৬ জন স্থায়ী শিক্ষক এবং ৩ জন শিক্ষককে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ থেকে মাসিক ৩ হাজার টাকার বেতনে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। মেধার পরীক্ষায় পড়ুয়ারা ভাল ফল করে। শিক্ষকরা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতিও নজর দেন। বিদ্যালয় কিছু কিছু ক্রীড়া সরঞ্জাম পড়ুয়াদের দেয়। এ সব সত্ত্বেও, যথেষ্ট পরিমাণে লেখাপড়ার উপকরণ এবং খেলাধুলার সরঞ্জামের অভাব অনুভব করেন শিক্ষক মশাইরা। পার্বত্য পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠ্যপুস্তক বাতিল করে দিয়েছে। কারণ রাজ্য সরকারের বইতে সমতল জীবনের গল্পগুলি পার্বত্য এলাকার পড়ুয়াদের বোঝা কষ্টকর। সারা বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রাণচঞ্চল। ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্যবান, সুসজ্জিত এবং তরতাজা। সবাই লেখাপড়ায় ব্যস্ত।

এই গ্রামে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বোধহয় দরকার ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনো ছেড়ে দেয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রধানত তাদেরই লেখাপড়া শেখায়। অনেক পরিবারে মা-বাবা দুজনেই চা বাগানে কাজ করেন সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। তাই তাঁদের কিশোরী কন্যারা গৃহস্থালির কাজকর্মের জন্য বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। এরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়তে যায়। কেন্দ্র চলে বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। কেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৫-এরও কম। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৮:১।

<u>গ্রাম - মন্টেভিয়েট</u>　　　　<u>ব্লক - কর্শিয়ং</u>

কর্শিয়ং শহরের কাছেই মন্টেভিয়েট গ্রাম। পাহাড়ী রাস্তার জন্য কর্শিয়ং থেকে গ্রামে যেতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। এই পাহাড়ি পথ ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো উপায় নেই। চা বাগান অঞ্চলের এই গ্রামে ৪টে পাড়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে পাড়ায় অবস্থিত সেটির নাম পান্ডুবস্তি। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি সু-ধা-পা টোল পাড়াতে অবস্থিত। এই পাড়া কর্শিয়ং শহরের খুব কাছে। মন্টেভিয়ট গ্রামে ১৩০টি পরিবার বাস করে। ৭০টি পরিবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ৪৫টি হিন্দু এবং ৫০টি পরিবার খ্রিস্টান।

গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ আছে। ঝরনা থেকে আসে পানীয় জল। রেশন দোকান, ডাকঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক্তার, মুদিখানা প্রভৃতি অন্যান্য সুযোগসুবিধা সবই কর্শিয়ং শহরে অবস্থিত। প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন চা বাগানে কাজ করেন। চা বাগানে শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি পান ৪২ টাকা। মজুরির হার সারা বছর একই থাকে, ওঠা-নামা করে না। উপরন্তু প্রায় ২৫ শতাংশ পরিবারের সদস্য সেনা বিভাগে কাজ করেন।

সু-ধা-পা টোল গ্রামটি মন্টেভিয়েটের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত। যদিও এই গ্রামে কিছু পরিবারের জীবিকা দিনমজুরি। গরিব বাড়ির ছেলে-মেয়েরা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে

পড়ে। এর প্রধান কারণ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যে সময় পড়াশুনো হয়, সেই সময়টা তাদের কাছে সুবিধাজনক।

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় ২০ বছর আগে নির্মিত হয়। এমনিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বেশ ভাল। কিন্তু, কর্শিয়ং শহরে বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক বেশি। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায়। ৫ জন শিক্ষক খুবই অনিয়মিত। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ বলেন ১২ জন, কেউ বা বলেন ২০ জন। কিন্তু বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেছেন ১২৮ জন পড়ুয়া স্কুলে পড়ে।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি মিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৯ জন। কেন্দ্রে দুই জন শিক্ষক। লেখাপড়া হয় একটা বড় কমিউনিটি হলে। এই হল প্রায়ই নানা সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ফলে ঘন ঘন কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে। এই হলে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং বিদ্যুতের খরচ বহন করেন সহায়িকারা নিজেরাই। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কিছু পড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পড়াশুনো করে এবং এই কেন্দ্রকে এক রকম গৃহশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেন। মন্টেভিয়েট গ্রামের সব অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ান। বেসরকারি স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করেন। অভিভাবকরা মনে করেন সন্তানদের গৃহশিক্ষকদের কাছে না পড়ালে স্কুলের পরীক্ষায় ফল খারাপ হবে। তাই পড়ুয়ারা বাধ্য হন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে।

<u>গ্রাম - ছোটা আদলপুর</u>   <u>ব্লক - কর্শিয়ং</u>

শিলিগুড়ি-গরিধুরা বাস রাস্তার উপর ছোটা আদলপুর গ্রাম। বাস স্টপ থেকে গ্রামে যাবার রাস্তাটি কাঁচা। ছোটা আদলপুর ছোট্ট একটি গ্রাম। ৪৮টি পরিবারে প্রায় ২৫০ জন মানুষ বাস করেন। এখানে নানা জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের বাস -- নেপালিরা যেমন আছেন, তেমনি কিছু বাঙালি, বিহারিরাও আছেন। এ ছাড়া কিছু ওঁরাও এবং সাঁওতাল জনজাতির মানুষ এবং কয়েকটি মুসলমান পরিবারও এখানে বাস করেন। এই গ্রামটি দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের আওতাভুক্ত। কিন্তু পার্বত্য পরিষদের অন্যান্য যে সব গ্রাম আমরা সমীক্ষা করেছি সেগুলির আর্থসামাজিক অবস্থার চেয়ে ছোটা আদলপুরের অবস্থা ভিন্ন ধরনের। ভূমি ব্যবস্থা সমতল বাংলার মতোই। অধিকাংশ গ্রামবাসী (প্রায় ৮০ শতাংশ) নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক। কিছু আছেন চা বাগানের শ্রমিক আর সামান্য কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসা করেন। নিকটবর্তী সুকনা সেনা নিবাসে কয়েকজন গ্রামবাসী মালি বা দারোয়ানের কাজ করেন। গ্রামে কোনও চাষের জমি নেই। প্রায় সব জমি গ্রামের উল্টোদিকে চা বাগানের মালিকানাধীন। এই গ্রামে রেশন দোকান নেই, ডাকঘর নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ সবের সুবিধে পেতে হলে গ্রামবাসীদের পাশের গ্রাম শিমুলবাড়িতে যেতে হয়।

এই গ্রামে (ছোটা আদলপুর) একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি বেসরকারি বিদ্যালয় আছে। গ্রামের সবচেয়ে কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ কিমি দূরে শিমুলবাড়িতে। তুলনামূলকভাবে শিমুলবাড়ি বড় গ্রাম। প্রায় ৬০০ পরিবারের বাস এই গ্রামে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের টিনের ছাউনি দেওয়া পাকা বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভাল। ৫টা শ্রেণিকক্ষ আছে। ৮ জন শিক্ষক এবং ছাত্র সংখ্যা ১৯২ জন। ৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন অস্থায়ী। এঁদের নিয়োগ করেছেন দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ। বিদ্যালয়ে নেপালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু শিমূলবাড়ি ও ছোটা আদলপুর গ্রামের অনেকেই নেপালি ভাষায় কথা বলেন না, তাই তাঁরা চান শিক্ষাদানের মাধ্যম পরিবর্তন করা হোক। গ্রামের মানুষজন শিক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। বেসরকারি স্কুলে সন্তানদের পড়ানোর আর্থিক সঙ্গতি অনেকেরই নেই। ছোটা আদলপুর গ্রামের মাঝখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। কেন্দ্রের কোনো নিজস্ব বাড়ি নেই। এই গ্রামের 'সানরাইজ প্রাইভেট স্কুলের' দুটি শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা হয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য। বেসরকারি বিদ্যালয়টির ছুটি হয়ে গেলে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ক্লাসে হয়। কেন্দ্রে ২ জন শিক্ষক -- ১ জন সহায়ক এবং ১ জন সহায়িকা। দুটো শ্রেণিতে ৮০ জন পড়ুয়া আছে। কেন্দ্রের যিনি সহায়ক, তিনি বেসরকারি স্কুলটিতে অশিক্ষক কর্মী হিসেবে কাজ করেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি অবৈতনিক গৃহশিক্ষা কেন্দ্র রূপেও ব্যবহৃত হয়। কিছু ছাত্র-ছাত্রী যারা বেসরকারি স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে তারাও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে।

<u>গ্রাম - সেবদেল্লা</u> <u>ব্লক - নকশালবাড়ি</u>

শিলিগুড়ি-পানিট্যাঙ্কি সড়কে শিলিগুড়ি থেকে ১৭ কিমি দূরে এই গ্রাম। হাতিঘিসা বাস স্টপ থেকে হাঁটা পথে গ্রামটি ১ কিমি দূরে। এই গ্রামে জনজাতি পরিবারের সংখ্যা খুব বেশি। এঁদের মধ্যে আছেন সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও এবং কিষান সম্প্রদায়। এছাড়া আছেন মুসলমান ও রাজবংশীরা। গ্রামটি বেশ ছড়ানো। পরিবারের সংখ্যা ৩০০। প্রধান অর্থোপার্জন চাষ আবাদ এবং ক্ষেতমজুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া সামান্য কিছু চা বাগানে শ্রমিক ও রাজমিস্ত্রিও আছেন এই গ্রামে। কয়েকজন গ্রামবাসীর নিজস্ব কৃষি জমি আছে।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। কিছু পড়ুয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের বেসরকারি মিশনারি জুনিয়র হাইস্কুলে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া খুব ভাল হয়, কিন্তু শতাধিক ছাত্র সংখ্যায় ১ জন মাত্র শিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন। তিনি দীর্ঘ ছুটিতে আছেন। একমাত্র তরুণ শিক্ষক খুব পরিশ্রমী, কাজ করেন মন প্রাণ দিয়ে। তাছাড়া পড়ানও খুব ভাল। তিনি এককভাবে বিদ্যালয়টি ভালই চালান, কিন্তু প্রধান সমস্যা হল শিক্ষকের অভাব। আর একটি চোখে পড়ার মতো ঘটনা হল, এই গ্রামে গৃহশিক্ষকতার প্রচলন নেই, তবু ছেলে-মেয়েরা কেউই পড়াশুনোয় পিছিয়ে নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আড়াই কিমি দূরে বিজয় বস্তিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি অবস্থিত। মুন্ডা, ওঁরাও এবং কিষান জনজাতির ছেলে-মেয়েরা এই কেন্দ্রে পড়ে। কেন্দ্রে দুই জন সহায়িকা আছেন এবং এখানে লেখাপড়া খুব ভাল হয়। সহায়িকা দুই জন খুব ভাল পড়ান এবং এঁদের বেশ সুনাম আছে। এঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে ভালোভাবে যোগাযোগ রাখেন এবং যথেষ্ট যত্নবান। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পর থেকে এখানে পড়ুয়া ভর্তি ভালই হয়েছে। জনজাতির যে

সব পড়ুয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না তাদের কাছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি খুবই ভাল সংস্থান হয়েছে।

গ্রাম - রাঙ্গাপানি ব্লক - নকশালবাড়ি

শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় ৯ কিমি দূরে শিলিগুড়ি-চটহাট সড়কে রাঙ্গাপানি বাস স্টপ। গ্রামকে দুই ভাগ করে চলে গেছে মালদা-নিউজলপাইগুড়ি রেলপথ। গ্রামে ৫টি ছোট ছোট পাড়া -- কাঁসিরামপাড়া, মধুপাড়া, পালপাড়া, বস্তিপাড়া এবং কেনাপাড়া। গ্রামে তফসিলী জাতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ -- শতকরা ৯০ ভাগ। বস্তিপাড়াতেও বাস করেন একটি মাত্র মুসলমান পরিবার এবং ১৬টি ওঁরাও জনজাতির পরিবার। গ্রামে প্রায় ১০০০ পরিবারের বাস এবং গ্রামবাসীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার। গ্রামে টীকাকরণ কেন্দ্র, একটি ডাকঘর, অনেকগুলি মুদিখানা এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এখানে পানীয় জলের কোন সমস্যা নেই। গ্রীষ্মকালেও জলের অভাব হয় না। কারণ, গ্রামে অনেকগুলি নলকূপ, ইঁদারা, ইত্যাদি আছে, তাছাড়া আছে পাইপলাইনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। গ্রাম থেকে ৪ কিমি দূরে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গ্রামবাসীরা নানারকম জীবিকায় নিযুক্ত। প্রধান জীবিকা চাষবাস। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিবার চাষের সঙ্গে যুক্ত। কুড়ি ভাগ পরিবারের মানুষ রাজমিস্ত্রির কাজ করেন।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক -- এঁদের মধ্যে ২ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। শিশু শ্রেণি (নার্সারি) থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬টা শ্রেণি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৮২। বিদ্যালয়ের বাড়িটি রীতিমতো ভালভাবে তৈরি (পাকা বাড়ি) -- উপরে টিনের ছাউনি। একটা খেলার মাঠও আছে। অধিকাংশ পড়ুয়া (শতকরা ৮০/৮৫ শতাংশ) গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। কয়েকজন শিক্ষিত বেকার গ্রামবাসী গৃহশিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। গৃহশিক্ষকের বেতন পড়ুয়া পিছু মাসে ৪০ থেকে ৬০ টাকা। গরিব মানুষরাও তাঁদের সন্তানদের জন্য গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেন। পালপাড়ায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। পালপাড়া আর বস্তিপাড়া রেল লাইনের ওধারে। পালপাড়া আর বস্তিপাড়ার ছেলে-মেয়েদের রেল লাইন পেরিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে দিতে চান না অভিভাবকেরা। তাঁরা চান পড়ুয়ারা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেই লেখাপড়া করুক। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশুনো ভালই হয়। কেন্দ্রে ২ জন সহায়িকা এবং ৭৯ জন পড়ুয়া।

গ্রাম - লেউসিপুকুরি ব্লক - ফাঁসিদেওয়া

গ্রামের প্রচলিত নাম 'লিচুবাকরি'। শিলিগুড়ি-চটহাট বাস রাস্তার উপর শিলিগুড়ি থেকে ১৭ কিমি দূরে এই গ্রাম। গ্রামে তিনশোর মতো পরিবার বাস করেন, জন সংখ্যা প্রায় ১,৮০০। নানা জাতির বসবাস এই গ্রামে। যেমন, বর্ণহিন্দুর মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমশূদ্র এবং রাজবংশী। এ ছাড়া বেশ কয়েক ঘর মুসলমানও বাস করেন। গ্রামে একটি ডাকঘর এবং রেশন দোকান আছে। পাতকুয়ো এই গ্রামে পানীয় জলের প্রধান উৎস। অধিকাংশ গ্রামবাসী (প্রায় ৭০ ভাগ) চাষবাস এবং অন্যান্য কৃষিভিত্তিক কাজের উপর নির্ভরশীল। লেউসিপুকুরি গ্রামে বেশ কয়েকজন ব্যবসাদার এবং কয়েকজন

চাকুরিজীবী বাস করেন। গ্রামে সেচ খালের সুবিধে আছে এবং এক-চতুর্থাংশ গ্রামবাসীর নিজেদের কৃষি জমি আছে। শতকরা ১৫ ভাগ গ্রামবাসী খেতমজুর। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। বাস স্টপের উল্টোদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের বাড়িটি পাকা। ছাত্র ভর্তি ভালই – পড়ুয়াদের সংখ্যা ১৯০। বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষক।

গ্রামে গৃহশিক্ষকদের বেতন বেশ বেশি (৭৫-১০০ টাকা)। গ্রামের মানুষজন গৃহশিক্ষকতার সমর্থক। কারণ তাঁদের বিশ্বাস, উন্নত মানের শিক্ষার্জনের জন্য গৃহশিক্ষকতা আবশ্যক।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি মধুজোত পাড়ায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১০ মিনিটের হাঁটা পথ। এই অঞ্চলের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৪টি শ্রেণি। পড়ুয়া ৬০ জন। কেন্দ্রে ৩ জন সহায়িকা, সবাই গ্রামের বাইরে থেকে আসেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কোন ঘরবাড়ি নেই। পাড়ায় একপ্রান্তে একটি খোলা জায়গাতে কেন্দ্রের পড়াশুনো চলে। অভিভাবকরা উল্লেখ করেছেন গৃহের অভাবই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান সমস্যা। কেন্দ্রটি ৩ বছরের পুরনো। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেননি। তাঁরা পঞ্চায়েতকে এই সঙ্কটের জন্য দোষারোপ করেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংলগ্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েরা কেন্দ্রে পড়তে যায়।

<u>গ্রাম - ডাঙ্গি-গাদি টোলা</u> <u>ব্লক - ফাঁসিদেওয়া</u>

এই গ্রাম শিলিগুড়ি থেকে ৩৬ কিমি দূরে। গ্রামে যেতে হলে চটহাট বাস স্ট্যান্ডে নেমে খেত-মাঠ দিয়ে ৪ কিমি হেঁটে যেতে হয়। এটি একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে ৬৫টি পরিবারের বাস। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭৫। গ্রামটিতে সম্পূর্ণত মুসলমানদের বসবাস। গ্রামে একটি মাত্র গভীর নলকূপ। ডাকঘর বা রেশন দোকান এই গ্রামে নেই।

গ্রামের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সবই চাষ আবাদের উপর নির্ভরশীল। ৪০টি পরিবারের নিজস্ব চাষের জমি আছে। ২৫টি পরিবার মূলত খেতমজুরি করে উপার্জন করেন। সামান্য কয়েকজন মহিলা চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিক রূপে কাজ করেন। জনা কয়েক রাজমিস্ত্রি ও ছোট ব্যবসায়ী আছেন এই গ্রামে।

পাশের গ্রাম কুচিয়া মোড়-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ডাঙ্গি-গাদি টোলা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব ২ কিমি। গ্রামের কয়েকজন মাত্র শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি আছে। দুটো শ্রেণিকক্ষ, দু'জন শিক্ষক এবং ১৮৮ জন শিক্ষার্থী। এই বিদ্যালয়ে প্রধান সমস্যা হল উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা।

এই গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের এক-শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট নিজস্ব পাকা বাড়ি আছে। দু'জন গ্রামবাসী কেন্দ্রের জন্য জমি দান করেছেন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। কেন্দ্রে সহায়িকা ৩ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী ৬২ জন। একজন সহায়িকা মনে করেন, পড়ুয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য প্রধান অন্তরায় হল ভাষা। মা-বাবারা কন্যাসন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন।

সারণী

১. পরিবারগুলির পরিচিতি

১.১ আয়ের ভিত্তিতে পরিবারগুলির বিভাজন (বার্ষিক পারিবারিক আয়) টাকায়

	১৬,০০০-র কম	১৬,০০০-২৪,৯৯৯	২৫,০০০-৩৪,৯৯৯	৩৫,০০০-৪৪,৯৯৯	৪৫,০০০-৫৯,৯৯৯	৬০,০০০ ও তদূর্ধ	মোট
তফসিলী জাতি	৫২ (৫৭.৮)	১৪ (১৫.৬)	৯ (১০.০)	৩ (৩.৩)	৬ (৬.৭)	৬ (৬.৭)	৯০ (১০০)
আদিবাসী	২৩ (৬৫.৭)	৭ (২০.০)	১ (২.৯)	৩ (৮.৬)	০	১ (২.৯)	৩৫ (১০০)
মুসলিম	৫৪ (৪৯.১)	৩৪ (৩০.৯)	১১ (১০.০)	৪ (৩.৬)	৩ (২.৭)	৪ (৩.৬)	১১০ (১০০)
অন্যান্য	৪৪ (৩৮.৩)	৩৪ (২৯.৬)	১০ (৮.৭)	৭ (৬.১)	৯ (৭.৮)	১১ (৯.৬)	১১৫ (১০০)
মোট	১৭৩ (৪৯.৪)	৮৯ (২৫.৪)	৩১ (৮.৯)	১৭ (৪.৯)	১৮ (৫.১)	২২ (৬.৩)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

১.২ জমির মালিকানার ধরন (একরে)

	ভূমিহীন	১ একরের কম একরের কম	১ থেকে ২.৫ একরের কম	২.৫ থেকে ৫ একরের কম	৫ একর থেকে ৭.৫ তার বেশি	৭.৫ একর ও	মোট
তফসিলী জাতি	৭০ (৭৭.৮)	১০ (১১.১)	৮ (৮.৯)	২ (২.২)	০ (০.০)	০ (০.০)	৯০ (১০০)
আদিবাসী	২২ (৬২.৯)	১ (২.৯)	৯ (২৫.৭)	৩ (৮.৬)	০ (০.০)	০ (০.০)	৩৫ (১০০)
মুসলিম	৫০ (৪৫.৫)	১৭ (১৫.৫)	২৭ (২৪.৬)	১২ (১০.৯)	১ (০.৯)	৩ (২.৭)	১১০ (১০০)
অন্যান্য	৬৮ (৫৯.১)	২১ (১৮.৩)	১৬ (১৩.৯)	৮ (৭.০)	১ (০.৯)	১ (০.৯)	১১৫ (১০০)
মোট	২১০ (৬০.০)	৪৯ (১৪.০)	৬০ (১৭.১)	২৫ (৭.১)	২ (০.৬)	৪ (১.১)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

২. শিশুদের শিক্ষা

২.১ শিশুরা কোথায় পড়ে?

জাতি	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
তফসিলী জাতি	৫৫(৬১)	৩২(৩৬)	৩(৩)	৯০(১০০)
আদিবাসী	১৪(৪০)	১৮(৫১)	৩(৯)	৩৫(১০০)
মুসলিম	৬৩(৫৭)	৪২(৩৮)	৫(৫)	১১০(১০০)
অন্যান্য	৬৮(৫৯)	৩০(২৬)	১৭(১৫)	১১৫(১০০)
মোট	২০০(৫৭)	১২২(৩৫)	২৮(৮)	৩৫০(১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

২.২ শিক্ষার ব্যয় (টাকায় প্রতি বছরে প্রতি শিশুর জন্য?)

ব্যয় (টাকা/বছরে)	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
২০০ টাকার কম	১১ (৫.৫)	১৯ (১৫.৬)	০ (০.০)	৩০ (৮.৬)
২০১-৬০০	৫১ (২৫.৫)	৫৭ (৪৬.৭)	০ (০.০)	১০৮ (৩০.৯)
৬০১-১০০০	৭৩ (৩৬.৫)	৩০ (২৪.৬)	৩ (১০.৭)	১০৬ (৩০.৩)
১০০১-১৪০০	৩৬ (১৮.০)	১৪ (১১.৫)	৩ (১০.৭)	৫৩ (১৫.১)
১৪০১-১৮০০	১৪ (৭.০)	১ (০.৮)	৩ (১০.৭)	১৮ (৫.১)
১৮০০ টাকার বেশি	১৩ (৬.৫)	১ (০.৮)	১৯ (৬৭.৯)	৩৩ (৯.৪)
বলতে পারেনি	২ (১.০)	০ (০.০)	০ (০.০)	২ (০.৬)
মোট উত্তরদাতা	২০০ (১০০)	১২২ (১০০)	২৮ (১০০)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩. বাড়িতে পড়ার কাজে সাহায্য দান ও গৃহশিক্ষকতা

৩.১ বাড়িতে সাহায্য দান

	প্রাথমিক বিদ্যালয়		এস.এস.কে.		প্রাইভেট স্কুল		মোট	
	বাড়িতে সাহায্য দান	মোট উত্তরদাতা	বাড়িতে সাহায্য দান	মোট উত্তরদাতা	বাড়িতে সাহায্য দান	মোট উত্তরদাতা	বাড়িতে সাহায্য দান	মোট উত্তরদাতা
তফসিলী জাতি	৩৪(৬২)	৫৫	১৬(৫০)	৩২	২(৬৭)	৩	৫২(৫৮)	৯০(১০০)
আদিবাসী	৯(৬৪)	১৪	৭(৩৯)	১৮	০	৩	১৬(৪৬)	৩৫(১০০)
মুসলিম	৪০(৬৩)	৬৩	৩১(৭৪)	৪২	৪(৮০)	৫	৭৫(৬৮)	১১০(১০০)
অন্যান্য	৪৬(৬৮)	৬৮	১৭(৫৭)	৩০	১৪(৮২)	১৭	৭৭(৬৭)	১১৫(১০০)
মোট	১২৯(৬৪.৫)	২০০	৭১(৫৮)	১২২	২০(৭১)	২৮	২২০(৬৩)	৩৫০(১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.২ বাড়িতে পড়ার কাজে সাহায্য দান (পেশা অনুযায়ী)

অভিভাবকের পেশা	বাড়িতে কোনরকম সাহায্য দান করা হয় কি না							
	প্রাথমিক বিদ্যালয়		এস.এস.কে.		প্রাইভেট স্কুল		মোট	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
চাষবাস	২২(৫৭.৯)	১৬(৪২.১)	২২(৭১.০)	৯ (২৯.০)	৪(৮০.০)	১ (২০.০)	৪৮(৬৪.৯)	২৬ (৩৫.১)
কৃষি মজুর	১৪(৪২.৪)	১৯(৫৭.৬)	১০(৪৩.৫)	১৩(৫৬.৫)	০	০	২৪(৪৩.৬)	৩২ (৫৬.৪)
অ-কৃষি মজুর	১৯(৬৭.৯)	৯(৩২.১)	৯(৩৫.০)	১৭(৬৫.০)	২(৪০.০)	৩(৬০.০)	৩০(৫১.৭)	২৯(৪২.৩)
অন্যান্য	৭৪(৭৩.৩)	২৭(২৬.৭)	৩০(৭১.৪)	১২(২৮.৬)	১৪(৭৭.৮)	৪(২২.২)	১১৮(৭৩.৩)	৪৩(২৬.৭)
মোট	১২৯(৬৪.৫)	৭১(৩৫.৫)	৭১(৫৮.২)	৫১(৪১.৮)	২০(৭১.৪)	৮(২৮.৬)	২২০(৬২.৯)	১৩০(৩৭.১)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৩ যারা বাড়িতে সাহায্য ও প্রাইভেট টিউশন দুই-ই পেয়ে থাকে

	তফসিলী জাতি		আদিবাসী		মুসলিম		অন্যান্য		মোট	
	দুই-ই পায়	মোট	দুই-ই পায়	মোট	দুই-ই পায়	মোট	দুই-ই পায়	মোট	দুই-ই পায়	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩(৪১.৮)	৫৫(১০০)	১(৭.১)	১৪(১০০)	১৬(২৫.৪)	৬৩(১০০)	২৮(৪১.২)	৬৮(১০০)	৬৮(৩৪.০)	২০০(১০০)
এস.এস.কে.	৪(১২.৫)	৩২(১০০)	১(৫.৫)	১৮(১০০)	৫(১১.৯)	৪২(১০০)	৩(১০.০)	৩০(১০০)	১৩(১০.৬)	১২২(১০০)
প্রাইভেট স্কুল	১(৩৩.৩)	৩(১০০)	১(৩৩.৩)	৩(১০০)	০	৫(১০০)	৫(২৯.৪)	১৭(১০০)	৭(২৫.০)	২৮(১০০)
মোট	২৮(৩১.১)	৯০(১০০)	৩(৮.৬)	৩৫(১০০)	২১(১৯.১)	১১০(১০০)	৩৬(৩১.৩)	১১৫(১০০)	৮৮(২৫.১)	৩৫০(১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৪ গৃহশিক্ষকতার ব্যাপ্তি

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
তফসিলী জাতি	৩৭(৬৭)	৭(২২)	২(৬৭)	৪৬(৫১)
আদিবাসী	৩(২১)	২(১১)	২(৬৭)	৭(২০)
মুসলিম	২৯(৪৬)	৬(১৪)	০	৩৫(৩২)
অন্যান্য	৪৪(৬৫)	৮(২৭)	৭(৪১)	৫৯(৫১)
মোট	১১৩(৫৬.৫)	২৩(১৯)	১১(৩৯)	১৪৭(৪২)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৫ গৃহশিক্ষকতার ব্যাপ্তি (পেশা অনুযায়ী)

পেশা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
চাষবাস	২৬ (৬৮.৪)	৩ (৯.৭)	১ (২০.০)	৩০ (৪০.৫)
কৃষি মজুর	১৫ (৪৫.৫)	৩ (১৩.১)	০	১৮ (৩২.১)
অ-কৃষি মজুর	১০ (৩৫.৭)	২ (৭.৭)	৩ (৬০.০)	১৫ (২৫.৪)
অন্যান্য	৬২ (৬১.৪)	১৫ (৩৫.৭)	৭ (৩৮.৮)	৮৪ (৫২.২)
মোট	১১৩ (৫৬.৫)	২৩ (১৮.৮)	১১ (৩৯.৩)	১৪৭ (৪২.০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৬ প্রাইভেট টিউশনের খরচ বহন করতে কি অসুবিধা হয়?

	তফসিলী জাতি	আদিবাসী	মুসলিম	অন্যান্য	মোট
হ্যাঁ	৩৬ (৭৮)	৩ (৪৩)	২৪ (৬৯)	৪১ (৭০)	১০৪ (৭১)
না	৮ (১৮)	৩ (৪৩)	৯ (২৬)	১২ (২০)	৩২ (২২)
উত্তর নেই	২ (৪)	১ (১৪)	২ (৫)	৬ (১০)	১১ (৭)
মোট	৪৬ (১০০)	৭ (১০০)	৩৫ (১০০)	৫৯ (১০০)	১৪৭ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৭ গৃহশিক্ষকতা কি অনিবার্য?

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
হ্যাঁ	১৬১ (৮০.৫)	৮২ (৬৭.২)	২১ (৭৫.০)	২৬৪ (৭৫.৪)
না	৩৯ (১৯.৫)	৩৯ (৩২.০)	৭ (২৫.০)	৮৫ (২৪.৩)
উত্তর নেই	০ (০.০)	১ (০.৮)	০ (০.০)	১ (০.৩)
মোট	২০০ (১০০)	১২২ (১০০)	২৮ (১০০)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৩.৮ প্রাইভেট টিউশন এত প্রয়োজনীয় কেন

কারণ	তফসিলী জাতি	আদিবাসী	মুসলিম	অন্যান্য	মোট
প্রাইভেট টিউশন ছাড়া শিক্ষা হতে পারে না	৩৮ (৬৪.৪)	১৬ (৮০)	৫১(৬৪.৫)	৪৫(১০০)	১৫০ (৭৩.৯)
শিক্ষকরা শিশুদের পড়াশোনার যত্ন নেন না	০	১ (৫.০)	০	০	১ (০.৫)
শিক্ষকরা ভালো করে পড়ান না	১৬ (২৭.১)	২ (১০)	১৫ (১৯)	১৮ (৪০)	৫১ (২৫.১)
ভাল ফল করার জন্য	৮ (১৩.৫)	১০ (৫০)	১২(১৫.২)	১৫ (৩৩.৩)	৪৫ (২২.২)
বাচ্চারা গৃহশিক্ষককে মানে, মা-বাবার কথা শোনে না	৭ (১১.৯)	০	০	১১(২৪.৪)	১৮ (৮.৯)
বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শিক্ষক নেই	৩ (৫.১)	০	১ (১.৩)	১ (২.২)	৫ (২.৫)
শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন দেওয়ার জন্য জোর দেন	০	০	০	৩ (৬.৭)	৩ (১.৫)
উত্তরদাতার সংখ্যা	৫৯ (১০০)	২০ (১০০)	৭৯ (১০০)	৪৫ (১০০)	২০৩ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। উত্তরগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়

৪. উৎসাহবর্ধক প্রকল্প

৪.১ প্রাপ্ত সাহায্যের ধরন

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
চাল	১৯১(৯৬.৫)	০ (০.০)	৩ (১০.৭)	১৯৪ (৫৬.২)
বই	১৯০ (৯৬.০)	১০৩ (৮৬.৫)	০ (০.০)	২৯৩ (৮৪.৯)
পোশাক	২৪ (১২.১)	০ (০.০)	০ (০.০)	২৪ (৬.৯)
অন্যান্য	১১ (৫.৬)	০ (০.০)	০ (০.০)	১১ (৩.২)
কিছুই না	২ (১.০)	১৬ (১৩.৪)	২৫ (৮৯.৩)	৪৩ (১২.৫)
উত্তর নেই	২ (১.০)	৩ (২.৫)	০ (০.০)	৫ (১.৪)
উত্তরদাতার সংখ্যা	১৯৮ (১০০)	১১৯ (১০০)	২৮ (১০০)	৩৪৫ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। উত্তরগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়

৪.২ উৎসাহবর্ধক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত

		প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
চাল	চলা উচিত	৩	০
	কিছু পরিবর্তন (শুকনো খাবার) সহ চলা উচিত	১০	০
	বন্ধ হওয়া উচিত্	৬	১
	চালু করা উচিত	০	১৭
	উত্তর নেই	১	২
বই	চলা উচিত	১১	১৮
	কিছু পরিবর্তন-সহ চলা উচিত	৭	২
	বন্ধ হওয়া উচিত	০	০
	চালু করা উচিত	০	০
	উত্তর নেই	২	০
পোশাক	চলা উচিত	৫	৩
	কিছু পরিবর্তন সহ চলা উচিত	১১	০
	বন্ধ হওয়া উচিত	০	০
	চালু করা উচিত	০	১৬
	উত্তর নেই	৩	১
	প্রযোজ্য নয়	১	০

৪.৩ মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প সম্পর্কে পরামর্শ

পছন্দ	মোট উত্তরদাতা	শতাংশ
রান্না করা খাবার	১২৬	৪৩
শুকনো খাবার (বিস্কুট ইত্যাদি)	১৬৬	৫৭
মোট	২৯২	১০০

৪.৪ রান্না করা খাবার ও শুকনো খাবার পছন্দকারীদের শ্রেণি

শ্রেণি/পছন্দ	রান্না করা খাবার	শুকনো খাবার
দিনমজুর	৮৮(৭০)	৩৩(২০)
অন্যান্য	৩৮(৩০)	১৩৩(৮০)
মোট	১২৬ (১০০)	১৬৬ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫. শিশুদের শিক্ষায় মাতা-পিতার ভূমিকা

৫.১ শিক্ষকদের কাজকর্ম সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

	সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯ (৫৯.৫)	৮১ (৪০.৫)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	১০১ (৮২.৮)	২১ (১৭.২)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	২৫ (৮৯.৩)	৩ (১০.৭)	২৮ (১০০)
মোট	২৪৫ (৭০.০)	১০৫ (৩০.০)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.২ শিক্ষকদের কাজকর্ম সম্পর্কে অভিমত (অভিভাবকদের জাতি অনুযায়ী)

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রাইভেট স্কুল	মোট
তফসিলী জাতি	২৯ (৫৩)	২৮ (৮৭.৫)	৩ (১০০)	৬০ (৬৭)
আদিবাসী	৯ (৬৪)	১৫ (৮৩)	২ (৬৭)	২৬ (৭৪)
মুসলিম	৪২ (৬৭)	৩৩ (৭৮.৫)	৫ (১০০)	৮০ (৭২.৭)
অন্যান্য	৪৬ (৬৮)	২৫ (৮৩)	১৫ (৮৮)	৮৬ (৭৫)
মোট	১২৬ (৬৩)	১০১ (৮৩)	২৫ (৮৯)	২৫২ (৭২)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৩ পিতা-মাতারা কি বিদ্যালয়ের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন?

	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫ (৭৩)	২০ (১০)	৩৫ (১৭)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৮১ (৬৬)	১৮ (১৫)	২৩ (১৯)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	১১ (৩৯)	৮ (২৯)	৯ (৩২)	২৮ (১০০)
মোট	২৩৭ (৬৮)	৪৬ (১৩)	৬৭ (১৯)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৪ অভিভাবকদের সাহায্য চাওয়ার কী রকম সাড়া পাওয়া গেছে - শিক্ষকদের অভিমত

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
ইতিবাচক	১১ (৫৫)	১১ (৫৫)
নেতিবাচক	২ (১০)	০ (০.০)
মিশ্র	১ (৫)	০ (০.০)
প্রযোজ্য নয়*	৬ (৩০)	৯ (৪৫)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক *যেক্ষেত্রে সাহায্য চাওয়া হয়নি

৫.৫ শিক্ষকরা কি অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করেন?

	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৪ (৩৭)	৮৮ (৪৪)	৩৮ (১৯)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৪১ (৩৪)	৫৩ (৪৩)	২৮ (২৩)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	১৬ (৫৭)	৪ (১৪)	৮ (২৮.৫)	২৮ (১০০)
মোট	১৩১ (৩৭)	১৪৫ (৪১)	৭৪ (২১)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৬ মা-বাবারা কি অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি সম্পর্কে অবহিত?

	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০ (৩৫)	৯৮ (৪৯)	৩২ (১৬)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৫২ (৪৩)	৫২ (৪৩)	১৮ (১৪)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	১৪ (৫০)	১৪ (৫০)	০ (০.০)	২৮ (১০০)
মোট	১৩৬ (৩৯)	১৬৪ (৪৭.০)	৫০ (১৪)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৭ অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি কি সুফল দিতে পারে?

শিক্ষকদের অভিমত

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
হ্যাঁ	১৫ (৭৫)	১৮ (৯০)
না	৫ (২৫)	১ (৫)
উত্তর নেই	০ (০.০)	১ (৫)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৮ অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিতে কি সমাজের সকল শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত?

	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০ (৯৭)	৩ (১.৫)	৩ (১.৫)	১৭৬ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	১১০ (৯৬)	৫ (৪)	০ (০.০)	১১৫ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	২৪ (৯২)	২ (৮)	০ (০.০)	২৬ (১০০)
মোট	৩০৪ (৯৬)	১০ (৩)	৩ (১)	৩১৭ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.৯ অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিকে কি আইনি ক্ষমতা দেওয়া উচিত?

	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬১ (৮০.৫)	২২ (১১.০)	১৭ (৮.৫)	২০০ (১০০)
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৯৮ (৮০.৩)	৫ (৪.১)	১৯ (১৫.৬)	১২২ (১০০)
প্রাইভেট স্কুল	২২ (৭৮.৬)	২ (৭.১)	৪ (১৪.৩)	২৮ (১০০)
মোট	২৮১ (৮০.৩)	২৯ (৮.৩)	৪০ (১১.৪)	৩৫০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৫.১০ অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিকে কি আইনি ক্ষমতা দেওয়া উচিত? শিক্ষকদের অভিমত

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
হ্যাঁ	৪ (২০)	৬ (৩০)
না	১২ (৬০)	৫ (২৫)
শর্তসাপেক্ষে	৪ (২০)	২ (১০)
উত্তর নেই	০ (০.০)	৭ (৩৫)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের তুলনা

পরিকাঠামো

৬.১ শিক্ষকের সংখ্যা

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
একজন শিক্ষক	০ (০)	১ (৫)
দুজন শিক্ষক	৩ (১৫)	১২ (৬০)
তিনজন শিক্ষক	৫ (২৫)	৭ (৩৫)
চারজন শিক্ষক	৫ (২৫)	০ (০.০)
চারজনের বেশি শিক্ষক	৭ (৩৫)	০ (০.০)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

* দার্জিলিং জেলার (শিলিগুড়ি মহকুমা) একটি বিদ্যালয়ে কাগজে কলমে দু'জন শিক্ষক থাকলেও বাস্তবে স্কুলটি একজন শিক্ষক দ্বারাই পরিচালিত, যেহেতু একজন শিক্ষক শীঘ্রই অবসর নেবেন

বলে তাঁর প্রাপ্য ছুটিগুলি গ্রহণ করে নিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও এই বিদ্যালয়টির বর্তমান শিক্ষকের অসাধারণ কর্মোদ্যোগ খুবই লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়েছে। যার ফলে, এমন কি কিছু অভিভাবক তাঁদের শিশুদের প্রাইভেট স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে এই সরকারি স্কুলটিতে ভর্তি করেছেন বলে জানা গেছে।

৬.২ স্কুলবাড়ির ধরন

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
পাকা	১১ (৫৫)	৪ (২০)
কাঁচা	২ (১০)	১ (৫)
আংশিক পাকা	৭ (৩৫)	০ (০.০)
কোন বাড়ি নেই	০ (০.০)	১৫ (৭৫)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৬.৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা

শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
এক কক্ষ	৪ (২০)
দুই কক্ষ	৫ (২৫)
তিন কক্ষ	৪ (২০)
চার কক্ষ	৪ (২০)
চার কক্ষের বেশি	৩ (১৫)
মোট	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৬.৪ বাড়িগুলির মেরামতির প্রয়োজন আছে কি না

	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
হ্যাঁ	১৭ (৮৫)
না	৩ (১৫)
মোট	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৬.৫ সাধারণ সুবিধাগুলির লভ্যতা

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
পানীয় জল	১১ (৫৫)	৫ (২৫)
শৌচালয়	১০ (৫০)	২ (১০)
বৈদ্যুতিক আলো	১ (৫)	২ (১০)
বৈদ্যুতিক পাখা	১ (৫)	১ (৫)
খেলার মাঠ	৮ (৪০)	২ (১০)
প্রতি শ্রেণিতে ব্ল্যাক বোর্ড	১৭ (৮৫)	৮ (৪০)
পাঠাগার	৭ (৩৫)	০ (০.০)
ম্যাপ ও চার্ট	১৭ (৮৫)	৩ (১৫)
খেলনা	৮ (৪০)	১ (৫)
শিক্ষণ সামগ্রী	৬ (৩০)	১ (৫)
বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি	২ (১০)	০ (০.০)
অন্যান্য	১ (৫)	০ (০.০)
কোন সুবিধাই নেই	১ (৫)	৭ (৩৫)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৭. পরিচালনা

৭.১ পরিদর্শনের সংখ্যা

আমাদের সাক্ষাৎকারের আগের বছরে পরিদর্শনের সংখ্যা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
একবার	৯ (৪৫)	০ (০.০)
দুই বার	২ (১০)	২ (১০)
তিন বার	৩ (১৫)	৪ (২০)
চার বার	০ (০.০)	৩ (১৫)
চার বারের বেশি	১ (৫)	৮ (৪০)
কোন পরিদর্শন হয়নি	৫ (২৫)	২ (১০)
উত্তর নেই	০ (০.০)	১ (৫)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৭.২ শিক্ষকদের শিক্ষাবহির্ভূত কাজে ব্যয়িত সময়
(সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগের মাসে)

দিনের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
একদিনও নয়	৪ (২০)	৬ (৩০)
এক দিন	৩ (১৫)	৭ (৩৫)
দুই দিন	৫ (২৫)	১ (৫)
তিন দিন	৫ (২৫)	০ (০.০)
চার দিন	২ (১০)	২ (১০)
চার দিনের বেশি	১ (৫)	৪ (২০)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৭.৩ স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়াতে শিক্ষকরা কি কোন উদ্যোগ নিয়েছেন?

	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
হ্যাঁ	১১ (৫৫)	১৮ (৯০)
না	৯ (৪৫)	২ (১০)
মোট	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক

৭.৪ শিক্ষকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন

সমস্যাগুলি	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
পরিকাঠামোর অভাব	৮ (৪০)	১৭ (৮৫)
শিক্ষণ সামগ্রীর অভাব	৮ (৪০)	১৪ (৭০)
শিক্ষকের অভাব	১৩ (৬৫)	৯ (৪৫)
উচ্চ পদাধিকারীদের দ্বারা প্রতাড়িত হওয়া	০ (০.০)	০ (০.০)
শিক্ষা বহির্ভূত কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করা	৭ (৩৫)	০ (০.০)
অনিয়মিত বেতন	১ (৫)	১৪ (৭০)
অভিভাবকদের সহযোগিতার অভাব	৭ (৩৫)	০ (০.০)
কোন প্রাচীর নেই	১ (৫)	১ (৫)
খেলার মাঠ নেই	১ (৫)	১ (৫)

খারাপ পরিবেশ	২ (১০)	০ (০.০)
বর্ষার সময় রাস্তায় কাদা হয়	১ (৫)	০ (০.০)
অন্যান্য	৩ (১৫)	১ (৫)
সাক্ষাতকার নেওয়া শিক্ষকের সংখ্যা	২০ (১০০)	২০ (১০০)

বন্ধনীর ভিতরকার সংখ্যাগুলি শতাংশের সূচক। উত্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়

সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলি ছাড়া অন্য যাঁদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে

প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা

কেকা চক্রবর্তী, সহকারী-শিক্ষিকা, গোপালপুর, বর্ধমান
প্রহ্লাদচন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক, রাজকুসুম, বর্ধমান
মুন্সি মহম্মদ মুসারফ আলি, টিচার-ইন-চার্জ, ভূমশোর, বর্ধমান
বীরেন্দ্রকুমার খান, প্রধান শিক্ষক, মোহনপুর, বর্ধমান
তুলসীদাস মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক, জয়নগর, বর্ধমান
শম্ভুনাথ বাদ্যকর, টিচার-ইন-চার্জ, মধুডাঙ্গা, বর্ধমান
দেওপ্রসাদ প্রধান, প্রধান শিক্ষক, সাংমা-রানিবন, দার্জিলিং
এ. কে. রাই, সহকারী-শিক্ষক, আলুবাড়ি-ফুলবাড়ি, দার্জিলিং
লক্ষ্মী শর্মা, সহকারী-শিক্ষিকা, মন্টেভিয়েট, দার্জিলিং
কপিলকুমার ছেত্রী, প্রধান শিক্ষক, সিমুলবাড়ি, দার্জিলিং
অরিজিৎ রায়, সহকারী-শিক্ষক, সেবদেল্লা, দার্জিলিং
বিজয় গোবিন্দ সরকার, টিচার-ইন-চার্জ, রাঙাপানি, দার্জিলিং
অমূল্যকুমার মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক, লেউসিপুকুরি, দার্জিলিং
বৈদ্যনাথ পাল, সহকারী-শিক্ষক, কুচিয়া মোড়, দার্জিলিং
মহম্মদ হাফিজুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, নসিপুর, মুর্শিদাবাদ
সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রধান শিক্ষক, রুকনপুর মাঠপাড়া, মুর্শিদাবাদ
মহম্মদ সালেকিন, প্রধান শিক্ষক, সইদপুর, মুর্শিদাবাদ
অজিতকুমার সাহা, সহকারী-শিক্ষক, আমডহরা, মুর্শিদাবাদ
তেনুপদ সরকার, প্রধান শিক্ষক, ধুসুরিপাড়া কলোনী, মুর্শিদাবাদ
শাহ্‌জামূল শেখ, সহকারী-শিক্ষক, খেজুরতলা, মুর্শিদাবাদ

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সহায়িকা/সহায়ক

শেফালী সিকদার, সহায়িকা, গোপালপুর, বর্ধমান
জয়ন্তী সিকদার, সহায়িকা, রাজকুসুম-আদকাডাঙ্গা, বর্ধমান
হাফসা খাতুন, সহায়িকা, ভূমশোর, বর্ধমান
কল্যানী দাস, সহায়িকা, মোহনপুর, বর্ধমান
গোপাল মণ্ডল, সহায়ক, জয়নগর, বর্ধমান
সদানন্দ মাজি, সহায়ক, মধুডাঙ্গা, বর্ধমান
মঞ্জু বমজান, সহায়িকা, সাংমা-রানিবন, দার্জিলিং
বিনন্দা রাই, সহায়িকা, আলুবাড়ি-ফুলবাড়ি, দার্জিলিং
প্রতিমা লামা, সহায়িকা, সু-ধা-পা টোল, দার্জিলিং
মিনুবাহাদুর ছেত্রী, সহায়ক, ছোটা আদলপুর, দার্জিলিং
শোভা চিক বারাইক, সহায়িকা, সেবদেল্লা, দার্জিলিং
শেফালী মণ্ডল, সহায়িকা, রাঙাপানি, দার্জিলিং
স্বর্ণবালা রায়, সহায়িকা, লেউসিপুকুরি, দার্জিলিং
টেরেসা কোঙ্গারি, সহায়িকা, ডাঙ্গিগাদিটোলা, দার্জিলিং
চম্পাবতি দাস, সহায়িকা, নসিপুর, মুর্শিদাবাদ
আলপনা ঘোষ, সহায়িকা, রুকনপুর মাঠপাড়া, মুর্শিদাবাদ
নূরনাহার বেগম, সহায়িকা, সইদপুর, মুর্শিদাবাদ
মাধবী মন্ডল, সহায়িকা, আমডহরা, মুর্শিদাবাদ
প্রতিভা রানি দাস, সহায়িকা, হাসিমপুর, মুর্শিদাবাদ
মঞ্জু সরকার, সহায়িকা, খেজুরতলা, মুর্শিদাবাদ

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

সুলতানা রাজিয়া, ভূমশোর, বর্ধমান
বীনাপাণি দত্ত, রাজকুসুম, বর্ধমান
নূপুর ব্যানার্জি, রাজকুসুম-আদকাডাঙ্গা, বর্ধমান
তপতী মুখার্জি, মোহনপুর, বর্ধমান
বিমলা মাঝি, জয়নগর, বর্ধমান
স্বপনা কুন্ডু, সেবদেল্লা, দার্জিলিং
ভারতী মন্ডল, আমডহরা, মুর্শিদাবাদ

অন্যান্য

অজিতেশ ঘরামী, গোপালপুর, বর্ধমান
নবকুমার সামন্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, রাজকুসুম, বর্ধমান
মহিবুল হাসান, ভূমশোর, বর্ধমান
আলি রেজা, চুরুলিয়া, বর্ধমান
শিবনাথ হাঁসদা, রাজকুসুম-আদকাডাঙ্গা, বর্ধমান

সুকুমারি বাউরি, মধুডাঙ্গা, বর্ধমান
শহিদুল হক, সভাপতি, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বর্ধমান
শশবিন্দু ভুঁইয়া, জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক এবং নোডাল আধিকারিক, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, বর্ধমান
বীরেন চ্যাটার্জি, অ্যাকাডেমিক ইনস্ট্রাকটর, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বর্ধমান
দিলিপ কুমার দে, জেলা মাস্ এডুকেশন অফিসার, বর্ধমান
হীরা পাঁজা, সভাপতি, ভাতার পঞ্চায়েত সমিতি, বর্ধমান
বি. সি. রায়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, ভাতার, বর্ধমান
আব্দুল লতিফ মল্লিক, কো-অপারেটিভ ইন্সপেকটর এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ইন-চার্জ, ভাতার, বর্ধমান
নারায়ণ পাল, বিদ্যালয় পরিদর্শক, ভাতার সার্কেল, বর্ধমান
পার্থ ঘোষ, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, কাঁকসা, বর্ধমান
অলোক ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতি, বর্ধমান
পূরবী ভাদুড়ি-বাগচী, বিদ্যালয় পরিদর্শক, কাঁকসা, বর্ধমান
প্রদ্যুত বিশ্বাস, বিদ্যালয় পরিদর্শন দফতর, সার্কেল-১, জামুরিয়া, বর্ধমান
রিঞ্চেন বমজান, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, সাংমা-রানিবন, দার্জিলিং
সি. পি. সরোজ, ছোটা আদলপুর, দার্জিলিং
রিতা প্রসাদ, ছোটা আদলপুর, দার্জিলিং
সাধন ওঁরাও সেবদেল্লা, দার্জিলিং
মহিউদ্দিন আনসারি, সেবদেল্লা, দার্জিলিং
দেবাশিস সরকার, সাংবাদিক, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
জে. বি. কারকি, সভাপতি, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ, গোর্খা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং
সতিশ রাসাইলি, বিদ্যালয় পরিদর্শক, দার্জিলিং সার্কেল, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং
আই. এন. প্রধান, কাউন্সিলার, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং
আই. পি. রাই, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, শিক্ষা দফতর, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং
নিখিল গুহ, সভাপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং
নূর ইসলাম, ভাণ্ডারা, মুর্শিদাবাদ
মানওয়ার হক, রিসোর্স পার্সন, ভগবানগোলা-২, মুর্শিদাবাদ
সৌমিত্র সেনগুপ্ত, নোডাল অফিসার, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ
বিদিত দাস, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট, শিশু শিক্ষা কর্মসূচী, মুর্শিদাবাদ
শ্বেতা চন্দ, চেয়ারপার্সন, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, মুর্শিদাবাদ
লতিকা মণ্ডল, লেডি একস্টেনশন অফিসার, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ
ভৈরবচন্দ্র মণ্ডল, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

"*প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনায় অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা*" কার্যশালা

আয়োজক - প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট
জুলাই ৬, ২০০২
'গীতাঞ্জলি', বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিবেদন

২০০১ সালের মে মাসে প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নির্দেশনায় প্রতীচীর গবেষক দল প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতার পথ ও পাথেয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষা চালায়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলার ১৮টি গ্রামে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষণাটির প্রাথমিক ফলাফল অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ১০ই নভেম্বর, ২০০১-এ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন। ২০০২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গবেষকদল একই গ্রামগুলি পুনরায় পরিদর্শন করেন ও উক্ত প্রাথমিক ফলাফলের বাংলা অনুবাদ গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

২০০২ সালের এপ্রিল মাসে গবেষণাটি আরো তিনটি জেলাতে প্রসারিত করা হয়। এই জেলাগুলি হল, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং দার্জিলিং। সামগ্রিকভাবে ২০টি গ্রামে গবেষণা করা হয়।

এই গ্রামগুলিতেও গবেষকদল প্রথম রিপোর্টের বাংলা অনুবাদটি বন্টন করেন। অভিভাবক-শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সংহতি প্রাথমিক শিক্ষার সুষম পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, ট্রাস্টের এই মতামতের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অভিভাবক ও শিক্ষকেরা ব্যক্তিগত আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করে সাড়া দেন। অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহব্যঞ্জক মতামত ও তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডে অশগ্রহণের উদ্দীপনা আমাদের আলোচনাটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। এই উদ্দেশ্যেই ২০০২ সালের ৬ই জুলাই প্রাতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের পক্ষ থেকে একটি কার্যশালার আয়োজন করা হয়।

আলোচনায় প্রধান বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়া হয় "প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশনে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা" শীর্ষকটি।

কার্যবিবরণী

কার্যশালার মূল কাজ শুরু হয় ৬ই জুলাই সকাল ৯টায় স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে। এর পরে অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলি তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

শ্রী শিবাদিত্য সেনের সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় অভিভাবক অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন চলে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে এবং এরপর সরাসরি শ্রী স্যমন্তক দাসের সভাপতিত্বে শিক্ষক অধিবেশন শুরু হয়। এক ঘন্টা মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর শ্রী কুমার রাণার সভাপতিত্বে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। কার্যবিবরণীর সারাংশ অধিবেশনে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সভাপতিত্ব করেন।

অভিভাবক - শিক্ষকদের মতামত

৬টি জেলার (বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়া) মোট ৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৪৩ জন অভিভাবক এবং ৪৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহায়িকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের মূল্যবান আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কার্যশালার কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করে। প্রতিনিধিরা নানা সমস্যার আলোচনা করেন এবং সমাধানসূত্রের প্রস্তাব করেন) যেগুলির উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়, সেগুলি হল -

- অধিকাংশ অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের সমস্ত অংশের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্যালয় নির্দিষ্ট অভিভাবক-শিক্ষক কটিটির পক্ষে রায় দেন। বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিবিধানে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার জন্য কমিটিগুলির হাতে আইনি অধিকারের কথা বলা হয়।
- বহু সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও একটা অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতি ও নির্লিপ্ততা প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশনের সমস্যাকে প্রায়শই প্রভাবিত করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমাজের কম সুবিধাভোগী শ্রেণির শিশুদের প্রতি অবহেলা এবং বিদ্যালয়ে সময় কম দেওয়া।
- অনেক অভিভাবক এটা মনে করেন যে, গুণগত শিক্ষার পরিবেশনের ব্যর্থতা গৃহশিক্ষকতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।
- বিদ্যালয়-বহির্ভূত কার্যকলাপ (ভোটার লিস্ট, সেন্সাস ইত্যাদি) নিশ্চিতভাবে শিক্ষকদের সময়ের একটা বৃহৎ অংশ দখল করে রাখে, যাতে করে শিশুদের গুণগত শিক্ষার পরিবেশনের গুরুত্ব কমে। এর সাথে শিশুদের বঞ্চনার দিকটি জড়িয়ে আছে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সহায়ক নয়।
- বহু অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালু থাকা চাল বিতরণের কর্মসূচি শিশুদের উপস্থিতি ও পুষ্টিবর্ধন কোনটিতেই তেমন উৎসাহবর্ধক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাঁরা মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পটিকে প্রকৃত মধ্যাহ্নকালীন আহারের কর্মসূচি হিসাবে রূপায়ণের দাবি জানান।
- শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাদের অনিয়মিত এবং বিলম্বে মাসোহারা প্রদান অভিভাবক এবং সহায়িকাদের উদ্বেগের আর একটি বিষয়, যেহেতু তাঁরা সবাই

এই জিনিসটিকে কার্যকরী শিক্ষার পরিবেশনের ক্ষেত্রে হতাশাজনক বলে মনে করেন। সকল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকারা যাতে সময় মতো তাঁদের মাসোহারা পান সেটা নিশ্চিত করবার জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত।

- সহায়িকাদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বয়ঃসীমা নির্ধারণের ফলে যে সব আদিবাসী অধ্যুষিত স্থানের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অধিক সেখানে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একজনও সহায়িকা নিযুক্ত হয় না। এর ফলে সেখানকার তিনজন সহায়িকা যাঁরা ঐ অঞ্চলের বাইরে থেকে আসেন, তাঁদের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের সঙ্গে কোন মানসিক হৃদ্যতা নেই। এই পরিস্থিতিতে, সহায়িকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাষাগত এবং সামাজিক ব্যবধানের ফলে সম্ভবত কার্যকরী শিক্ষার পরিবেশন একটি নেতিবাচক বিষয় হয়ে উঠেছে।
- শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির অন্যতম একটি সমস্যা হল এই যে সেখানকার শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালু থাকা উৎসাহবর্ধক কর্মসূচিগুলির বিশেষত 'মধ্যাহ্নভোজন' (যাতে শিশু প্রতি মাসে ৩ কেজি চাল বরাদ্দ) এবং বিনামূল্যে পোশাক সরবরাহ করা থেকে বঞ্চিত। এমন কি কিছু সহায়িকা এই অভিযোগও তোলেন যে তারা বিনামূল্যে পাঠ্যবই ঠিকমতো পান না।
- অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে যে অভিযোগটি বারংবার উঠে আসে সেটি হল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশেষত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভবনের জীর্ণ দশা। বহু ক্ষেত্রেই একটি ঘরের মধ্যে চারটি শ্রেণির শিশুদের পড়তে হয় এর থেকেও বড় কথা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও ঘর বাড়ি নেই। অনেক ক্ষেত্রে গাছতলা বা অন্য লোকের বারান্দা, গোয়াল ঘর ইত্যাদিই সম্বল।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালু থাকা মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে কিছু অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা আগেকার দিনে চালু থাকা পরীক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করেন।
- প্রায় ভেঙে পড়া বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে সমস্ত অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা জোর দেন।

অন্যান্য যে বিষয়গুলি আলোচনা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১) স্কুল ছুট শিশুদের হার কমানো;

২) শিক্ষার পক্ষে জনজাগরণী আন্দোলন গড়ে তোলা;

৩) অঙ্গনওয়াড়ি ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকে অধিকতর সচল করা;

৪) শিক্ষণ রীতিতে পরিবর্তন আনা।

নীতি নির্ধারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টাই বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে এবং সেই লক্ষ্যেই এগোনোর উপর কার্যশালাটিতে জোর দেওয়া হয়।

বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি শ্রী গৌতম ঘোষ ও বোলপুরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কার্যশালাটিতে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে প্রতীচী গবেষক দলের সমীক্ষার সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন।

কার্যশালাটির শেষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

কার্যশালাটিকে সফল করে তুলতে বহু মানুষের অবদান অনস্বীকার্য এবং প্রতীচী গবেষক দল তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তবে প্রত্যেকের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যে কজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন, মালিনী মুন্সী, আশিস দে, সৌমেন্দু সরকার, জয় মুখার্জি, দিলীপ ঠাকুর, রতন মণ্ডল এবং প্রীতম মুখার্জি। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ, মোহনানন্দ সেবাশ্রম এবং বিশ্বভারতী।

"আপনাদের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল পড়ে একটাই কথা বলতে পারি — সমস্যাগুলিকে আপনারা যথাযথ তুলে এনেছেন। পুরো রিপোর্টটি পড়তে চাই।"

— মুর্শিদাবাদ জেলার একজন অভিভাবকের লেখা চিঠি

"আপনাদের রিপোর্টে উল্লিখিত, প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত কিছু তথ্য এতই অস্বস্তিকর ও অবিশ্বাস্য মনে হল যে, এই ৬৪ বছর বয়সেও উদ্যোগী হলাম কয়েকটি গ্রামে যেতে। ...... সমস্যাগুলিকে প্রতীচী রিপোর্ট অত্যন্ত যথাযথভাবে তুলে ধরেছে, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি।"

— শান্তিনিকেতন নিবাসী একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের চিঠি

"আমি একজন বৃদ্ধ অশক্ত কমিউনিস্ট ...... প্রতীচীর প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টটির মূল (ইংরেজি) ও সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ পড়বার সুযোগ পেলাম। ...... সত্যকে যে এমন প্রাণবন্ত ভাবে আলোকে আনা যায় তার একটি মস্ত বড় উদাহরণ এই রিপোর্ট।"

— কোলকাতা থেকে আসা একটি চিঠি

"আপনাদের রিপোর্ট জনসাধারণকে শিক্ষা সচেতন করে তুলতে ও শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি মাইল-ফলক হিসাবে কাজ করবে।"

— বীরভূমের একজন অভিভাবকের লেখা চিঠি

"প্রতীচী রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে, অভিভাবক-অভিভাবিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় সামাজিক সংগঠন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির হাতিয়ার।"

— মেদিনীপুরের একজন প্রাথমিক শিক্ষকের লেখা চিঠি

"............ প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশন (প্রতীচীর গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলের বাংলা অনুবাদ) পড়িয়া তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করিলাম ...."

— বর্ধমানের একজন সহায়িকার লেখা চিঠি

"আপনাদের করা সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল পড়ার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হলাম। এই প্রাণবন্ত গবেষণাটির বঙ্গানুবাদ হওয়া আশু প্রয়োজন।"

— পুরুলিয়ার একজন অভিভাবকের লেখা চিঠি

"আমাদের দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এমন নয় যে রাতারাতি আমূল পরিবর্তনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ব দৈন্যতা দূর হয়ে যাবে .... তবে আমাদের আন্তরিকতার দ্বারা তা কিছুটা হলেও দূর হতে পারে।"

— দার্জিলিং এর একজন প্রাথমিক শিক্ষকের লেখা চিঠি

"রিপোর্টটি সহজবোধ্য ভাষায় রচিত, এতে পাঠকদের পড়া, প্রতিক্রিয়া জানানোটা সহজ হবে। এই রকম উদ্যোগের একটি নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা আশা করব প্রতীচী ট্রাস্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের উপর এইরকম আরো অনেক কাজ করে তুলবে।"

— ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি